অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সিগ্‌নেট প্রেস : কলিকাতা

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়
বন্ধুবরেষু

অবতরণিকা

১

প্রকাণ্ড বাড়ি,—দক্ষিণে দুর্দমনীয় নদী ভাঙিতে-ভাঙিতে সামনের বাগানের ধারে আসিয়া থামিয়া পড়িয়াছে। বহুদূরবিস্তৃত চর। আগে ছিল ফেনপঙ্কিল লোনা জলের ঢেউ, এখন তৃণহীন শূন্য মাঠের। দক্ষিণের অবারিত দাক্ষিণ্য—হাওয়ায় একেবারে উড়াইয়া নেয়।

বার্ধক্যে অতিকায় বাড়িটা জীর্ণ হইয়া আসিলেও তাহার মধ্যে আভিজাত্যের লক্ষণ স্পষ্ট ধরা পড়ে—ফটকে, মণ্ডপে, এমন কি প্রাচীর-গাত্রে। একদিন এ-বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ লাগিয়া ছিল, দোল-দুর্গোৎসব হইতে শুরু করিয়া যম-পুকুরের ব্রতটি পর্যন্ত বাদ পড়িত না। এখন আর কিছুই নাই। পূজার বরাদ্দ টাকা উমাকান্ত এখন মদে উড়ায়।

বাড়ির মালিক এখন উমাকান্ত—বলিষ্ঠ দেহ, সর্ব অবয়বে উচ্ছ্বসিত দৃঢ়তা! বয়স ত্রিশের কোঠা পার হইয়াছে; অমায়িক প্রফুল্ল মুখ, কিন্তু চোখের দৃষ্টির অন্তরালে কি-একটা গূঢ় অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্কেত রহিয়াছে। উগ্রস্বভাব, উচ্ছৃঙ্খল—পরিণামের প্রতি একটি সবল ও দুঃসাহসিক উপেক্ষা।

সংসারে স্ত্রী সুমতি—আর বংশে বাতি দিবার জন্য নাবালক একটি শিশু। বিরাট পুরীর আনাচে-কানাচে পিসি-মাসির দল ছিটানো রহিয়াছে, উমাকান্তর সে-সব দিকে নজর নাই। সরকার তদারক করে, দাস-দাসীরা ছিনিমিনি খেলে, পিসি-মাসির দল কোঁদল করিয়া পাড়া জাঁকায়, আর সুমতি শ্রীমতী বধূটির মতো রোজ রাত্রে স্বামীর

প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনিয়া-গুনিয়া অবশেষে শয্যাপ্রান্তে বিধুর চন্দ্রলেখাটির মতো নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

উমাকান্ত কোনো কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না—খাও-দাও, পায়ের উপর পা তুলিয়া হাই তোল—সংসারে কে বা কাহার, কোথায়ই বা কে! চক্ষু বুজিলেই ফক্কিকার!

অতএব—

উমাকান্ত মদের বোতল লইয়া বাহিরের বৈঠকখানা হইতে একেবারে শুইবার ঘরে আসিয়া হাজির হইল। ঘরে ঢুকিয়া কাণ্ড দেখিয়া সুমতির চক্ষু স্থির! কোনোদিন স্বামীর বিরুদ্ধবাদিনী হয় নাই, শুধু সঙ্গবিমুখ থাকিয়া তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা হইতে সন্তর্পণে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু আজ আর সহিল না। সামনে আগাইয়া আসিয়া কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল: এ সব হচ্ছে কী?

নিতান্ত নির্লিপ্তের মত উমাকান্ত কহিল—দেখতেই তো পাচ্ছ।

সুমতি মদের বোতলটা সহসা কাড়িয়া নিয়া কহিল—এতদিন স্বচক্ষে দেখতে না পেলেও বুঝতে আমার আর কিছু বাকি ছিলো না। কিন্তু সব-কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত।

উমাকান্ত হাসিয়া কহিল—সব-কিছুরই সীমা হয়তো একটা আছে, কিন্তু মদ ও মন—দুয়েরই কোনো মাত্রা নেই। দাও, বাইরে যদি চলে, ঘরেও চলবে। বাইরে এত সব ভাগীদার জোটে যে তলানি ছাড়া কিছুই বড়ো আর জিভে ঠেকে না। দাও।

সুমতি দুই পা পিছাইয়া গেল: এ ঘর আমার, এর শুচিতা আমি নষ্ট হতে দেব না।

—কবিত্ব করে বলছ বটে, কিন্তু দায়ভাগের বিধান অনুসারে আমি স্বচ্ছন্দে তোমার দায় থেকে মুক্ত হতে পারি জানো? দাও, দাও, ইয়ার্কি করো না। তোমার ঘরের শুচিতা রাখবার জন্যেই তো বন্ধুদের আর

এখানে নিয়ে আসিনি। তারা এতক্ষণে হয়তো বৈঠকখানাটাকে ইন্দ্রসভা বানিয়ে ফেলেছে।

—যাও না সেখানে, এখানে মরতে এসেছ কেন?

উমাকান্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই উদাসীন স্বরে কহিল—মরতে ঠিক তোমার কাছে ফিরে আসবো কি না তার কোনো ঠিকানা নেই। কেননা সুমতি আমার হবে না কোনোদিন।

কথায় সুরে করুণ একটি বেদনাভাসের পরিচয় পাইয়া সুমতি নিজের রূঢ় ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইল। কহিল—কিন্তু এমন উচ্ছৃঙ্খল হলে মরবার আর বাকি কী?

—যেটুকু বাকি আছে সেই ক'টি মুহূর্তকেই ফেনিল করে পান করে যাই, সুমতি। দাও, তোমার যৌবনের চেয়ে এই রঙিন বোতলটায় বেশি স্বাদ। বলিয়া বোতলটা ছিনাইয়া লইবার জন্য উমাকান্ত সহসা স্ত্রীকে জড়াইয়া ধরিল।

সুমতি সেই আলিঙ্গনে বশ্যতা স্বীকার করিল বটে, কিন্তু সামনের খোলা জানালা দিয়া বোতলটা বাহিরের উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

উমাকান্ত স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিয়া জানালায় ঝুঁকিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল: আহাহা! মদটার কত দাম জানো? তোমাকে ত্যাগ করে বছরে তোমাকে ঐ টাকায় খোরপোশ দিলে তুমি নেহাৎ অসন্তুষ্ট হতে না। কিন্তু তোমাকে ত্যাগ করতে চাই না বলেই তো তোমার শরণ নিয়েছিলাম। কৈ তুমি আমাকে এই পাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, না, আবার তারি দিকে ঠেলে দিচ্ছ। এখন আমার বন্ধুদের মহলে না গিয়ে আর উপায় কি! মদের সঙ্গে তোমার উপদেশ আর পাঞ্চ্ করে খাওয়া হল না। কে জানে হয়তো একসময় তোমার উপদেশেই বেশি নেশা লেগে যেত। মদ যেত মিইয়ে।

বলিয়া সে দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিল : বোতলটা যখন শব্দ করে ভেঙে গেলো, তখন তার আর্তনাদটা কেমন চমৎকার লেগেছিলো বল তো। আমি মরে গেলে তুমি অমনি অকপটে চীৎকার করতে পারবে?

স্বামী অন্তর্হিত হইয়া গেলে সুমতি দুই চোখে আর পথ খুঁজিয়া পাইল না। স্বামীকে সে কি করিয়া ফিরাইবে? উপদেশ শুনিলে উপহাস করেন; স্ত্রীর পক্ষে পরমতম শাসন সহশয়নবিমুখতা—তাহাতেও উমাকান্তর অরুচি নাই। অশ্রুজল? উমাকান্ত প্রবোধ দিয়া বলে : লোনা জলে এমন সোনালি নেশা তুমি মাটি কোরো না, লক্ষ্মীটি। তবে কি সুমতি আত্মহত্যা করিবে? তাহাতে উমাকান্ত নামের সঙ্গতি রাখিয়া একেবারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া যাইবে আর কি। বরং বিড়ালের ভাগ্যে ছিকে ছিঁড়িবে মাত্র। এই ফাঁকে একটি চারুবর্ধনা কিশোরীর মুখমদিরা পান করিয়া ফিকে রাত্রিগুলা সে রঙিন করিয়া তুলিবে মাত্র। স্বামীকে সুমতি এইভাবে জিতিতে দিবে না।

দেয়ালের বড়ো আয়নাটাতে ছায়া পড়িতেই সুমতি থামিল। সে যে কত সুন্দর এই কথা কোনো পুরুষের মুখে শুনিয়া সে রোমাঞ্চিত হইতে চায় না, নিজেরই রূপে সে অন্তরে-দেহে একটি স্বাদময় স্নিগ্ধ মাদকতা অনুভব করিল। যৌবন আজ আর তাহার বর্ণলীলায় উজ্জ্বল নয়, একটি স্থির শ্যামল সুষমা তাহার যৌবনকে শীতল, শুচিস্মিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রগল্‌ভ প্রাচুর্য নয়, একটি অবারিত স্নিগ্ধতা! মুখমণ্ডল মাতৃত্বমণ্ডিত, পাতিব্রত্যের দীপ্তি ললাটে বিচ্ছুরিত হইতেছে। দেহ তার লাবণ্যের নদী নয়, লাবণ্যের লেখা!

কিন্তু এই ধীর-নীর প্রশান্ত হ্রদে উমাকান্ত অবগাহন করে না; সে চায় উত্তুঙ্গ ফেনসঙ্কুল বিশাল সমুদ্র! সে চায় আবর্তময় পরিবর্তন। সে চায় চঞ্চলতা!

উমাকান্ত আজকাল শুইবার ঘরে বসিয়াই মদ খায়। প্রসাদভোজী বন্ধুদের সংসর্গ হইতে স্বামীকে সরাইয়া আনিলেও শয়নগৃহ সুমতির কাছে সুখস্বর্গ হইয়া উঠে নাই।

তবু স্বামীকে নিজের কাছে বসাইয়া গ্লাসে মদ ঢালিয়া দিতে সে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। প্রতিদিন একটু-একটু করিয়া পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু একটা বোতল কখন সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইবে এ সম্বন্ধে উমাকান্তের অটুট দিব্যজ্ঞান দেখিয়া সুমতি হতাশ হয়।

খামখেয়ালি মাতালের নির্লজ্জ আবদার রাখিতে গিয়া সুমতি একেবারে দেউলে হইয়া পড়ে। শালীনতার খোলসটুকুও বিসর্জন দিতে হয়। তবু স্বামীকে সে বিপণিবীথিকার ক্রেতা হইতে দিবে না।

উমাকান্ত বলে: এইবার নাচটা শিখতে পারলেই তোমাকে সোনার ঘুঙুর গড়িয়ে দেব, সুমতি! তোমাদের যে বেহুলা, সেও স্বামীর জন্যে স্বর্গসভায় গিয়ে নেচেছিলো, খবরটা রাখ তো?

স্বামীকে অবশেষে ঘুম পাড়াইয়া অসহায় সুমতি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে বসে। স্বামীর জন্যে নয়, সন্তানের জন্য। মানব যেন মানুষ হয়। মানব যেন মায়ের মান রাখিতে পারে।

দিনের পর দিন এই কুৎসিত একঘেয়েমি সুমতিকে ক্লান্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু একদিন তাহার আর সহিল না। স্পষ্ট করিয়া প্রখরকণ্ঠে সে কহিল, —মদ আজ আর পাচ্ছ না।

উমাকান্ত বিচলিত হইল না, কোঁচাটা ঝাড়িয়া গোঁফের দুই প্রান্তে তা দিতে-দিতে সে খাটের উপর বসিল। মৃদু-মৃদু হাসিয়া কহিল—আজকে মহারাণীর হঠাৎ এই কার্পণ্য কেন? আমাকে অন্তর থেকে বর্জন করতে গিয়ে একেবারে অন্দর থেকেই তাড়িয়ে দিতে চাও নাকি?

সুমতি স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল—তুমি সর্বনাশের শেষ সীমায় এসে পৌচেছ, জানো?

উমাকান্ত হাসিয়া কহিল—যার সর্ব আছে, তারই সর্বনাশের নেশা করতে সাধ যায়, সুমতি। যার কিছুই নেই সেই নেংটি পরে সন্ন্যাসী সাজে, তাতে তার খর্বতার সমর্থনও সহজেই মিলে যায়। স্বভাবেই যে ক্লীব, সহজেই সে ব্রহ্মচারী!

সুমতি দৃঢ়ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া বলিল—অতশত আমি বুঝি না। মদের জন্য তুমি নাকি আজকাল ধার করতে শুরু করেছ?

—আজকাল মানে? বহুদিন থেকে। খবরটা তুমি আজ পেলে বুঝি? তোমার শ্বশুরকুলের এত সুবুদ্ধি ছিল না সুমতি, যে, আমার এই রসের জন্যে অপর্যাপ্ত রসদ জোগান। কয়েক বিঘে জমি আর এই বাড়িটুকু! দাম কষে দেখলে মোটমাট পাঁচ লাখ পেগ্ মাত্র। দিনে আট-দশ পেগ্ সাবাড় করলে কত দিনে সম্পত্তি পটল তোলে একটু হিসেব করে দেখ না।

সুমতি ভয়ার্তকণ্ঠে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল: তুমি এ বলছ কী? এমনি করে তুমি সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে দিতে বসেছ নাকি?

উমাকান্ত নির্লিপ্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল: তোমার শ্বশুরের হাতে সম্পত্তিটা উড়েই এসেছিলো। যা উড়ে আসে তা কখনো জুড়ে বসে না, সুমতি। প্রজা ঠেঙিয়ে, তাদের পাকা ধানে মই দিয়ে, খাজনা না পেয়ে তার প্রতিবিধানে নারীর অমর্যাদা করে, খুন-খারাপি, লুঠ-তরাজ, দাঙ্গা-লড়াই—সব কিছু সাবেকি অত্যাচার করেই আমার প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেব এই ঐহিক কীর্তিটি অর্জন করেছিলেন। এ-গ্রামে ভুলে এখনো কেউ তাঁর নাম নিলে তাকে নাকি উপোস করতে হয়। কত লোকের অভিশাপ কুড়িয়ে তাঁর এই সম্পত্তি—আমার হাতে এর চেয়ে আর কী এমন সদ্ব্যয় হতে পারতো? আমি তাঁরই উপযুক্ত উত্তরাধিকারী—একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি।

বলিয়াই উমাকান্ত অজস্র হাসিতে রুদ্ধশ্বাস ঘরের অটল স্তব্ধতাকে চূর্ণ-চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

খানিকক্ষণ সুমতি কথা কহিতে পারিল না। অপলকে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—সে-মুখে চিন্তা বা অনুশোচনার একটিও ক্ষীণ রেখা নাই, অনির্ণীত ভবিষ্যতের দুঃখ-দুর্দশার চির-রাত্রির ছায়া সেই মুখকে ম্লান করে নাই—সে-মুখ পাষাণ-ফলকে খোদিত রেখামূর্তির মতো প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ! উমাকান্ত স্ত্রীর হাতে একটা ছোট ঠেলা দিয়া অনুনয় করিয়া কহিল—নিয়ে এসো। বিধাতা নারীদেহলতিকায় যেমন মধু দিয়েছেন তেমনি দ্রাক্ষালতায় দিয়েছেন মদিরা। লগ্ন যে উৎরে যাচ্ছে, সুমতি।

সুমতি সরিয়া বসিল; কহিল—কিন্তু মানবের কী হবে?

উমাকান্তের সেই উদাসীন কণ্ঠ: যা হবার তাই হবে। সে-ভাবনা ভেবে এই সোনার সন্ধ্যাটা তুমি ঘোলাটে করে তুলো না। দাও, চাবিটা আমাকেই দাও না-হয়।

বলিয়া উমাকান্ত সুমতির আঁচল চাপিয়া ধরিল।

সুমতি আঁচলটাকে শিথিলতর করিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল: তুমি মানুকে পথে বসাতে চাও নাকি?

উমাকান্ত সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল—যদি নিতান্ত ভয় না পাও, তো বলি, মানুকে আমি পথেই বসিয়ে যেতে চাই। যে-টাকা ও নিজে রোজগার করেনি, অনায়াসে তা লাভ করে তার বদলে ও যেন ওর মনুষ্যত্ব খুইয়ে বসে না। ওকে আমি একেবারে গরিব করে রেখে যেতে চাই। কিন্তু এ কথাগুলি নেহাৎ শাদা চোখে কইছি বলে তোমার কাছে নিশ্চয়ই খুব মানানসই ঠেকছে না, না? দাও চাবি।

উমাকান্ত শ্লথবন্ধ আঁচলটা আরো জোরে আকর্ষণ করিল।

সুমতি বাঁকিয়া বসিল: ককখনো দেব না।

—দেবে না মানে?

—দেব না মানে দেব না। তুমি এমনি মদের গেলাসে সমস্ত সম্পত্তি

ফুঁকে দেবে, মানুষকে পথের ভিখিরি করে ছাড়বে—আর আমিই কি না পরিমাণ কমাবার চেষ্টায় তোমাকে নিজের হাতে মদ ঢেলে দেব! ককখনো আর না, মরে গেলেও না। সরকার-মশায়ের খবরটা ভাসা-ভাসা করে পেয়েও তখনো বিশ্বাস করিনি।

উমাকান্ত পিশাচের মতো অট্টহাস্য করিয়া উঠিল: শুধু মানু নয়, দয়া করে তার মায়ের কথাও মনে রেখো সুমতি। এই ঐশ্বর্য সম্ভোগ করবারই বা তোমার কি এমন অধিকার ছিলো? গরিবের ঘরের মেয়ে, দু' বেলা পেট পুরে খাওয়াও জুট্‌তো না সব দিন—গাছের তলাটাই তো গন্তব্য ছিল! আঙুল ফুলে যে কলা-গাছ হয় তার এটা মনে রাখা ভালো—কলার ফসল একবারের বেশি ফলে না।

সুমতি দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল—আমার জন্যে তোমাকে কে বলতে এসেছে? কিন্তু সন্তানের বাপ হয়ে তুমি তার ভবিষ্যৎ এমন নষ্ট করে দিতে চাও—তুমি কি মানুষ?

উমাকান্ত কহিল—তোমার কাজ প্রসব করা, প্রস্তুত করা নয়। সে দায়িত্ব আমার, সে আমি বুঝবো।

—সেই বুঝেই তো এই সব কীর্তি করে চলেছ? লজ্জা করে না? বাপ সন্তানের চোখে কোথায় একটা ভালো দৃষ্টান্ত ধরে রাখে, তা নয় এ কী জঘন্য কদাচার!

উমাকান্ত বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া কহিল—আমার এই ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার মতো মহৎ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কী হতে পারে? তুমি মেয়েমানুষ—এর মর্যাদা বোঝবার মতো তোমার মস্তিষ্ক নেই। কিন্তু বৃথা কথা কাটাকাটি করে তো কিছু লাভ নেই। আমার অনুরোধ যদি না শোন তবে তোমার কোনো বাধাও আমি মানবো না।

সুমতি বিস্তৃত আঁচলটাকে বুকের উপর রাশীকৃত করিতে-করিতে স্বামীর কাছে আগাইয়া আসিল। অসহায়ের যে কণ্ঠস্বর সেই

অনুনয়ময় ভাষায় সে কহিল—তুমি কিছুতেই কি এই অভ্যাস ছাড়তে পারো না ?

উমাকান্তর ভাষা নিদারুণ, নিষ্ঠুর: কিছুতেই না, কোনো যুক্তিতেই না। যা আমার ভালো লাগে তাই আমার ধর্ম ! তোমরা যাকে পাপ বলো সেই আমার ভালো লাগে। স্বাস্থ্যের ওজর তোল, বলবো পেট ফেঁপেও টেঁসে যেতে পারি। সমাজহিতের কথা তোল, বলবো যা সম্পূর্ণ আজ, তাই আমার সমাজ। অত কাছে সরে এসো না। তোমার দৈহিক সান্নিধ্যে এত মাদকতা নেই যে তোমার দেহকেই আমি মদের গ্লাস বলে চুমুক দেব।

উমাকান্ত সহসা স্ত্রীর হাত চাপিয়া ধরিল: আমাকে বাধা দেবার তোমার অধিকার আছে কি না জানি না, কিন্তু শক্তি নেই। চাবি দাও। পাকস্থলীতে 'লেবার মুভ্‌মেণ্ট' চলেছে।

সুমতি এক ঝট্‌কায় হাত কাড়িয়া নিয়া দূরে সরিয়া গেল: কক্‌খনো দেব না চাবি। দেখি তুমি কি করতে পারো।

উমাকান্ত কহিল—অনেক কিছুই করতে পারি। গায়ে হাত তুলতে পারি, ঘাড় ধরে দেউড়ির বার করে দিতে পারি, ইচ্ছা করলে টুঁটিটা টিপে ধরে বোবাও করে দিতে পারি। কিন্তু দু' পাত্র বেশি খাওয়া ছাড়া কিছুই হয় তো আমি করবো না। স্নায়ুগুলোকে অকারণে উত্তেজিত করতে ইচ্ছে নেই। লাভ কি ?

সুমতি ঝংকার দিয়া উঠিল: কিন্তু আমি কি করতে পারি জানো ?

—আফিং খেয়ে বড় জোর জুড়িয়ে যেতে পারো। লাভের মধ্যে মদ তা হলে আর জুড়োয় না কোনোদিন।

সুমতি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি মরে গেলে তুমি ফের বিয়ে করবে তো ?

—বিয়ে করবার ইচ্ছে থাকলে তুমি বেঁচে থাকতেও করতে পারতাম।

ওটায় বৈচিত্র্য নেই বলে স্বাদ নেই। তুমি যদি আমার স্ত্রী না হয়ে রক্ষিতা হতে তবে তোমার সম্পর্কে হয় তো মাধুর্য থাক্‌তো! তুমি চলে যাচ্ছ কি রকম? চাবি দিয়ে যাও।

অপস্রিয়মান সুমতিকে উমাকান্ত ধরিয়া ফেলিল: এই তোমার প্রতিশোধের নমুনা? মাত্র ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া? মৌলিক আর কিছুই ভাবতে পারলে না?

—আমাকে কেটে ফেললেও আমি চাবি দেব না।

—বেশ, দিয়ো না। বলিয়া সুমতিকে ছাড়িয়া দিয়া উমাকান্ত কোনোদিকেই দৃকপাত না করিয়া একটা কাঠের চেয়ার তুলিয়া আলমারির উপরে জোরে ছুঁড়িয়া মারিল। পুরু কাঁচের দরজা—প্রবল ঘায়ে খান্‌খান্‌ হইয়া গেল। ফাঁকের ভিতরে হাত বাড়াইয়া স্কচ্‌ হুইস্কির বোতলটা বাহির করিতে তাহার দেরি হইল না।

বোতলের ছিপিটা দাঁতে কামড়াইয়া খুলিতে-খুলিতে উমাকান্ত কহিল,—কাঁচের আলমারি তোমরাও, কিন্তু দেহের অন্তরালে এর মতো তোমাদের আত্মার সম্পদ কোথাও নেই, সুমতি। তোমরা অন্তঃসারশূন্য।

বোতলের মুখটা মুখ-গহ্বরে উমাকান্ত প্রায় উপুড় করিয়া ধরিবে, একটা দুর্ধর্ষ ঈগলের মতো সুমতি দুই হাত তুলিয়া তাহার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বোতলটা মেঝের উপর ছিটকাইয়া চুরমার হইয়া গেল, উমাকান্তর জামা-কাপড়ের আর কোনো শ্রী রহিল না। উৎকট উগ্র গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

উমাকান্ত অসংযমী এ কথা কে বলিবে? ম্রিয়মান মুখে বোতলটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাসিয়া কহিল—ওর দুর্দশা দেখে আমার খালি একটা উপমা মনে পড়ছে, সুমতি। যৌবনে প্রথম প্রেম যখন ব্যর্থ হয় তখন তার বেদনার মূর্তিটা বোধ করি এমনিই। কিন্তু বাইরেই যখন আমাকে ঠেলে দিচ্ছ তখন আমাকেই আবার

তোমার একদিন অনুগমন করতে হবে। বেশি আর দেরি নেই। হীরালাল মুখুজ্জে শিগগিরই আসচে ক্রোক করতে।

উমাকান্ত বাহিরের দরজা দিয়া অন্তর্ধান করিতেছিল, সুমতি সহসা তাহার পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া কাতর কাকুতিতে আর্তনাদ করিয়া উঠিল : তুমি যেয়ো না, দাঁড়াও—

উমাকান্ত দাঁড়াইল না।

২

রাত্রির পুঞ্জীকৃত স্তব্ধতা সরাইয়া অজস্র-বন্যায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল। খোলা জানালায় বসিয়া সুমতি কখন এই তামসী রাত্রির সঙ্গে মিতালি পাতাইয়াছে!

স্বামী কখন ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্য সে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে নাই, সে প্রতীক্ষা করিতেছে আকাশপ্রান্তে তিমিরাপসরণের প্রথম রোমাঞ্চময় রঙিন মুহূর্তটিকে!

এই বর্ণচ্ছটাহীন আকাশ তাহার জীবন—এমনি মেঘ-মন্থর, বেদনা-বিহ্বল; এই করুণাহীন অন্ধকার তাহার স্বামি-সান্নিধ্যের বীভৎস প্রতিবেশ; তাহার সন্তান তাহার অসাড় আকাশে অরুণোদয়ের প্রথম-রোমাঞ্চময় রঙিন মুহূর্ত!

কত কথাই আজ সুমতির মনে পড়িতেছিল—কত দিনের কত অস্পষ্ট কাহিনী। অতীতের সেই সব মুহূর্তগুলি ম্রিয়মান চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সেই তাহার প্রথম বিবাহ-রাত্রি, স্তূপীকৃত বসনের অন্তরালে সে সেদিন সর্বাঙ্গে তারকিনী রাত্রির সুখাবেশ সম্ভোগ করিয়াছিল; তাহার পর স্বামীর প্রথম স্পর্শে সে সহসা প্রতি ধমনীতে রমণী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই শিহরণটি প্রত্যহের অভ্যাসে মলিন হইয়া গিয়াছে! তাহার পর তাহার প্রথম সন্তান-সম্ভাবনার গৌরবময় স্বপ্ন! প্রতি রোমকূপে তাহার অমৃতস্বাদ! কিন্তু সেই অমৃত আজ মৃতস্বাদ হইয়া গেছে।

সুমতি আর অমিতাচারী ব্যভিচারী স্বামীর স্ত্রী নয়, সন্তানের মাতা—

একটি সুমহান আবির্ভাবের প্রস্তুতি। ঋষিকণ্ঠে যেমন সূক্তি, কবিচিত্তে যেমন ধ্যানছায়া, ভারতবর্ষের যেমন স্বাধীনতা—সুমতির তেমনি মানব। মানব তাহার মায়ের রচনা, মায়ের ধ্যান, মায়ের উপলব্ধি।

ঘুমের মধ্যে মানব হঠাৎ স্বপ্ন দেখিয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিতেই সুমতি তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল, ডাকিল : মানু!

ঘুমের ঘোরে মানব সাড়া দিতে পারিল না। অতিললিত গভীর পরিচয়ের সুরে মানুষ যেমন করিয়া দেবতাকে ডাকে, তেমনি ভাবে কানের কাছে মুখ নিয়া সুমতি আবার ডাকিল : মানু!

এই ডাকেই সুমতির এতদিনের বঞ্চিত প্রার্থনার সান্ত্বনা মিলে। এই ডাকটিই তাহার সফল স্বপ্ন! শৃংখলে ঝংকার!

মানু তো মাত্র এই শ্রাবণে আটের কোঠা ডিঙাইয়াছে। তবু তাহার দুই চোখের বাতায়নের মধ্য দিয়া সুমতি অনাবিষ্কৃত উন্মুক্ত আকাশের সন্ধান পায়।

রাত অনেক হইয়াছে, সুমতির ঘুম আসিতেছে না। হঠাৎ জানালার বাহিরে মানদাকে এদিকে আসিতে দেখিয়া সে একটু আশ্চর্য হইল। মানদা এ-বাড়ির পুরানো ঝি, বুকে করিয়া উমাকান্তকে সে মানুষ করিয়াছে। যদি উমাকান্তকে কেহ ধমক দিতে পারিত, তবে সে এই মানদাই। সুমতিরও তাহাকে সমিহ করিয়া চলিতে হয়।

মানদা জানালার কাছে আসিয়া সুমতিকে ঝাঁঝালো গলায় বকিয়া উঠিল: তুই কেমনতরো মেয়ে শুনি? সোয়ামিকে আবার বাইরে পাঠিয়েছিস্?

সুমতি ভয় পাইয়া দরজা খুলিয়া দালানে আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল—কেন, কি হয়েছে?

—কী হয়েছে? চুচ্চুরে মাতাল হয়ে এসে বাইরের ঘরে ফরাসে গড়াগড়ি

যাচ্ছে। বললাম, শুতে চল, উমাকান্ত। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে উমাকান্ত বললে—সুমতি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, মানি-মা।

সুমতির বিস্ময়ের সীমা রহিল না : উনি কেঁদে উঠলেন? তুমি বল কি, মানি-মা? তুমি ওঁর চোখে জল দেখলে?

—দেখলাম না? স্ত্রী স্বামীকে তাড়িয়ে দরজায় খিল এঁটে দিলে কোন্ স্বামীর না দুঃখ হয়! তুই হাসছিস কি পোড়ারমুখি? কোথায় তুই তোর স্বামীকে আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখবি, না, তাকে নিয়ে তুই ঘুড়ি ওড়াচ্ছিস্। যা করুক, গায়ে তো আর তোর হাত তোলে না! রুপোর খাটে পা রেখে সোনার খাটে শুস্—এত দেমাক তোর কেমন করে হয়?

একটু মলিন হাসি সুমতির ঠোঁটের প্রান্তে ভাসিয়া উঠিল : তুমি বললে না কেন মানি-মা, ঐ স্ত্রীর চুলের ঝুঁটি ধরে এক্ষুনি ওটাকে হিড়-হিড় করে টেনে কাঁটা-বনে ফেলে দিয়ে এস। ওর সাধ্য কি তোমাকে বাধা দেয়? ওর সাধ্য কি তোমার মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে রাখে?

—বলিনি? একশো বার বলেছি। তোমারই তো ঘর-দোর উমাকান্ত, সোনার সংসারে তোমারই তো সোনার সিংহাসন।

—উনি কি বললেন?

—সেই কান্না! খালি বলছে সুমতি আমাকে ডেকে না নিয়ে গেলে কখনোই আমি শুতে যাবো না, মানি-মা!

কথা শুনিয়া সুমতি একেবারে আকাশ হইতে পড়িল আর-কি : তুমি বলছ কী, মানি-মা? তুমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখে উঠে এলে নাকি?

—স্বপ্ন! মানদা সুমতির একটা হাত ধরিয়া তাহাকে সামনের দিকে টানিতে টানিতে কহিল—তুই নিজের চোখে দেখবি আয়।

সুমতি হাসিয়া কহিল—নিজের চোখে অনেক দেখেছি, দেখতে-দেখতে চোখ আমার ক্ষয়ে গেছে।

—কিন্তু তোর জন্যে আজ সে কাঁদছে, দেখবি আয়। এর আগে দেখেছিস কোনোদিন?

—আমার জন্যে নয় মানি-না, মাত্রাটা বোধহয় আজ বেশি হয়েছে।

—তবু বৈঠকখানায় একবার যাবি চল্।

—অত লোভ না দেখালেও আমাকে যেতে হতো। স্বামী মাতাল হয়ে বাইরের ঘরে পড়ে আছেন, আর আমি তাঁর সেবা করবো না? বমি কাচাবো না? সে আর বলতে! তুমি ততক্ষণ মামুর কাছে একটু বোস, আমি যাই, দেখি গিয়ে নিজের চোখে।

সুমতি নিজের অলক্ষিতেই বেশ-বাস বিন্যস্ত করিয়া লইল, সর্বাঙ্গে তাহার নূতন ব্রীড়ার মন্থরতা! দালান পার হইয়া তবে বৈঠকখানায় ঢুকিতে হইবে—অনেকটা পথ। এতটা পথ পার হইতে-হইতে সে তাহার স্নায়ু-শিরায় যেন ঝংকার শুনিতেছে! বিবাহের পর প্রথম রাত্রি যাপন করিবার জন্য সে যেমন কুণ্ঠিতকায়ে লজ্জাবিজড়িত পায়ে স্বামী-শয্যার সম্মুখীন হইয়াছিল—এ যেন তেমনি! প্রশস্ত ফরাশে স্বামী অসুস্থ শরীরে একা শুইয়া আছেন অর্ধ-অচেতন, ঘরের পুঞ্জিত অন্ধকার যেন সুমতিরই প্রতীক্ষার স্বপ্নে মৌনমগ্ন হইয়া আছে!

আকাশে খানিক-খানিক মেঘ করিয়াছে, তন্দ্রা-স্তিমিত চোখে দু-একটা তারা গাছের শিয়রে জ্বলিতেছে—সুমতিকে পরিবেষ্টন করিয়া একটি অনির্বচনীয় স্তব্ধতা—কুমারীর প্রথম প্রেমানুভবের মতো! আজিকার এই রাত্রি, মেঘঘন ম্লান মুহূর্ত ক'টি, এই একটি গোপনলালিত ভঙ্গুর আশা—সুমতি সর্বদেহ ঘিরিয়া যৌবনের একটি প্রখর ও স্পন্দমান শিহরণ অনুভব করিল! স্বামী তাহাকে ডাকিয়াছেন—এই তাহার আকাশময় ঐশ্বর্য! মানদা কি আর গায়ে পড়িয়া মিথ্যা কথা বলিতে আসিয়াছিল?

বৈঠকখানার দরজার কাছে আসিয়া সুমতি থামিল। ভিতর হইতে

একটা চাপা পরিশ্রান্ত আর্তস্বর কানে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি ভেজানো দরজাটা ধাক্কা মারিয়া খুলিয়া দিল।

অস্পষ্ট অন্ধকারেও সে সমস্ত দৃশ্যটি একমুহূর্তে আয়ত্ত করিয়া লইল। অত্যন্ত ক্লান্ত ভঙ্গিতে স্বামী ফরাশের উপর লুণ্ঠিত হইয়া আছেন,—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল, বসন বিন্যাসহীন! তবু আজিকার এই স্তব্ধ রাত্রে কি-একটা নিবিড় আবেশ সুমতিকে ঘিরিয়া ধরিল। খোলা জানালার বাহিরে নিষ্পাদপ শূন্য মাঠ ও তাহার উপরে অতন্দ্র স্তব্ধ অন্ধকার—একটি ভাবঘন প্রতিবেশে সুমতি সহসা স্বামীর প্রতি কী যে গভীর মায়া অনুভব করিল তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

সুমতি ধীরে স্বামীর শিয়রের কাছে বসিল। রুক্ষ অসংস্কৃত চুলগুলিতে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে সহসা তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া কেন যে জল নামিয়া আসিল, কে জানে!

স্বামীকে কেন যেন তাহার অত্যন্ত দুঃখী, অত্যন্ত বঞ্চিত মনে হইল। কখন তাঁহার মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বেদনায় একেবারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে সে-দিকে এতটুকু তাহার খেয়াল ছিল না।

কতক্ষণ পরে উমাকান্ত কথা কহিল—কে, সুমতি?

সুমতি নীরবে স্বামীর কপালে করতলখানি বিস্তৃত করিয়া রাখিল। একটিও কথা কহিল না, উঠিয়া বাতিটা জ্বালাইলেই এই সুকোমল দৃশ্যটি অসম্পূর্ণ আলোকে যেন একেবারে মাটি হইয়া যাইবে!

উমাকান্তও নিঃশব্দে স্ত্রীর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া একটি সুরক্ষিত দুর্গের আশ্রয়ে বিশ্রামের সুখস্বাদ অনুভব করিতেছিল।

এই অবিচল স্তব্ধতাতে যেন দুইজনের পরম আত্মীয়তা!

উমাকান্তই আবার কথা কহিল—তুমি ঘুমুতে যাবে না, সুমতি?

কথার সুর কেমন করুণ!

সুমতি ফরাশের উপর পা দুইটি তুলিয়া সান্নিধ্যে ঘনতর হইয়া বসিল, কহিল—খুব বেশি ঘুম পেলে এখেনেই তোমার পাশে শুয়ে পড়ব না-হয়।

কথার সুরে অযাচিত করুণা!

হঠাৎ উমাকান্তও দুই হাতে সুমতিকে বুকের কাছে আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ কণ্ঠে কহিল—আমার সঙ্গে তুমি গরিব হতে পারবে, সুমতি? এই দালান-বালাখানা ছেড়ে আমার হাত ধরে তুমি পথের ধুলোয় নেমে আসতে পারবে? পারবে না?

নিশীথরাত্রি মন্ত্র জানে। সুমতি স্বামার বুকের মধ্যে বড় সুখে মুখ গুঁজিয়া গদ্‌গদ স্বরে কহিল—খুব পারব।

—সত্য-সত্য পথের ধূলায়। মাথার উপরে ছাত নেই—রূঢ় রৌদ্র, রুক্ষ আকাশ। ঘর ছেড়ে ঝড়, ছায়া ছেড়ে শূন্যতা। শুতে বিছানা পর্যন্ত পাবে না।

স্বামীর প্রসারিত বুকের উপর মাথা এলাইয়া অস্ফুটস্বরে সুমতি বলিল—এই তো আমার বিছানা। তোমাকে সত্যই যদি পাই, পাবার মতোই পাই যদি, তবে দালান বিলিয়ে দিতে পারি। গাছের তলায় তত সুখ ইন্দ্রাণীও কল্পনা করিতে পারে না।

উমাকান্ত হাসিয়া বলিল—তা ইন্দ্রাণীর দুর্ভাগ্য। তোমরা নেহাৎ সতী হবে বলেই তোমাদের এই অকর্মণ্য ভাবপ্রবণতাকে ক্ষমা করতে হয়। কিন্তু কথাটা তুমি সত্যই মন থেকে বলছ, সুমতি?

স্পর্শবিহ্বল হইয়া সুমতি বলিয়া বসিল—মন থেকেই বলছি বৈ কি। ভাগ্য যদি বিরূপ হয়, তবে পথ ছাড়া আর গতি কৈ? তোমাকে পেলে আমার আর দুঃখ কী!

—আমাকে পাওয়া মানে, আমি মদ ছেড়ে ভালোমানুষটির মতো তোমার আঁচল ধরে অচপল থাকবো— এই তো? অবিকল তাই তো

হতে চলেছে। আমার মদ খাবার জন্য একটা কাণাকড়িও এ-বাড়ির আনাচে-কানাচে আর কোনোদিন মিলবে না, সুমতি।

সুমতি চমকিয়া উঠিল—ব্যাপার কি ?

—যা তোমাকে এতক্ষণ কবিত্ব করে বললাম—সেই গাছতলা, সেই আকাশময় আশ্রয়হীনতা, আর এই শূন্য শুষ্ক উদর। ভাষাটা মোলায়েম বলে অর্থটাও কিন্তু তদনুপাতে রুচিকর নয়।

সুমতি ভয় পাইয়া স্বামীকে আঁকড়াইয়া ধরিল—তুমি এ-সব বলছ কী ?

নির্লিপ্তের মত উমাকান্ত বলিতে লাগিল—জীবনের ভীষণতম দুর্ভাগ্যকে খুব নিরাকুল সুস্থ চিত্তে গ্রহণ না করলে সে দুঃখকে অপমান করা হয়। ছিলাম মসনদে, এখন নর্দমায়। গাছতলায় মানে ছায়াবীথিতলে নয়, দস্তুরমত গাছতলায়।

সুমতি আর্তনাদ করিয়া উঠিল—এ-সব তুমি কি বলছ ?

সুমতির ঘুমমালিন্য ময় মুখখানি ধীরে-ধীরে বুকের উপর শোয়াইয়া দিয়া শ্যামসঙ্কেতহীন দূর বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে চাহিয়া উমাকান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; কহিল—সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি কায়-কারবার দু-গ্রাস মদেই ডুবে গেল, সুমতি। হীরালালবাবুর কাছে সমস্ত কিছু বন্ধক ছিলো, ধার শোধ করবার ধার দিয়েও যাইনি বলে সপরিবারে আমি তাঁর বন্ধনে। তিনি হুকুম করলেই তা তামিল করতে আমাদের গাছতলার আশ্রয় নিতে হবে। পরোয়ানা এই এসে গেল বলে। তবু কিছু আমি কেয়ার করি না।

প্রচণ্ড আঘাতে সুমতি তাহার কামনীয় উপাধান হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। সোজা হইয়া বসিয়া ভয়ার্ত বিবর্ণমুখে সে হাহাকারের মতো বলিয়া উঠিল—সত্যি ? সরকার-মহাশয়ের কাছে সেদিন যা শুনছিলাম তার একবর্ণও তাহলে মিথ্যা নয় ?

উমাকান্ত শ্লথপদে জানালার কাছে উঠিয়া আসিয়া কহিল—এক বিন্দু

নয়। বরং সর্বনাশের পরিমাণ যে কতোখানি সে-ধারণা তাঁর ছিলো না, সে-ধারণা করবার মতো উদার মনোবৃত্তি সংসারে দুর্লভ, সুমতি। এই সর্বনাশের মধ্যেও একটা উগ্র নেশা আছে—ঠিক একটা হাউইর ফেটে যাওয়ার মতো। তুমি ছেলেমানুষের মতো গলে গিয়ে এত কাঁদছো কেন? এতে হয়েছে কী?

সরিয়া আসিয়া উমাকান্ত স্ত্রীকে নিবিড় সহানুভূতিতে কাছে টানিতে গেল। সুমতি এক ঝটকায় উদ্যত আলিঙ্গন ফেলিয়া দিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

উমাকান্ত কহিল—সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে তুমি একটা মজা পাচ্ছ না? ছিলাম জমিদার, এখন হতে চলেছি জমাদার—এর মধ্যে একটা প্রবল রোমাঞ্চ আছে। ভাগ্যের চাকা প্রতি মুহূর্তে ঘুরে যাচ্ছে—এর জন্যে শোক করার মতো মূর্খতা নেই। জীবনে এই তো মজা। একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার মতো আনন্দ আর আছে কিসে?

উমাকান্ত আবার স্ত্রীকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া কোমল করিয়া কহিল—আমার সঙ্গে তুমি গরিব হতে পারবে না সুমতি? পথের ধারে ছোট্ট পাতার কুঁড়ে ঘরে আমি আর তুমি মানবকে নিয়ে নতুন জীবন সুরু করবো—এই আরম্ভের আস্বাদ নিতে তোমার লোভ হয় না একটুও?

সুমতি গম্ভীর; দুই চোখ দিয়া অশ্রুরেখা নামিয়া আসিয়াছে।

উমাকান্ত তাহার চুলগুলিতে হাত ডুবাইয়া কহিল—মানবের জন্যে কিছু তুমি ভেবো না। একমাত্র জন্মের সার্টিফিকেটে হাত পেতেই এতো সহজে আমি যদি এই প্রকাণ্ড সম্পত্তিটা না পেতাম তো এমন করে হয় তো দেহে মনে ব্যর্থ হয়ে যেতাম না। মানব জীবনে বহুতর আঘাত পাক, বহুতর দারিদ্র্যের সঙ্গে সে সংগ্রাম করুক—মা হয়ে এই তাকে আশীর্বাদ কোরো।

সুমতি একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেছে।

স্বামী তাহার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন কি না তাহাই সে ভাবিয়া পাইতেছে না।

উমাকান্ত আবার কহিল—থাকে না, পৈত্রিক সম্পত্তি থাকে না, সুমতি। কি করেই বা থাকবে! দরিদ্রদলন করে তিলে-তিলে যে সম্পত্তি বাবা আহরণ করেছিলেন তার এই যদি সদ্গতি না হয়, তবে সৃষ্টির যে সামঞ্জস্য থাকে না। তোমার চোখের জলের কোনোই মানে হয় না, সুমতি। এই সম্পত্তির জন্য বাবা ও তাঁর অনুচরের অত্যাচারে কত মেয়ে কত চোখের জল ফেলেছে তার হিসেব আজ আর কেউ রাখে না। কত লোকের মুখের গ্রাস কেড়ে এই প্রাসাদ। তারাও একদিন এমনি কেঁদেছিল।

সুমতি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া উঠিল—এর আগে আমার মরণ হল না কেন?

উমাকান্ত বিদ্রূপ করিয়া কহিল—তা হলে আমার পথের বোঝাটা আরো একটু হালকা হতো। মানবকে একটা অনাথ-আশ্রম-টাশ্রমে ঢুকিয়ে দিয়ে কাছাটা নামিয়ে বম্ ভোলানাথ বলে সরে পড়তাম। এই না? কিন্তু ভাগ্যের কাছে এত আবদার কি খাটে?

সুমতি জ্বলিয়া উঠিল—যাও না তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে। কে তোমাকে ধরে রাখছে?

উমাকান্ত সান্ত্বনা দিবার ভান করিয়া কহিল—যে দুঃখের প্রতিকার নেই তাকে হাসিমুখে স্বীকার করতে না পারলেই দুঃখ, সুমতি। আমি তো এই দুঃখে একটা নূতনের সূচনা দেখছি। তক্তপোষের নিচে বোতলে আরো খানিকটা মদ ছিলো, দাও না বার করে—আমার হাত-পা আর নাড়তে ইচ্ছা করছে না।

সুমতি চীৎকার করিয়া উঠিল—তুমি এখনো মদ খাবে? এততেও তোমার শিক্ষা হল না?

উমাকান্ত জোরে হাসিয়া উঠিল, কহিল—মদ খাব না তো এই সর্বনাশের সুখের স্বাদ বুঝব কি করে? তুমি নেহাৎই সেকেলে। এমন একটা উত্তেজনা জীবনে তুমি কোনোদিন অনুভব করেছ? পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ার মধ্যে অধঃপতনের একটা অত্যাশ্চর্য আনন্দ আছে। তুমি তার কি বুঝবে বলো।

বলিয়া সে নিজেই উবু হইয়া তক্তপোষের তলায় হাত ঢুকাইয়া বোতলটা বাহির করিল। সুমতির আর সহিল না।

অন্য সময় হইলে স্বামীকে হয় তো একবার বাধা দিত—বোধহয় এখনো ফিরাইবার সময় ছিল। কিন্তু একটিও কথা না কহিয়া দুয়ার ঠেলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

জনশূন্য সঙ্কীর্ণ একটা ঘর—তাহারই মধ্যে সুমতি আসিয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দ-উদ্‌গত শোকাশ্রুর মত রাশি-রাশি অন্ধকার সেই ঘরে ফেনায়িত হইতেছে। সেই স্তব্ধতা এমন স্থূল ও নিরেট যে, কান পাতিয়া তাহার আর্তনাদ শোনা যায়, চক্ষু খুলিয়া তাহার ভয়াবহ বীভৎসতার আর পরিমাপ করা চলে না।

ইহা যেন তাহার প্রত্যাসন্ন ভবিষ্যতের একটা সঙ্কেত!

এই অন্ধকারে সুমতি যেন তাহার নিজের মূর্তি দেখিতেছে। মেঝের উপর অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল।

অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে যেন শুনিতে পাইল পাশের ঘরে উমাকান্ত মদের ঝোঁকে উন্মত্ত প্রলাপ শুরু করিয়াছে—অভিশাপ, ভাগ্যের নয় সুমতি, শত-শত নির্যাতিত নিরন্নের। এ-ঘরের প্রত্যেকটি ইট তাদের বুকের পাঁজর, তোমার-আমার ফুলশয্যায় এদের কামনার কীট। ওদের বিলাপে আমাদের বিলাস, ওদের অপমানে আমাদের অপচয়। অভিশাপ না ফলে কি পারে? এ যে হতেই হবে।

৩

অভিশাপ সত্য-সত্যই ফলিল।

অবশেষে একদিন হীরালালবাবু উমাকান্তের সেই প্রশস্ত ফরাশের উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া প্রসন্ন পরিতৃপ্ত মুখে সট্‌কা টানিতে লাগিলেন। পিশি-খুড়ি-মাসি-জেঠি—পরিবারের যত কিছু আগাছা ছিল প্রচণ্ড ঝড়ে সব কিছু ছত্রখান হইয়া গেল। দুই হাতে যে যাহা পারিল পোঁটলা-পুঁটলিতে বাঁধিয়া লইয়া উমাকান্তকে মুখে গালি পাড়িতে-পাড়িতে ক্রমশ সরিয়া পড়িল—কেহ কাশী, কেহ বৃন্দাবন, কেহ বা অন্য কোনো আশ্রয়-নীড়ের সন্ধানে। ভিমরুলের চাকে কে যেন একটা প্রকাণ্ড ঢিল ছুঁড়িল। একটা বিরাট অশ্বত্থকে মূলচ্যুত করিয়া কে যেন দূরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে!

উমাকান্ত ও সুমতি মানবের হাত ধরিয়া দেউড়ি পার হইয়া বাড়ির বাহির হইয়া আসিল। একবস্ত্রে, বিশ্বময় নিঃস্বতার মধ্যে।

মানদা সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, উমাকান্ত তাহাকে ধমকাইয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে।

উমাকান্ত একবার সেই বিশাল বাড়িটার দিকে চাহিল—এই বাড়ির ঘরে ঘরে কত দিন ধরিয়া কত বাতি জ্বলিয়াছে, সব সে আজ নিজ হাতে নিবাইয়া দিয়া আসিল। এই বাড়িতে কত জন্ম, কত বিবাহ, কত মৃত্যুর সুগম্ভীর আবির্ভাব—সমস্ত স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া এই সীমাশূন্য নিরালোক ভবিষ্যতে তাহাকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।

চমৎকার!

হীরালালবাবুর কাছে আসিয়া উমাকান্ত সবিনয়ে কহিল—চললাম, নমস্কার!

হীরালাল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—সে কি? পায়ে হেঁটেই চললেন নাকি? একটা গাড়ি ডেকে দি—ছেলেপিলে নিয়ে—

স্নিগ্ধহাস্যে উমাকান্ত কহিল—অজস্র ধন্যবাদ। এখন আর গাড়ি নয়, কঠিন পথ। আপনার দয়া চিরকাল মনে থাকবে।

হীরালাল কহিলেন—যাচ্ছেন তো স্টেশনে?

—হ্যাঁ, মাইল দুয়েক মোটে রাস্তা, হেঁটে যেতেই হবে কোনোরকমে। সেজন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না। সম্পদের বেলাই সহধর্মিণী, দারিদ্র্যের দিনে স্বামীর সঙ্গে দু-মাইল পথ হাঁটতে পারবেন না এমন স্ত্রী পাতিব্রত্যের আদর্শরূপিণী বলে হিন্দুশাস্ত্রে কীর্তিত হয় নি।

সেই কথা হীরালাল কানেও তুলিলেন না, গলা ছাড়িয়া ডাক পাড়িলেন—ওরে বলাই, সোভান-মিঞাকে বলে শিগগির একটা গাড়ি নিয়ে আয়। স্টেশনে পৌঁছে দেবে বাবুকে।

উমাকান্ত বাধা দিয়া কহিল—মদ খেতে যখনই আপনার কাছে হাত পেতেছি আপনি স্বচ্ছন্দে আমার হাতে কাঁচা টাকা গুঁজে দিয়েছেন। আপনার দয়া অসীম। কিন্তু দয়া করে আমাকে আর ঋণী করবেন না।

বলিয়া উত্তরের কোন প্রতীক্ষা না করিয়াই সে পথে অগ্রসর হইল।

পিছনে সুমতি—তাহার হাত ধরিয়া মানব।

সুমতির দুই চক্ষু ছাপাইয়া অজস্র অশ্রুর আকারে অনপনেয় লজ্জা ও অসহনীয় অপমান ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। হালদার-বাড়ির বৌ রাস্তায় বাহির হইয়া কঠিন মাটিতে পা রাখিবে বছর কুড়ি আগে এই কল্পনা পাগলেও করিতে পারিত না—শহরের এই দিককার সকল লোক জড়ো হইয়া এই ঘটনা হইতে কত যে নীতিমূলক গবেষণা শুরু করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সব কথা আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো সুমতিকে দগ্ধ

করিতেছিল। উমাকান্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল—পা চালিয়ে চল একটু, কাঁদবার সময় ঢের পড়ে আছে। বিকেলের ট্রেন আমাকে ধরতে হবে এটুকু কৃপা করে মনে রেখো।

সুমতি পিছন ফিরিয়া আরেকবার বাড়িটার দিকে তাকাইল। বাড়িটা যেন ম্লান অসহায় চোখে নীরবে কাকুতি জানাইতেছে। দশ বৎসর আগে স্বামীর অনুগামিনী হইয়া সে যখন প্রথম পিত্রালয় ছাড়িয়াছিল, তখন ঘোড়ার গাড়ির বন্ধ জানালার পাখির ফাঁকে সে তাহার বাবাকে দেখিয়াছিল সিঁড়ির উপর বিরস বিষণ্ণ মুখে কাতর চোখে তাহাকে দেখিতেছেন। সে যেন এমনিই অসহায় মূর্তি, এমনি উদাস। বাড়িটার দিকে চাহিয়া আজ তাহার খালি বাবার কথাই মনে পড়িতেছে। সেই শেষবার সুমতি তাহার বাবাকে দেখিয়াছিল। গ্রামে সেই বছর কোথা হইতে যে কলেরার বন্যা আসিল, সমস্ত ভাসিয়া-খসিয়া একাকার হইয়া গেল—শ্যামলতা হইল শ্মশান! ভিটে মাটির এক ফোঁটা চিহ্নও কোথাও রহিল না।

গাছ-পাতার অন্তরালে ক্রমশ হালদার-বাড়িটা অপসৃত হইতেছে। সেই বাড়িরই একটি বহুলালোকিত গৃহকোণে যেদিন উমাকান্তর বাসর-শয্যার পাশে শয়ানা সঙ্কোচভীতা নববধূটি প্রিয়তমের প্রথম স্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তখন কে জানিত তাহাকে একদিন রুক্ষ রাজপথেই সেই শয্যা প্রসারিত করিতে হইবে!

উমাকান্ত তীব্রস্বরে আরেকটা হাঁক পাড়িল।

মানব বাপের হাত ধরিয়া কহিল—মা অমন কাঁদছে কেন, বাবা?

উমাকান্ত কহিল—কলকাতায় যাবে শুনে ভয় পাচ্ছে। যাও তো বাবা, মাকে একটু বোঝাও।

মানব বিস্মিত হইয়া কহিল—কলকাতায় আবার ভয় কিসের? তুমিই তো বলছিলে সেখেনে সারারাত ধরে রাস্তায় রঙ-বেরঙের তুবড়ি জ্বলে—

এখেনেই অন্ধকারে তো সাপ-খোপের ভয়। ভূত? মানব হঠাৎ বুক ফুলাইয়া তাহাতে ডান হাতটা ঠেকাইয়া বীরদর্পে কহিল—রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি? তাহার পরে সে হাসিয়া ফেলিল—মা নেহাৎ ছেলেমানুষ, বাবা।

উমাকান্ত হাসিয়া কহিল—সেই কথাটাই তোমার মাকে একটু বুঝিয়ে বল।

মানব মা-র একটা হাত ধরিয়া তাহাকে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে কহিল—কেন তুমি অমন কাঁদছ? এখন আমরা গিয়ে ট্রেনে চাপবো, অন্ধকার ঠেলে হুস্-হুস্ করতে-করতে এঞ্জিনটা হাউইর মতো ছুটতে থাকবে—ফুর্তিতে সারারাত তো আমার ঘুমই আসবে না। তার পর ভোরবেলা চাপবো ষ্টিমারে, চারিদিকে খালি ঢেউ আর ঢেউ। যদি ঝড় আসে মা, স্টিমারটা নাগর-দোলার মতো দুলতে থাকবে। নাগর-দোলা চড়তে তোমার ভালো লাগে না?

সুমতি বিহ্বলের মত মানবকে পথের মধ্যখানেই বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল।

—ছাড়, ছাড়, লোকে দেখলে বলবে কি? এত বড়ো ধাড়ি ছেলে মা-র কোলে চড়ে স্টেশনে যাচ্ছে। তোমারই বরং হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, না? আমি যদি আরেকটু বড় হতাম তো তোমাকে পাঁজা-কোলে করে ছোট্ট খুকিটির মত নিয়ে যেতাম, মা। কেন তুমি কাঁদছ, কলকাতায় কত জিনিস তুমি দেখতে পাবে। সেখানে শুনেছি—এক রকম গাড়ি চলে, তাতে ধোঁয়া নেই, ভোঁ নেই—খালি ঠুং ঠুং করে ঘণ্টা বাজায়। সেই গাড়ি চড়তে তোমার ইচ্ছে করে না? তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, মা।

সুমতি ছেলের বিস্ময়দীপ্ত চোখের দিকে তাকাইয়া করুণ কণ্ঠে কহিল—এ-বাড়িতে আর ফিরে আসবো না, মানু।

মানব ঠোঁট উলটাইয়া কহিল—বয়ে গেল। কলকাতায় এর চেয়ে অনেক

বড়ো-বড়ো বাড়ি আছে, এক-একটা বাড়ির চূড়ো নাকি মেঘের সমান উঠে গেছে। বাবা বলছিলেন নিচের তলায় কি রকম একটা বাক্স আছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে কল টিপে দিলেই দেখতে-দেখতে পাঁচ-ছ তলায় বাক্সটা উঠে আসে। ভূগোলে আমেরিকার কথা পড়েছ মা? সেখানে নাকি একরকম বাড়ি আছে—তার তলায় রেলের মতো চাকা, এক জায়গা থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে হাজির হয়—বলিয়া মানব খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু মা'র যে কেন তবু কান্না থামে না সে ভাবিয়া পাইল না। কহিল—বেশ তো, তারপর একদিন এ-বাড়িতে ফিরে এলেই হবে।

সুমতি কহিল—এ-বাড়িতে আর ফিরে আসতে দেবে না।

কপাল কুঁচকাইয়া মানব কহিল—ফিরে আসতে দেবে না? কে?

—যারা এখন বাড়ির মালিক—হীরালালবাবুরা।

এমন ব্যাপারেও কেহ মুখ ভার করিয়া থাকে? মানব হাসিয়া উঠিল, পরে গম্ভীর হইয়া কহিল—তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, মা। আমরা কলকাতা বেড়াতে যাচ্ছি কি না, তাই বাবা এ কয়দিন হীরালালবাবুকে বাড়িটাকে দেখতে বললেন। কেউ পাহারা না দিলে বোসেদের চাকররা এসে পুকুর থেকে সব মাছ চুরি করে নিয়ে যাবে, বাগানের একটা আমও আর ফিরে এসে খেতে পাবো না। ফিরে আসতে দেবে না কি, মা? আমাদের ঘর-বাড়ি পুকুর-বাগান কার সাধ্য কেড়ে রাখে? তা হলে হীরালালবাবুর দাড়ি ছিঁড়ে দেব না?

মা'র বিষাদ-ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া মানব আর উৎসাহ পাইল না। কখন তাহার নিজেরই মুখ ব্যথায় থমথম করিয়া উঠিল; কহিল—কলকাতায় যাচ্ছি মা, অথচ না নিলে একটা বাক্স-ট্রাঙ্ক, না বা কিছু খাবার। গাড়িতে কি পেতেই বা শোবে, সেখানে গিয়ে চান করেই বা কি পরবে? গাড়ি ছাড়তে তো এখনো কতো দেরি আছে। কুলির

মাথায় করে তোমার সেই হলদে তোরঙ্গটা নিলেই সব চুকে যেত। বাবাকে এত বললাম, অন্তত আমার প্যাঁটরাটা নিই, কিছুতেই তিনি তাতে হাত দিতে দিলেন না। আমার বাঁশি-নাটাই টিনের লাট্টু, বইখাতা সব পড়ে রইলো। সেখানে গিয়ে আবার তো সব কিনতে হবে?

সুমতি মানবের মুখখানা আবার কোলের কাছে চাপিয়া ধরিল। অশ্রু-গদগদস্বরে কহিল—কিনবার আর আমাদের কিছুই নেই, বাবা। বাক্স-প্যাঁটরা খাট-পালঙ সিন্দুক-আলমারি সব—সব হীরালালবাবুদের। আমরা আজ পথের ভিখিরি।

চলিতে চলিতে মানব হঠাৎ থামিয়া পড়িল। এমন একটা কথা বলিলেই হইল? সে হাসিয়া কহিল—হীরালালবাবুর তো আচ্ছা আবদার। দাঁড়াও, বাবাকে জিগগেস করে আসি।

কিন্তু উমাকান্তর মুখে স্নেহ বা সহানুভূতির এতটুকু আভাস নাই। বাপের সেই মুখ দেখিয়া ভয়ে মানবের মুখে কথা সরিল না।

মানব ফিরিয়া আসিয়া আবার মা'র হাত ধরিল; কহিল—এ কখনই হতে পারে না, মা। হীরালালবাবুর সাধ্য কি আমাদের বাড়িতে আমাদের ঢুকতে দেবে না? ঐ বুড়ো আমাদের সঙ্গে পারবে নাকি? এক ভজুয়াই তো ওকে আলুর দম বানিয়ে ছাড়বে। আমি দাড়িতে ওর আগুন লাগিয়ে দেব, মা। আমাকে তুমি যে এত হনুমান বলতে তা এতোদিনে ঠিক হবে।

মাকে এত সে প্রবোধ দিল, তবু কি না তাহার চোখের জলের বিরাম মানিতেছে না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া মানব শেষে মা'র হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়া কহিল—গরিব হলাম বলে তোমার এত ভাবনা কিসের মা? আমার লাট্টু-নাটাই কিচ্ছু চাই না, বিদ্যাসাগরের মতো আমি না-হয় রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টের তলায় টুল টেনে বসে পড়া মুখস্ত করবো। হাত পুড়বে বলে ভয় পাচ্ছ, মা? না, না, বিদ্যাসাগরের মতো রান্না

করতে আমি না-ই বা পারলাম, আমি হব পিওন, খাকির প্যাণ্ট পরে পায়ে ফেটি আর মাথায় পাগড়ি বেঁধে আমি কলকাতায় চিঠি বিলি করবো। গাড়ি ঘোড়া ঠিক বাঁচিয়ে চলবো দেখো, তোমার কিচ্ছু ভয় নেই।

মা তবু কথা কহে না, আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ক্লান্তপায়ে পথ ভাঙে।

বিকালের আকাশ ফিকা হইয়া আসে, হাটের পথে গরুর গাড়ি সার বাঁধিয়া ঢিমাইয়া চলে। মানব গরুর ল্যাজ টানিয়া দেয়, রাস্তা হইতে ঢিল কুড়াইয়া বাদামগাছের ডালে তন্দ্রাচ্ছন্ন প্যাঁচাটাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারে—কখনও বা সামনের পুকুরে; বিন্দুবৎ জলচক্রটা কেমন করিয়া ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে অস্পষ্টতর হইতে থাকে তাহাই দাঁড়াইয়া একটু দেখে। বলে: গুলতিটাও সঙ্গে আনলে না মা, ঐ পাখির বাসাটা তা হলে ভেঙে দিতাম।

মা কেমন করিয়া যেন চাহিল।

প্রথমটা মানব একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, কিন্তু কি ভাবিয়া সাহস সংগ্রহ করিয়া কহিল—ঐ পাজি হীরালাল আমাদের এতো বড়ো বাসা ভেঙে দিলো, আর আমি সামান্য একটা পাখির বাসা ভাঙতে পারবো না? মারি এই ঢিলটা, মা। পাখির ছানাগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। ওয়ান্, টু—

একটা ঢিল তুলিয়া মানব টিপ করিতেছে, কিন্তু মা'র দুইটি অশ্রুকোমল সস্নেহ চক্ষু যেন তাহার উদ্যত হাতকে সহসা নিস্তেজ, শিথিল করিয়া ফেলিল। ঢিলটা ফেলিয়া দিয়া সে আবার মা'র গা ঘেঁসিয়া চলিতে-চলিতে কহিল—সব হীরালালবাবুদের হয়ে গেল, মা? আমাদের ধলি-গাইটা পর্যন্ত।

মা স্বচ্ছন্দে ঘাড় হেলাইল।

-পুঁইশাকের মাচা, কাঁটালগাছের তলায় পিঁপড়ের সেই ঢিপিটা —সব ?

সুমতির বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভীত অস্ফুট একটি শব্দ বাহির হইল : সব।

—তুমি বলো কি মা? আমার সেই দোলনাটায় আর দুলতে পাবো না? নিজ হাতে সেই যে একটুখানি বেগুনের ক্ষেত করেছিলাম, সে-বেগুন খেতে পাবো না? বঁড়শি ফেলে পুকুরের বেলে-মাছ ধরলে সে-মাছ হীরালালবাবুদের দিয়ে দিতে হবে? তুমি পাগল হলে নাকি, মা? মানব থামিয়া পড়িল।

সুমতি মানবের হাত ধরিয়া খালি বলিলেন—দাঁড়াসনি মানু, চল্। উনি কতদূর এগিয়ে গেছেন দেখছিস্? তাড়াতাড়ি না চলতে পারলে ট্রেনে আর চাপতে পাবি না।

মানব বলিল—তাই বলো, তুমি আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিলে! এ কখনো হতে পারে? আমি বাড়ি ঢুকতে গেলে ভজুয়া তেড়ে আসবে ভেবেছ, মানিদিদি ভাবছ হাত-পা ধুয়ে দিতে আসবে না, আমার ভেলু খুসিতে ল্যাজ না নেড়ে কামড়াতে আসবে? ভেলু সঙ্গে আসতে চাইছিলো মা, কেন ওকে বাবা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন? ও হয় তো দাঁত দিয়ে শেকল কাটবার জন্যে কতো মাতামাতি করছে। ওকে খুলে নিয়ে আসবো, মা? ওরো ত হাফ-টিকিট।

মা'র হাত ছাড়িয়া মানব খসিয়া পড়িবার সামান্য একটু চেষ্টা করিল হয় তো, কিন্তু সুমতি কিছুতেই বাঁধন আলগা করিল না।

—গাড়ি ছাড়তে এখনো অনেক দেরি আছে, মা। তিনটে ঘণ্টা দেবে, তবে ছাড়বে। তার মধ্যে ঠিক আমি ভেলুকে ছাড়িয়ে আনতে পারবো। বাবা একমনে এগিয়ে চলেছেন, টেরও পাবেন না। ইস্কুলের ফ্ল্যাট-রেসে আমি ফার্স্ট হয়েছি। রুপোর সেই মেডেলটাও আনা হয় নি।

কোটের ওপর ঝুলিয়ে রেখে কলকাতার ছেলেদের তাক লাগিয়ে দেব। যাই না, মা।

সুমতি ধমক দিয়া উঠিল : না।

নিষ্ফল অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া মানব আপন-মনে বলিতে লাগিল : হুঁ! উনি আমার কুকুর কেড়ে রাখবেন, ওঁর খেঁদি মেয়েটা আমার দোলনায় দুলবে, আর আমি ওঁকে সহজে ছেড়ে দেবো? ককখনো না। দাঁড়াও না, বড়ো হই একটু—আমাদের ক্লাবের ক্যাপ্টেন চিন্তাহরণ-দাকে চেন, মা? দাঁত দিয়ে তিন মণ পাথর তোলেন। অমনি আমাকে একবারটি বড়ো হতে দাও, দেখে নেব আমার বেগুনের ক্ষেত কে নষ্ট করে? ছাড় মা, ছাড়—

বলিয়া মানব জোর করিয়া হাত ছিনাইয়া লইয়া বুক ফুলাইয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সোজা আগাইয়া যাইতে লাগিল।

কিছুটা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া মা'র গায়ে লাগিয়া বীরের মতো কহিল—তোমাকে পেছনে একলা ফেলে এগিয়ে যাব কী? আমি কাছে না থাকলে তোমার ভয় করবে যে।

রমেশ পোদ্দার ও তাহার ছেলে ফণী হাট হইতে বাজার করিয়া ফিরি-তেছে। ফণীর বয়স মানবের চেয়ে কিছু বেশি, গায়ে নতুন একটা কোট উঠিয়াছে। গায়ে পড়িয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাচ্ছিস রে মানু? কাইজারি ভঙ্গিতে মানব কহিল—কলকাতা।

ফণী হাসিয়া কহিল—বাড়ি থেকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিলো বুঝি? বেশ হয়েছে। আর আমাকে পোদ্দারের পো বলে খ্যাপাবি?

মানব কঠোর স্বরে কহিল—তুই পোদ্দারের পো না তো কি বামুনের বাচ্চা? বলবোই তো, একশো বার বলবো, যতক্ষণ না মুখ খসে পড়ে :

গরু অর্থ গো,
পোদ্দারের পো।

কি করবি তুই ?

ফণী কটুকণ্ঠে কহিল—কী আর করবো ? আমাদের মা তো আর পথে বেরোয় না।

মানব হঠাৎ বাঁ হাতে ফণীর চুলের ঝুঁটি চাপিয়া ধরিয়া ডান-হাতে তাহার গাল-গলা বাড়াইয়া এমন এক চড় মারিল যে, সে অদূরে একটা খাদের মধ্যে ছিটকাইয়া পড়িল। কাদায় তাহার কোটটার কিছু রহিল না।

ফণীর হইয়া রমেশ পোদ্দার নিজে একেবারে তাড়িয়া আসিল।

মানব দুই হাত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া এক পা বাড়াইয়া দিয়া কহিল—এসো না এগিয়ে, চোখ পাকাচ্ছ কি ওখান থেকে ? এসো না, দেখি তোমার কত মুরোদ !

সুমতি তাহার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। নিচে খাদ হইতে ফণী তখন অশ্রাব্য ভাষায় গালি পাড়িতেছে ও রমেশের মুখে তাহারই নির্ভুল প্রতিধ্বনি।

গোলমাল শুনিয়া উমাকান্তও পিছু হটিয়া আসিল। রমেশের পিঠে ও ফণীর চুলে হাত বুলাইয়া কহিল—ও আমার গোঁয়ার ছেলে রমেশ, ওর কথায় রাগ করো না। বাড়ি যা, ফণী।

পরে সুমতির দিকে চাহিয়া কহিল—ঐটুকু অপমানেই এমন মুষড়ে পড়লে চলবে না। এখন আর এমন কি হয়েছে ! ঢের পথ পড়ে আছে এখনো।

সুমতি মানবের কান মলিয়া দিয়া বকিয়া উঠিল : যত গায়ে পড়ে ঝগড়া। কারু সঙ্গে না লেগে আর স্বস্তি নেই। গোঁয়ার, অবাধ্য কোথাকার।

উমাকান্ত স্ত্রীর হাত ছাড়াইয়া নিয়া কহিল—তোমার এই গোঁয়ার ছেলেকে আশীর্বাদ করো।

মানবের মুখে আর কথা নাই ; সামনে দিয়া গরুর গাড়ি চলিয়া গেলেও গরুর ল্যাজ টানিয়া দিতে সে আর হাত তোলে না ; পায়ের কাছে কাঁচা একটা বাতাবি লেবু পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াও তাহার সাহায্যে তাহার

ফুটবল খেলিতে সাধ হয় না—অন্যমনস্কভাবে ম্লান মুখে সামনে সে হাঁটিয়া চলিয়াছে!

কিন্তু কত দূর যাইতেই চোখের সামনে গাছ-পালার ভিড় সরাইয়া খোলা আকাশ মুখ বাড়াইল। একটা লাল বাড়ি দেখা যাইতেছে—তাহারই একটু দূরে কতগুলি মাল-গাড়ি ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া রহিয়াছে। স্টেশন আসিয়া পড়িয়াছে বুঝি—মানব লাফাইয়া উঠিল। হ্যাঁ, আর সন্দেহ নাই, রাস্তার উপর ভাঙা নড়বড়ে ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ানরা কোলাহল শুরু করিয়াছে। হঠাৎ কোথায় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

মানব ব্যস্ত হইয়া বাবাকে কহিল—গাড়ি এবার ছাড়বে বুঝি? তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসো, মা।

উমাকান্ত নীরব হইয়া রহিল। সোজা সে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দিকেই অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সুমতির হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল—তাহারা সত্যই তবে একেবারে বিদায় নিয়া চলিয়াছে! মানব ঘাড় বাঁকাইয়া মাকে ঝাঁঝালো গলায় কহিল—আমার সঙ্গে পর্যন্ত পা মিলিয়ে চলতে পারো না, মা। শেষকালে তোমাকে ফেলেই কিন্তু চলে যাব আমরা।

কিন্তু বাবা প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়াও টিকিট কাটিতে কোনই ব্যস্ততা দেখাইতেছেন না। এ-দিক ও-দিক তাকাইতেছেন শুধু।

মানব অস্থির হইয়া উঠিয়াছে: এঞ্জিনের ঐ ধোঁয়া দিয়েছে, বাবা। ট্রেন ছাড়বার আর দেরি নেই। ইস্কুলের শেষে কতো দিন আমি ট্রেন দেখতে একা-একা চলে এসেছি এখানে। আমাদের ইস্কুলের ছেলেরা কোথায় কোন দাড়ি-ওলা সন্নেসি এলো বা কোথায় কে সাপে-কাটা পড়লো তাই খালি দেখতে যাবে, একবার ট্রেন দেখতে আসবে না। ট্রেন যখন এসে স্টেশনে দাঁড়ায় তখন আমার খুব ভালো লাগে। এমন জোরে ঢুকে পড়ে মনে হয় থামবেই না, কিন্তু—ঐ যে ঘণ্টা দিলো, বাবা। আমাদের বুঝি টিকিট লাগবে না? গাড়ির ড্রাইভার বুঝি তোমাকে চেনে?

উমাকান্ত ধমক দিয়া উঠিল : চুপ কর্।

মানব চুপ করিতে জানে না : ঐ যে, অজিত ওরাও যাচ্ছে বুঝি। বেশ হবে—কাগজ পেন্সিল পর্যন্ত সঙ্গে আনোনি মা, স্টেশনের নামগুলি লিখে রাখতাম যে। বলিয়া সে অজিতের উদ্দেশে ছুটিল : আমরাও এই গাড়িতে কলকাতা যাচ্ছি ভাই। আমি আর তুই এক গাড়িতে। বুড়োরা আলাদা!

অজিত বলিল—আমার সঙ্গে 'স্নেক্ য়্যাণ্ড ল্যাডার' আছে।

মানব খুশি হইয়া তাহার ঘাড় চাপড়াইয়া কহিল—তা হলে তো একশো মজা। আমাদের গাড়িতে কাউকে উঠতে দেব না। দরজার কাছে কেউ এলেই সোজা বলে দেব—রিজার্ভড্। তার পর একা দুজনে খেলবো, ইচ্ছে করলে জানলায় বসে বসে পাখি দেখবো, মাঠ, নদী, টেলিগ্রাফের থাম—পথে ব্রিজ পড়লে চাকায় কি সুন্দর আওয়াজ হয় বল্ তো! জানিস্ ভাই, দেড়ে হীরালাল জোর করে আমাদের বাড়িটা কেড়ে নিয়েছে। নিক গে—গাড়ি ঐ এসে গেলো। রেডি, অজিত—

বলিয়াই মানব আবার মা'র কাছে আসিয়া হাজির : ওকি, শিগগির চলে এসো মা। সামনেই ওই মেয়েদের গাড়ি রয়েছে। একটু পা চালিয়ে এগিয়ে এসো লক্ষ্মী, তোমার জন্যে গাড়ি তো আর এখানে চিরকাল হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে না। তুমি ছেলে হলে না কেন মা? চাদরটা দাও গা থেকে ছুঁড়ে। ফের ঘণ্টা দিচ্ছে মা, উঠে পড়ো। বাবা কোথায়? উঠে পড়েছেন বুঝি? তুমি তা হলে থাকো দাঁড়িয়ে, আমি উঠলাম—

হঠাৎ উমাকান্ত খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল : দাঁড়া। মানব থামিয়া গেল। তাহারই বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে দিয়া ট্রেন তখন ধীরে চলিতে শুরু করিয়াছে। জানলায় অজিত মুখ বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে বুঝি, ছলছল চোখে মানব চাহিয়া রহিল—যতদূর ট্রেনটাকে দেখা যায়

৪

গাড়ি ক্লিয়ার হইয়া গেলে উমাকান্ত স্টেশন-মাস্টারকে পাকড়াও করিল। তারিণী তাহার আলাপী—দুইজন একত্র মদ খাইত। কিন্তু তারিণীকে খাটিয়া খাইতে হইত বলিয়া উমাকান্তর মতো এত অনায়াসে সে ভাসিতে পারে নাই। রাত্রি বারোটার সময় তাহাকে আর-একটা প্যাসেঞ্জার 'পাস্' করিয়া দিতে হয়। ভোর না হইতেই আবার একটা মাল-গাড়ি আসে। তাই, সে চুমুক দিত বটে, কিন্তু গিলিত না। দলের সবাই তাহাকে বলিত আর্টিস্ট।

উমাকান্তকে দেখিয়া তো সে অবাক। মামলা-মোকদ্দমার কথা আগেই সে শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু উমাকান্তকে এমন সর্বস্বান্তের মতো পথে বাহির হইতে হইবে তাহা সে কোনোদিন ভাবে নাই। তাহার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না।

উমাকান্ত আগাইয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—দেখ, কী চমৎকার অধঃপতন! পাহাড়ের চূড়ো থেকে একেবারে অতল পাতালে! আমি তোমারো চেয়ে বড় আর্টিস্ট, তারিণী!

তারিণী তাহাকে কাছে আকর্ষণ করিয়া কহিল—কী ব্যাপার?

—অত্যন্ত সরল—জলের মতো পরিষ্কার! তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা করতে এসেছি, বন্ধু।

তারিণী তাহার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল—ভিক্ষা? তুমি কী বলছ এ-সব? সঙ্গে উনি কে?

হাসিয়া উমাকান্ত কহিল,—বল তো কে! দেখে তোমার কী মনে হয়?

তারিণী আমতা আমতা করিয়া কহিল,—তোমার—

হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। অনুগামিনী। তোমার খুব আশ্চর্য লাগছে না, তারিণী? কিন্তু চাকা যদি না-ই ঘুরবে তবে চলায় আর মজা কৈ?

তারিণী ব্যস্ত হইয়া উঠিল: ওঁরা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? ডেকে নিয়ে এসো ওঁদের। আমার বাড়ি তো এই সামনেই। তোমরা যাচ্ছ নাকি কোথাও?

—যাবার ইচ্ছে তো তাই ছিলো। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো আর উড়ে যাওয়া যায় না।

—সে হবেখন। তুমি এখন ওঁদের নিয়ে এসো দেখি শিগগির। আমি বাড়িতে খবর দিচ্ছি। গরিবের ঘরে একটু জিরিয়ে নেবে না-হয়।

উমাকান্ত তাহার হাত ছাড়িল না; কহিল—তুমি গরিব বলেই তো এত সহজে তোমার কাছে আসতে পারলাম ভাই। বড়লোক বন্ধুও আমার ঢের ছিলো, কিন্তু সেখানে আর যাই কেন না পেতাম, বিশ্রাম পেতাম না। তুমি গরিব বলেই তো তোমার কাছে হাত পাততে পারবো—

অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া তারিণী কহিল—তোমার সম্পদের দিনে তুমি আমাদের কম উপকার করেছ? ও কি একটা কথা হল? যাও, ওঁদের নিয়ে এসো। সীতাকে পেয়ে গুহক চণ্ডাল কৃতার্থ হবে। বলিয়া তারিণী বাড়ির ভিতর খবরটা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আগেই চলিয়া গেল।

কিন্তু সুমতি কিছুতেই স্টেশন-মাস্টারের আতিথ্য নিতে পারিবে না। সে রেল-লাইনের ধারে কুলিদের মতো বরং হোগলার ছাউনি খাটাইয়া স্বামী-পুত্রকে নিয়া দিন কাটাইবে, তবু করুণার অন্ন সে গ্রহণ করিবে না। ইহা যে জীবন-দেবতার একটা বিরাট তামাসা মাত্র, ইহার মধ্যে এতটুকুও যে অসামঞ্জস্য নাই—উমাকান্ত সুমতিকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিল না।

উমাকান্ত কহিল—কিন্তু পরের ট্রেন যে সেই রাত বারোটায়।

সুমতি কহিল—বেশ তো। ততক্ষণ এইখেনেই বসে থাকবো।

—এই ঠাণ্ডায়?

শুকনো হাসি হাসিয়া সুমতি কহিল—বাড়ি থেকে বেরোবার সময় গায়ে ঠাণ্ডা লাগবে না এমন কোনো কথা ছিলো না।

উমাকান্ত রুক্ষস্বরে কহিল—কিন্তু কোথাও যেতে হলে কিছু রেস্তও তো চাই। তারো তো জোগাড় করতে হয়। তারিণী আমার বন্ধু, তার কাছ থেকে হাত পাততে আমার লজ্জা নেই। তোমারো লজ্জা না দেখাইলেই মানাতো, সুমতি।

সুমতি কহিল—তোমার নির্লজ্জতা তোমারই একলার থাক। এতো বড়ো একটা সম্পত্তি মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পথে বেরিয়েছ, তোমাকে নিয়ে শহর-শুদ্ধু লোক মিছিল করছে না কেন?

—তাই করা উচিত ছিলো। কিন্তু তা নিয়ে তর্ক করে তো কোনো ফল হবে না। চলো, তারিণীর কাছ থেকে সম্প্রতি কিছু ধার করে বেরিয়ে পড়ি—পরে কোথাও কিছু হিল্লে একটা হবেই। নতুন করে ফের শুরু করবার জন্যে আমি একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি।

তবুও সুমতি রাজি হয় না। বলে: তোমার বন্ধুর কাছে হাত পাতবে, তুমি যাও। আমি এখান থেকে নড়বো না।

উমাকান্ত ঠাট্টা করিয়া প্রশ্ন করিল—একা যেতে পারবে?

সুমতি দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল: দরকার হলে তাও পারবো বৈ কি।

মানব বাবার হাত ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ-গাড়িতে গেলে না কেন বাবা? সেই রাত দুপুরে তো ফের ট্রেন! এখনো তার সাড়ে সাতঘণ্টা বাকি। রাত্রে কিচ্ছু দেখা যাবে না যে!

তাহার হাত সরাইয়া দিয়া উমাকান্ত বিরক্ত হইয়া কহিল—চুপ কর্। পরে সুমতির দিকে চাহিয়া: এতই যখন পারো, তখন দয়া করে আর দু' কদম এগিয়ে এসো না। এতটা পথ হেঁটে এসে নিশ্চয়ই তোমার

বেশ খিদে পেয়েছে, ঘুমও পেয়েছে হয় তো—ট্রেন তো সেই কখন। খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবে, স্বচ্ছন্দে, তুমি গেলে তারিণী নিশ্চয়ই আর কৃপণতা করবে না। তোমাকে দেখে নিশ্চয়ই সে বদান্য হয়ে উঠবে দেখো।

কথা শুনিয়া লজ্জায় সুমতির মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল।

—একটু ব্যবসাদার হতে হয়, সুমতি। সেইটেই স্বাভাবিক। এতে লজ্জা নেই, দৈন্য নেই। যখন ছিলো, কুসঙ্গে পড়ে ফুঁকে দিয়েছি; এখন নেই, হাত পেতে তাই ভিক্ষা চাই। এর চেয়ে সহজ আর মানুষে কী করে হতে পারে?

সুমতি কটুকণ্ঠে কহিল—যখন হাত পেতে ভিক্ষা মিলবে না তখন করবে কী?

উমাকান্ত নির্লিপ্তের মতো কহিল—কেড়ে নেব।

তারিণী পুনরায় দেখা দিলে উমাকান্ত গম্ভীর হইয়া কহিল—তোমার বৌদি কিছুতেই তোমাদের বাড়ি যাবেন না।

তারিণী অপরাধীর মতো মুখ করিয়া বিনীতস্বরে কহিল—কেন?

উমাকান্ত ঠাট্টা করিয়া কহিল—এতো বড়োলোকের স্ত্রী হয়ে তোমাদের মতো গরিবের কুঁড়ে ঘরে পায়ের ধুলো ফেললে যে ওঁর জাত যাবে। স্বামীটি অবশ্যি আর বড়োলোক নেই, তা বলে স্ত্রী তো আর তাঁর গর্ব খোয়াতে পারেন না। ঐশ্বর্য পরোপার্জিত হতে পারে, কিন্তু অহঙ্কারটুকু একলা তোমার বৌদিদিরই। তার দাম আছে বৈ কি।

সুমতি মনে-মনে তাহার জন্ম-ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছিল, কিন্তু তারিণীর স্ত্রীকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে স্বামীর পিছে-পিছে আসিতে দেখিয়া তাহার সঙ্কল্প আর রহিল না। তারিণীর স্ত্রীকে অনুরোধ করিবার আর কোনো অবসর না দিয়াই সে তাহার হাত ধরিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল—ঐ তো

তোমাদের বাসা, না? খুব সামনে তো? চমৎকার ফাঁকা দেখছি, চারধারে মাঠ আর মাঠ। রাত্রে একা-একা তোমার ভয় করে না?

অপরিচিতা বধূটি সুমতির আপ্যায়নের ত্রুটি রাখিল না; কিন্তু সুমতি আঁচলের তলায় হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল—না ধুইল হাত-মুখ, না ছুঁইল একটুকরা ফল। বধূটি দুঃখ করিয়া কহিল—গরিবদের কি আপনি এমনি করেই অবজ্ঞা করবেন?

সুমতি সহসা বধূটির দুই হাত সম্মুখে আকর্ষণ করিয়া বলিল- আমার চেয়ে গরিব কি আর পৃথিবীতে কেউ আছে ভাই? সংসারে একমাত্র অর্থের অনটনই তো দারিদ্র্যের পরিচয় নয়। কিন্তু সত্যিই আমি কিছু মুখে তুলতে পারবো না, মিছামিছি অনুরোধ করে কিছু লাভ নেই। যদি বাঁচি, তবে তোমার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

উমাকান্ত ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে-হইতে কহিল—এতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই, বন্ধু। আমার বিপদের দিনে তুমি টাকা ভিক্ষা—হ্যাঁ ভিক্ষা দিচ্ছ—এ আমি বলেই স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারলাম। শোধ করতে পারবো কি না এবং কবেই বা পারবে তার যখন ঠিক নেই, তখন তাকে ভিক্ষা বললেই শব্দের যথার্থ অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, তারিণী। সুমতি নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলেই লজ্জায় অধোবদন হচ্ছে, কিন্তু লক্ষপতি উমাকান্ত হালদারই না যদি গরিব স্টেশন-মাস্টার থেকে ভিক্ষা নেবে তবে সৃষ্টির মাহাত্ম্য আর রইলো কোথায়? খালি ভোগ করবো, কোনোদিন পথের ধুলায় হাঁটু গেড়ে বসে ভিক্ষা করবো না—এতে সৃষ্টির সামঞ্জস্য থাকতো না।

উমাকান্ত ঘরের মধ্যে আসিয়া মুঠি খুলিয়া তিনখানা দশটাকার নোট দেখাইয়া সুমতিকে কহিল—এখনো জমিদারির কিঞ্চিৎ রেশ আছে—বন্ধুত্বের খাজনা আদায় করেছি। অত ম্লান হয়ে যেয়ো না। কলকাতা যাবার মতো আড়াইখানা থার্ডক্লাস টিকিট—মাল-পত্র নেই যে কুলি

লাগবে, আর, কলকাতায় পৌঁছে নিঃসম্বল অবস্থায় দু চার দিনের খোরাকি—খোরাকি বলতে অবিশ্যি মুড়ি-মুড়কি। মহাত্মা হতে আমাদের আর বাকি নেই। জীবনে এতো বড়ো ঐশ্বর্যের স্বাদ খুব কম লোকেই পেয়ে থাকে, সুমতি। আমার ভবিষ্যৎ যে বংশধর—তাকে সর্বস্বান্ত রিক্ত করে রেখে যেতে পারলাম, আজকের দিনে এই আমার একমাত্র অহঙ্কার।

উমাকান্ত আর্তনাদের মতো হাসিয়া উঠিল।

—তুমি এমন একটা সর্বনাশকে উৎসব করে মহিমান্বিত করে তোল। যাত্রাই আমাদের উৎসব। ঘূর্ণ্যমান চাকা সুমতি, ঘূর্ণ্যমান চাকাই হচ্ছে নামান্তরে সভ্যতা। চোখের জল মুছে সভ্য হও। বলিয়া দ্রুতপদে উমাকান্ত অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিন্তু রাত করিয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল, দস্তুরমত তাহার পা টলিতেছে। কাছাকাছি ট্রেন আসিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া স্টেশনের আলোগুলি নিবানো রহিয়াছে, কুলিরা কাপড়ের খুঁটে গা মুড়িয়া প্ল্যাটফর্মের উপরেই ঘুমাইয়া আছে। দূরে লাইনের ধারে একটা মাটির টিপির উপর কে-একটা ছেলে শূন্য দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া—তাহার দুই চোখে অসহনীয় প্রতীক্ষা, কখন ট্রেন আসিবে, কখন দুইটা নিস্তেজ অবসন্ন রেল-লাইন চাকার নিষ্পেষণে উচ্চকিত হইয়া উঠিবে! এমনি একটা প্রত্যাশিত ভয়ঙ্করের আবির্ভাবের আশায় মানবের অবুঝ ভীরু মন দুলিয়া উঠিতেছিল।

মানবকে উমাকান্ত চিনিতে চাহিল না।

স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টারে তখনো বাতি জ্বলিতেছে। সুমতি না-ঘুমাইয়া স্বামীরই জন্য খোলা বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু উমাকান্তের চেহারা দেখিয়া সে দেয়ালে কপাল কুটিবে, না, চীৎকার করিয়া উঠিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। উমাকান্ত আগাইয়া আসিয়া

কহিল—টিকিটের জন্যে তারিণী যা টাকা দিয়েছিলো সব উড়িয়ে দিয়ে এসেছি। ও-ও ভিক্ষার ধন কি না, হাতে রইলো না। মাটি খুঁড়ে না পেলে বুঝি টাকা-পয়সার মায়া পড়ে না।

সুমতি এক ঝটকায় উঠিয়া দাঁড়াইল, নির্মম ঘৃণায় মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইল না। উমাকান্ত বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, —তবু আমার শিক্ষা হল না—কলকাতা যাওয়ার খরচ যা জোগাড় করলাম তাও অবধি ফুঁকে দিয়ে এলাম—এর জন্যে তোমার আফশোষ হচ্ছে? এ একান্ত আমি বলেই পারলাম সুমতি, কিন্তু আমি যে আর দাঁড়াতে পারছি না।

সুমতি কর্কশ হইয়া কহিল, আবার ফিরে এলে কেন? কে তোমাকে ফিরতে বলেছিলো?

—না এলে একা-একা কি করে কলকাতা যেতে?

—তোমার ফিরে আসাতেই তো তার অনেক সুবিধে হয়ে গেলো! দুঃসময়ে হাতে যা সম্বল ছিলো তা পর্যন্ত উড়িয়ে দিতে তোমার বাধলো না। তুমি যে কতো বড়ো অমানুষ তা তুমি জানো না। তোমার সঙ্গে আর আমাদের সম্পর্ক নেই।

উমাকান্ত বারান্দার এক ধারে বসিয়া পড়িয়াছে। মৃদু একটু হাসিয়া কহিল—আমি যে কতো বড়ো অমানুষ তা সত্যিই আমি জানি না। আমি পৃথিবীতে কী না করতে পারি। আমার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চাইলে অনায়াসে আমি সরে পড়তে পারি জানো?

সুমতি তীব্রতর কণ্ঠে বলিল—স্বচ্ছন্দে। তুমি এক্ষুনি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও না।

—পর মুহূর্তে। কিন্তু আমি খসে পড়লে তুমি কী করে যাবে? যাবে বা কোথায়?

—সে-সব ভাবনা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

—তবু দেখি না ব্যবসা-বুদ্ধিতে কতো দূর তুমি পেকেছ! তারিণীর কাছে ধার চাইবে তো? স্বামীকে পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ ইত্যাদি বলে ওর সহানুভূতি উদ্রেক করে কিছু টাকা ফের খসাতে পারবে? ও, তোমার হাতে এখনো যে সোনার একজোড়া শাঁখা আছে দেখছি। হীরালাল ওটা বুঝি আর ছুঁতে পারে নি। আইনে বেধেছে। আমারই মুখের ওপর আমার নিন্দে করলে তারিণীর মন নিশ্চয়ই ভিজে উঠবে। দেখব তুমি কেমন অভিনয় করতে পারো। শাঁখা-জোড়া তারিণীকে লুকিয়ে দিতে পারলে দিব্যি ওর কাছে তোমার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে।

সুমতির স্বর কঠিন স্নেহহীন: সে-ব্যবস্থা আমিই সব করতে পারবো। কিন্তু যে-টাকা আমি জোগাড় করবো তাতে তোমার কোনো অধিকার নেই। তুমি তোমার পথ দেখ।

উমাকান্ত হাসিয়া উঠিল: ধন্যবাদ।

এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া টলিতে-টলিতে ঘর হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

৫

সেই যে উমাকান্ত বাহির হইয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না।

সংসারে কেহ কাহারও নয়—এই নির্বাণানন্দ অনুভব করিতে-করিতে উমাকান্তও হয় তো এক দিন নিবিয়া গেল। কেহ তাহার খোঁজ রাখে নাই।

জীবনে তাহার যে অমেয় গ্লানি ও ম্লানতা—একাই সে তাহার উত্তরাধিকারী ; তাহার স্বাদ লইতে সে স্ত্রী-পুত্রকে আহ্বান করিবে না। এই অধঃপতন তাহার নিজের রচনা। অর্জনে যদি সে একা, বিসর্জনেও।

আর সুমতি! তাহারও বা কী হইল কে জানে! যাহাদের খুশি, ভাবিতে পারো সুমতি স্বামী-বিরহে ধীরে-ধীরে দেহক্ষয় করিল, যাহারা একটা ধর্মমূলক সিদ্ধান্ত পাইলে খুশি হয়, তাহারা তাহাকে কোনো দেবতার মন্দিরে ভক্তি-বিনতা পূজারিণীরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়ো, —আর যাহারা নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন নির্লজ্জ সংসারের রুক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছে, তাহারা ইহাই ভাবিয়ো যে, সুমতি অবনত মানুষের জনতায় আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে—হয় তো বা দেহ-পণ্যবিপণির পারে! যাহার যাহা ইচ্ছা ভাবিয়া লইয়ো, গল্পের পক্ষে তাহার প্রয়োজন নাই।

মানবের জীবনে তাহার মা'র সেই ব্যথাপাণ্ডুর মুখের ছায়া পড়িয়াছে। অনাহারশীর্ণ অপমানাহত নিরানন্দ মুখের ছায়া! কিন্তু ছায়ার আয়ু কতটুকু!

আরম্ভ

৬
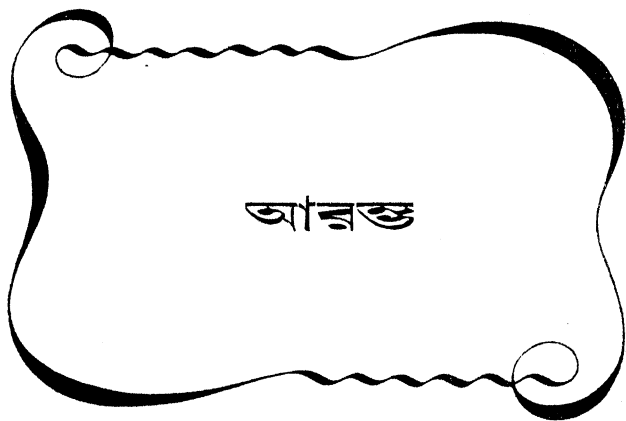
ইহার পর যে-দৃশ্যে উপন্যাসের যবনিকা তুলিলাম—

স্থান : কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চল, রসা রোড; সময় : উমাকান্তের তিরোধানের বারো বৎসর পর।

চাকা আবার কখন ঘুরিয়া গেছে।

ভোর হইতে তখনো খানিকটা বাকি—এইমাত্র বোধকরি রাস্তায় জল দিয়া গেল। স্লেট-রঙ আকাশে অস্পষ্ট তারার অক্ষরে কাহার হস্তলিপি লেখা!

মানব তাহার বিছানায় হাঁটু দুইটা বুকের কাছে দুমড়াইয়া তালগোল পাকাইয়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

দরজা ঠেলিয়া একটি অনতিবয়স্কা মহিলা ঘরে ঢুকিলেন। আকারে সেইটুকু মাত্র স্থূলতা যাহা আভিজাত্য নষ্ট করিতে পারে নাই। বেশ-বিন্যাসে একটি নির্মল রুচি, চলায় ও কথায় এমন একটা গাম্ভীর্য আছে যে মাঝে-মাঝে তা নির্মমতার নামান্তর হইয়া উঠে।

সুইচ-বোর্ডে হাত রাখিয়া তিনি ডাকিলেন : মানু!

শয্যার নিকটবর্তী হইতে হইল। মাথায় আস্তে কয়েকটা ঠেলা মারিতেই মানব ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিল : কি ব্যাপার? ডাকাত পড়েছে? ঐ—ঐ ঘরে আমার মুগুর!

মানব পাশের ঘরের দিকেই বুঝি ছুটিতেছিল, মহিলাটি তাহাকে বাধা দিলেন : না রে পাগলা, তোকে একবারটি শেয়ালদা যেতে হবে।

—কোথায়?

বলিয়াই মানব বালিশের তলায় হাত ঢুকাইয়া, মাথা ডুবাইয়া বিস্তৃততর হইয়া শুইয়া পড়িল : পাগল আবার তুমি আমাকে বলো !

তাহার চুলে আঙুল বুলাইতে-বুলাইতে মহিলাটি কহিলেন—তোকে সেদিন বললাম না আমার বোন-ঝি এখানে কলেজে পড়তে আসবে—

বালিশের মধ্যে মুখটা বারকয়েক ঘষিয়া মানব বলিল—কিন্তু স্টেশন থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে এমন কথা তো বলোনি কোনোদিন।

—কথা ছিলো উনিই স্টেশনে যাবেন, কিন্তু রাত থেকে শরীরটা নাকি ওঁর ভালো নেই। তা ছাড়া মির্জা আজ বাড়ি পালিয়েছে। এই সাত-সকালে গাড়ি কে বার করবে ?

—তবে পায়ে হেঁটেই তোমার বোন-ঝিকে পার করে নিয়ে আসবো নাকি ? তোমার বোন-ঝির আবদার তো মন্দ নয়। এমন মজার ঘুমটা তুমি মাটি করে দিলে, মা। প্রথম রাতের অলস কল্পনা আর শেষ রাতের নরম ঘুম—এই দুটিতেই হচ্ছে স্বাস্থ্যের স্বাদ ! আমি তা খোয়াতে রাজী নই। অন্য ব্যবস্থা কর গে যাও।

মা। কিন্তু সুমতি নয়। মিসেস্ অনুপমা চ্যাটার্জি।

মানব আরো ভালো করিয়া শুইল। কিন্তু চোখ গিয়া পড়িল জানালার বাইরে, অনুচ্চার ভাষার মতো যেখানে দুয়েকটা তারা মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে। মা আবার কি বলেন তাহা শোনা শেষ হইলে পর সে চোখ বুজিবে।

অনুপমা বলিলেন—একটুখানি না ঘুমুলে আর তুই মাথা ঘুরে পড়বি না

মানব এক ঝটকায় উঠিয়া বসিল : শুধু ঘুম ? সকালে উঠে আমাকে মুগুর ভাঁজতে হয়, তার পর স্নান—সব তুমি স্রেফ ভুলে গেলে নাকি ? বোন-ঝি কলেজে পড়তে আসছেন—রাতারাতি তোমাদের সব পাখা গজালো আর কি। আছো বেশ।

মানব খাট ছাড়িয়া মেঝেয় নামিয়াছে যা হোক।

অনুপমা বলিলেন—তাই তো আগে থেকে জাগালাম। তুই চটপট তৈরি হয়ে নে, আমি চা করছি।

ব্যায়াম—তার পর স্নান! খুব তাড়াতাড়ি সমাধা হইল—পঁচিশ মিনিটের জায়গায় আট মিনিট। ঢাকা মেইলটার এরাইভ্যাল্ অত্যন্ত বেয়াড়া টাইমে—স্টেশনে একটু আগে পৌঁছুনোটা প্রাচীনপন্থী নয়। মাথায় এত জল না ঢালিলেও চলিবে—দস্তুরমতো মেঘ করিয়া আসিয়াছে দেখিতেছি। তাড়াতাড়ি! দূরে একটা ট্রেনের ফুঁ শোনা যায়! একদিন নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইলে কী এমন যায়-আসে?

হ্যাঁ, তার পর প্রসাধন—কেশ-বেশ। স্টেশনে আবার বেশি আগে থেকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে এঞ্জিন-ড্রাইভ করা ভালো। জাপানি হেয়ার-ড্রেসারটা চুল মন্দ কাটে নাই বটে। আঃ, কী মিষ্টি গন্ধ এই সেণ্টটার? না গো, এত তাড়াতাড়ি না করিলেও চলিবে। ওটা তো বালিগঞ্জের ট্রেন? ফাঁপা বাসনেই বেশি আওয়াজ!

—তোর চুল ঠিক করতেই তো আধঘণ্টা!

অনুপমা চায়ের বাটি ও রুটি-মাখন লইয়া প্রবেশ করিলেন।

দেরাজ টানিয়া এক মুঠা নোট-টাকা পকেটে লইয়া মানব কহিল—আমার টাকা-পয়সা রোজ-রোজ এত কমে যায় কেন বলতে পারো?

অনুপমা হাসিয়া কহিলেন—পকেটে অতো বড়ো একটা ফুটো থাকলে টাকা পয়সার আর দোষ কী?

পাঞ্জাবির পকেট উলটাইয়া মানব কহিল—ফুটো? কই?

অনুপমা আবার হাসিলেন: নে, খেয়ে নে শিগগির। পকেটের ফুটো তোর চোখে পড়বে না।

মানব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ও! তুমি আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগ করছ। কিন্তু হাতের মুঠোয় পয়সা যখন পেলাম তখন তাকে

পাঁচ আঙুলেই খরচ করতে হয়। তার পর চায়ের কাপে চুমুক দিয়া: তুমি বেশ কিন্তু। তোমার বোন-ঝিকে খুঁজে বার করবো—আমি কি অকাল্‌টিস্ট নাকি? নাম কি মেয়েটির?

—মিলি। ঢাকা থেকে এক দঙ্গল মেয়ে আসছে—তাদেরই সঙ্গে।

—ঐ ব্যূহ ভেদ করে তোমার মিলিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে। সেই বা আমার সঙ্গে আসবে কেন?

—বা, তোকে বুঝি সে আর চেনে না? সেবার ঢাকায় ফুটবল খেলতে গিয়ে ক্লাবের সেক্রেটারি পরেশবাবুর বাড়িতে এক রাত্তির ছিলি, তোর মনে নেই? সেই বাড়ি থেকেই তো মিলি ইডেনে পড়তো। ওটা ওর কাকার বাড়ি যে।

টোস্টে কামড় দিয়া চিবাইতে চিবাইতে: কাকার পরে মাসি। তা এক রাত্রেই সে আমার চেহারা মুখস্ত করে রেখেছে নাকি? যাক গে। 'বোনাফাইডিস' প্রমাণ করতে পারবোই। সিল্কের রুমালে হাত মুছিতে-মুছিতে: নিতাইকে বলে ফুল আনিয়ে রেখো, মা। বারান্দায় আসিয়া: অক্স-আই ডেইজি। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে: আমার তিনটে ঘরের একটাও যেন হাতছাড়া না হয় মা দেখো। আমি কিন্তু একটুও সঙ্কুচিত হতে পারবো না। নিচে সদর দরজা খুলিতে-খুলিতে—ছি শেষকালে মানব একটা সুর ভাঁজিতে লাগিল নাকি?

মখমলের মতো নরম মোলায়েম ফিকে অন্ধকার। মৃদু মভ্‌ রঙের আকাশ। বাতায়নবর্তিনী প্রোষিতভর্তৃকার চক্ষুর মতো ম্লান একটি তারা। একটা বাস্‌ লইলে মানবের ক্ষতি হইত না। এখনো ঢের সময় আছে। কিন্তু খোলা ট্যাক্সিতে প্রচুর হাওয়ায় গা ছাড়িয়া দিতে না পারিলে এত ভোরে ওঠার উদ্দীপনার কোনো মানে নাই।

সন্ধ্যার আকাশে তারা ফোটার মতো একটি-একটি করিয়া মানুষ পথে বাহির হইতেছে: দোকানি, মজুর, ভিক্ষুক। জীবন-সমুদ্রে ফেনকণা!

ক্রস-উবেল ! কেহ কাহারও মুখ চিনিয়া রাখে না—যায় আর আসে, আসে আবার ভাঙিয়া পড়ে। কত ক্ষুধা, কত ক্ষোভ, কত প্রত্যাশা!
মানব ট্যাক্সির সিটে হেলান দিয়া বুক বিস্ফারিত করিয়া নিশ্বাস লইল।
স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম। মানব বার-কয়েক এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পাইচারি করিতেই ফিন্‌ফিনে সিল্কের মতো এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা গেল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘাড় না রগড়াইয়া কী করা যায় আর ?
মেয়েদের ইণ্টার-ক্লাসটা বোঝাই। কতগুলি খোঁপা আর সিল্কের প্যাটার্ণ। এখান হইতে উঁকি মারিয়া লাভ নাই—আগে উহারা নামুক। এক, দুই, তিন—অনেকগুলি, রোগা, লিকলিকে, সোডার বোতল, দীপশিখা ! মানব একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।
হস্‌টেলে যাহারা থাকে তাহারা একসঙ্গে গাড়ি করিবার উদ্যোগ করিতেছে ; যাহাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাইবার কথা, তাহারা কেহ তাহাদের নিতে আসিল কি না তাহারই তালাস করিতেছে হয়তো।
এমন একটি মেয়ের সঙ্গে মানবের হঠাৎ চোখাচোখি হইল।
নির্ভুল সঙ্কেত। মানব মেয়েটির সমীপবর্তী হইয়া গলা একটুও না খাঁখরাইয়া প্রশ্ন করিল : আপনিই কি মিলি ?
মেয়েটি সপ্রতিভ ; তাহার নাসিকাগ্র দেখিয়াই তাহাকে তীক্ষ্ণধী ভাবা উচিত। এতগুলি মেয়ের মধ্যে এ-ই কেবল এলো খোঁপা বাঁধিয়াছে—ঐ খোঁপাতে যেন ব্যক্তিত্বের আভাস, আর, ব্যক্তিত্ব দীপ্যমান তাহার চিবুকে। একটু চাপা, তাই মনে হয় দৃঢ়। অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার একটা নিশ্চিত ধারণা আছে।
মেয়েটি কহিল—ভালো নাম বলতে পারেন ?
—ভালো নাম ? মানব একটুও ঘাবড়াইল না : ভালো নাম কী হতে পারে ভেবে একটা ঠিক করুন না। ঢাকা ও তার পাশাপাশি গাঁ থেকে এক

মানব স্বচ্ছন্দে কহিল—কোর্থ।
মিলিও হটিবার পাত্র নয় : অনার্স আছে ? কোন্ সাবজেক্ট ?
—ম্যাথামেটিকস্। তারপর, আর কী জানতে চান ?
—আবার কী জানতে চাইব !
—আমি একজন খুব ভালো বক্সার, ফুটবলে রাইট-হাফ, টঁ্যাস ঠ্যাঙাতে ওস্তাদ—আর কী গুণাবলী চান ? নিজেকে অ্যাডভারটাইজ করতে আমার ভালো লাগে ! হঁ্যা, এবার আপনাকে প্রশ্ন করি। ঘাবড়াবেন না তো ?
একটা উদ্গত হাসি চাপিয়া মিলি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—না।
—বেশ। মানব নড়িয়া চড়িয়া বসিল : ঠিক ঠিক জবাব দেবেন। শুকতো কি করে রঁাধে ? চিংড়ি মাছের মালাই-কারিতে কি-কি মশলা লাগে ?
ছোট-ছোট নুড়ির মাঝখানে নির্ঝররেখার খুশির মতো মিলি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।
ক্ষণিক নীরবতা।
মিলি কহিল,—আপনাদের বাড়ি কতো দূরে ?
—বা, আমরা তো বাড়ি কতক্ষণ পেরিয়ে এসেছি। এখন চলেছি তো টালিগঞ্জের দিকে। সামনে ঐ ওভার-ব্রিজ দেখছেন ওখান দিয়ে বজবজ-এর ট্রেন যায়। মাঝেরহাট হয়ে আমতলা বেড়িয়ে আসবেন একদিন ?
—আমতলা ! সে আবার এমন কী জায়গা !
—অখ্যাত বলেই তো তার আকর্ষণ ! যাবেন ?
মিলির নাকের দুইপাশে বিরক্তির রেখা ঘন হইয়া উঠিল : বা, আমার বুঝি খিদে পায়নি ! হাওয়া খেলেই বুঝি পেট ভরবে ?
মানবের মুখ অন্যদিকে—স্বর গম্ভীর : একটুখানি উপোস করলেই খিদে পায়, কিন্তু বহুদিন প্রতীক্ষা করেও এমন সুযোগ মেলে না।
আবহাওয়াকে মিলি তরল করিতে চাহিল : ভারি সুযোগ। ট্যাক্সি

করে ভোর বেলায় ফাঁকা রাস্তায় বেড়ানো। আপনি যেন কোনোদিন আর বেড়ান না! মানবের চোখ হইতে মিলি নিমেষে কি-যেন পড়িয়া লইল: ও! আমি আছি বলে? এবারের কথা তাহার স্বগত; কিন্তু আমি তো আর ছু-দিনেই পালাচ্ছি না।

—কিন্তু রুখু চুল যে আপনার চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করবে। কপালের ওপর চুলের ঐ ঘুঙরি ছুটি তৈলমার্জনায় অদৃশ্য হবে। অস্থির হইয়া মিলি যেন কি বলিতে যাইতেছিল তাহাকে বাধা দিয়া: দেখুন কবিতার আইডিয়ার মতো একেকটা সান্নিধ্য ঈশ্বরদত্ত।

না, মিলি এইবার সত্যই কাতর কণ্ঠে কহিল—না, না, এবার ফিরুন।

—বটে! ফিরে চল পাঁয়জি।

ট্যাক্সিটা সত্যই ফিরিল দেখিয়া মিলির স্বর একটু তরল হইল হয়তো: চলুন না একবার বাড়ি, মেসোমশাইর কাছে নালিশ করবো।

মানব মুখে আবার কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোস টানিয়া দিয়াছে: হ্যাঁ, চলুন না আমাদের আড্ডায়—তিলজলায়। দেখবেন সবাই সেখানে, মহিষমশাই। অচেনা লোকের সঙ্গে পথে বেরুলে কী বিপদ হয় টের পাবেন এ-বার।

৭

দক্ষিণ দিকের পাশাপাশি তিনটি ঘরই মানবের একেলার—এ-পাশেরটা শোবার—বিশেষত্ব এই, শয্যার দুই প্রান্তে দুইটি প্রকাণ্ড আয়না; মাঝেরটা পড়ার বা বসিবার, সংক্ষেপে আড্ডা দিবার; শেষেরটাতে আধাআধি স্নান, সজ্জা ও ব্যায়াম।

মুক্তহস্তে ব্যয় ও মুক্তবাহুতে ব্যায়াম—মানবের ইহাই ছিল ব্রত ও বিলাস; আজ তাহার জীবনে নারীর প্রথম অবতরণ।

এবং এই দিনেই মানবের প্রথম জন্মদিন!

কী-ই বা এমন মেয়ে! কিন্তু ঐ রুক্ষ চুল, হাওয়ায় উড়িয়া-উড়িয়া কপালের কাছে ঘুঙরি করিয়াছে, রাত্রিতে ঘুম না হওয়ায় চোখের পাতাতে একটি ফিকে অবসাদ। ডাক-নাম মিলি!

ইচ্ছা করিলে এ মিলি 'হইতে পারিতো' না, সত্য-সত্যই এ মিলি।

বায়স্কোপ হইতে মানব ফিরিয়া আসিল। তাহার ঘরে বন্ধুরা তখনো জাঁকাইয়া আড্ডা চালাইতেছে। নিখিলেশ, বিজন আর সুধীর। একজন ঘাঁটিতেছে বই, একজন ফুঁকিতেছে সিগারেট, সুধীর অন্যমনস্কের মতো জানালা দিয়া চাহিয়া রাস্তার জন-যানের শব্দ শুনিতেছে। মানবের মোটর-বাইকের আওয়াজ পাইয়া সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল: এতক্ষণে এলেন।

মানব ঘরে ঢুকিতেই সবাই হৈ-চৈ করিয়া উঠিল।

ইতিপূর্বে দুই ক্ষেপ হইয়া গিয়াছে, নিতাই জানিতে চাহিল আর-একবার চা দিবে কি না।

মানব একটা চেয়ারে পা ছড়াইয়া কহিল—আন্।
পরমুহূর্তে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল : ও, তোমার টাকা চাই, না সুধীর ? কত ?
সুধীর নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া কহিল—যা তুমি পারো।
—যা আমি পারি নয়, যা তোমার দরকার।
—এই ধরো গোটা কুড়ি। কলেজের মাইনে ছাড়া দিদিকেও কিছু পাঠাতে হবে। কোলের ছেলেটা সেদিন শুনলাম মারা গেছে—
—ফিরিস্তি দেবার কিছু দরকার দেখছি না। আর, (নিখিলের প্রতি) তোমাদের ম্যাগাজিনের ছাপাখানার বিল কতো হয়েছে ? আছে সঙ্গে ? এক শো বত্রিশ। নিতাই। (নিতাইর আবির্ভাব) দেরাজ থেকে আমার চেক বইটা নিয়ে আয় তো। (সুধীরকে) তোমাকে আমি ক্যাশই দিচ্ছি। চাবি নিয়ে যা নিতাই।
বিজনের হয়তো কিঞ্চিৎ চক্ষু টাটাইল : তুমি এতো স্বচ্ছন্দে ধুলোর মতো টাকা উড়োতে পারো।
মানব চেক কাটিতে-কাটিতে : ধুলো ছাড়া আর কি।
বিজন ঠাট্টার সুরে : অসীম বৈরাগ্য দেখছি যে।
নিখিলেশ হাত বাড়াইয়া চেকটা গ্রহণ করিল : যার আছে সে-ই যদি না দেবে, তবে চলবে কেন ?
সুধীরের স্বর কিন্তু উচ্ছল : অনেকেরই হয়তো আছে, কিন্তু এমন দক্ষিণ হাত কারুর নেই।
মানব বিরক্ত হইয়া কহিল—এইগুলোই তোমাদের ন্যাকামি। আমাকেই বা কে দিলে ? কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলাম।
সুধীর চেয়ার ছাড়িয়া কহিল—আমি এবার চলি। আমাকে এখুনি গিয়ে আবার ছেলে পড়াতে হবে।
—এখুনি ? এতো রাতে ?

—আর বলো কেন? এক বেলা না গিয়েছি কি মাইনে কেটে নিয়েছে।

নিখিলেশও উঠিল: আমিও ফেরার হই। পেমেণ্ট করলে পরে প্রেস ডেলিভারি দেবে।

বিজন রহিয়া গেল।

নিতাই চা দিয়া গেলে ট্রে হইতে এক কাপ তুলিয়া মুখে ঠেকাইবার আগে বিজন বলিল—তুমি আরেকটুকু সংযম অভ্যাস কর, মানু।

কথা বলার ধরন দেখিয়া মনে হয় বন্ধুদের মধ্যে বিজনই বেশি অন্তরঙ্গ, কেননা সে যখন-তখন টাকা চাহে না।

মানব কহিল—কিসের? অর্থ-ব্যয়ের?

—এ তো ব্যয় নয়, ব্যসন। দোহাত্তা এমনি উড়োতে থাকলে দুদিনেই দেউলে—

—হব। মানব হাসিয়া বলিল—সেই পরমতম সর্বনাশের লগ্নের জন্যেই তো অপেক্ষা করছি। যতো দিন তা না আসে, নেশা করে যাই।

—নেশা? বিজন ব্যস্ত হইয়া উঠিল: মদ ধরেছ নাকি?

মানব মৃদু-মৃদু হাসিয়া কহিল—ধোঁয়া পর্যন্ত আমি গিলি না। ও-সব খেলো নেশায় আমার মন ওঠে না। এ-বিষয়ে আমার আভিজাত্য আছে।

—যথা?

—ধরো, আমার যা মাসহারা তা দিয়ে যথাসাধ্য আমি পরোপকার করছি। অর্থে আর সামর্থ্যে।

—এ অত্যন্ত মামুলি! কিন্তু যাকে-তাকেই 'না চিনিতে ভালোবাসার মতো' দান করতে হবে এমন অধিকার তোমার নেই।

—আমার কাছে লোকে এসে প্রার্থনা করবে সে-অধিকারও আমার ছিলো নাকি? এক দিন যদি সব ভেঙে-চুরে উলটে-পালটে ছত্রখান হয়ে যায়, যাবে। সে-রোমাঞ্চ সহ্য করবার মতো আমার স্নায়ু আছে। আমি

স্রোত চাই, নিত্য নতুন পরিবর্তনের বেগ। আমার রক্তে কিসের চাঞ্চল্য আছে তা তো আর তোমরা জানো না।

—কিসের? বিজনের স্বর একটু সিনিকাল।

—সন্ধানের। সে তুমি হঠাৎ বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমাকে দেখে সত্যিই কি তোমার মনে হয় না যে আমি পৃথিবীতে খুব প্রকাণ্ড একটা দুঃখ পেতে এসেছি? এই বেশে আমাকে মানায় না—আমি হব রাস্তার মজুর, জেলের কয়েদি, খনির কুলি। কিম্বা এখান থেকে অন্য কোথাও, অন্য কোথাও থেকে আরো দূরে—

বিজন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল: তুমি একেবারে গোল্লায় গেছ।

—তা হয়তো গেছি, কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই। যতক্ষণ সেই পরমক্ষণ এসে না পৌছয়, মুঠি-মুঠি করে মুহূর্তগুলি আমি উড়িয়ে দিয়ে যাই।

সেই সুযোগ একবার মাত্র আসিয়াছিল। ধূসর ভোরবেলায়, ঝরঝরে ওভারল্যাণ্ডে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড হইতে মালেন স্ট্রিট-এ বাঁক নিবার সময়।

তাহার পর বাড়িতে মিলিকে মানব আর চোখ ভরিয়া দেখিতেও পায় নাই। বাঁশের বেড়ার ফাঁকে উঠন্ত রোদের সোনার ঝিকিমিকির মতো টুকরো-টুকরো করিয়া তাহাকে চোখে পড়িয়াছে—ভাঙা-ভাঙা স্বপ্নের মতো। বিলীয়মান স্বপ্ন।

ইচ্ছা করিলেই মানব মিলির ঘরের পর্দা ঠেলিয়া আলাপ জমাইতে পারে না—ঈদের প্রথম শশীলেখাটির মতো অবসরের আকাশে সোনার সুযোগের ধ্যান করিতে হয়।

এইবার সে কোন্ মূর্তি নিয়া আসিবে কে জানে।

পাশাপাশি দুইটি মুহূর্তের দুই রকম রঙ—একটি সোনালি, অন্যটি মেটে; একই মুখ সামনা সামনি দেখিলে অর্থহীন, অর্ধান্তরেখায় তা সঙ্কেতময়—

একই কথা দুপুরের নির্জনতায় অনর্গল বলা যায়, কিন্তু নিশীথরাত্রির স্তব্ধতায় তা ভাবাও যায় না।

মানব অন্যমনস্কের মতো বারান্দায় পায়চারি করিতেছিল—যে-বারান্দা মিলির পড়ার ঘর ছুঁইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেছে—

মিলির ঘরের দরজায়—বারান্দার দিকের দরজায়—সবুজ পর্দা ঝুলিতেছে ; ইচ্ছা করিলেই মানব আর সেই পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিতে পারে না। সেই সোনালি মুহূর্তটিতে মর্চে পড়িয়াছে। মানব তাই বারান্দায় পায়চারি করিতে-করিতে মিলির পড়া মুখস্ত করার মৃদু গুনগুনানি শোনে।

তাহার পায়ের শব্দও তো শোনা যাইতেছে—পড়া কি আর একটু থামানো যায় না !

কতক্ষণ পরেই অনুপমার প্রবেশ—এই দিক দিয়া কোথায় কোন কাজে যাইতেছিলেন বুঝি। মানব তাঁহাকে পাইয়াই কাহাকে যেন শুনাইয়া বলিয়া উঠিল : আমি কাল রাত্রে রাঁচি যাচ্ছি, মা।

অনুপমা কহিলেন—তা তো যাবি, কিন্তু মিলি বলছিলো কালকেই ওকে হস্টেলে রেখে আসতে।

—কই, আমাকে বলেনি তো।

—তোকে বলতে যাবে কেন ? বাড়িতে একা-একা ও হাঁপিয়ে উঠছে।

—বেরুলেই তো পারে।

—কার সঙ্গে যাবে ?

—বেড়াতে বেরুবার জন্যেও সঙ্গী চাই নাকি ? আমাকে কিছুই বলে না কেন ?

পড়া কখন বন্ধ হইয়া যায়।

এবং কাল রাত্রে যে রাঁচি যাওয়া যায় না তাহাও এই সামান্য স্তব্ধতায় স্পষ্ট হইয়া উঠে।

অনুপমা নিচে নামিয়া গেলে মানব এইবার স্বচ্ছন্দে সিল্কের রুমালে ঘাড় মুছিতে-মুছিতে ঘরে ঢুকিতে পারিত। পড়ার ঘর মিলি কেমন করিয়া সাজাইয়াছে তাহাও এ-পর্যন্ত দেখা হয় নাই। টেবিলটা সে কোথায় পাতিয়াছে বা আলনার নিচে শাড়িগুলি তাহার স্তূপীকৃত হইয়া আছে কি না—এটুকু দেখিলেই তাহার চরিত্র ধরা পড়িত হয়তো। হাতে তাহার কয় গাছি করিয়া ঝুরো চুড়ি আছে তাহাও ঈশ্বর বলিতে পারেন।

রাঁচি যাইবার জন্য সামান্য স্যুটকেশও কাহাকে গুছাইয়া দিতে হইবে না —নিতাই আছে। ঘর-দোর সব সময়েই ফিটফাট, দেয়াল মেঝে আয়নার মতো ঝকৃঝক্ করিতেছে—লোকটা অতিমাত্রায় গোছালো। বই না পড়িয়া শেলফে সাজাইয়া রাখিবার এমন একটুও বড়লোকি বাতিক নাই যে ঘরে গিয়া লুকাইয়া পড়িয়া আসিবে, বরং কলেজ হইতে মিলিই কত রাজ্যের বই আনিয়াছে—পড়িতে যাহা স্নায়ু-শিরা ভরপুর হইয়া উঠে। মোটর সাইক্লের যন্ত্রপাতি বা ডন ব্র্যাডম্যানের কীর্তিকলাপের কাহিনী শুনিতে-শুনিতে মিলিও তাহার কলেজের মেয়েদের দুয়েকটা ন্যাকামি বা দুয়েকটা নাক-সিঁটকানোর সরস উদাহরণ দিতে পারিত।

কিন্তু এই বিরক্তিকর নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে কোনো নালিশই পেশ না করিয়া আলগোছে সরিয়া পড়িলে লোকে তাহাকে বলিবেই বা কী!

৮

এবং তার পরদিন রাত্রে ঝড় উঠিল।

এক টুকরা সিল্কের মতো আকাশকে কে কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। তারাগুলি আগুনের হালকা ফুলকির মতো শূন্যে উড়িতে-উড়িতে নিবিয়া গেল। অন্ধকারের জোয়ার আসিল।

সেই ঝড়েরই সঙ্গে পাল্লা দিয়া মানব তাহার ট্রায়ামফ ছুটাইয়াছে।

ঝড়ি আসিয়া পৌছিতে-পৌছিতেই বৃষ্টি—প্রথম ঈষদুষ্ণ, অনেকটা বধূর চুম্বনের মতো—এবং ক্রমশ শীতলতর। নিতাই তোয়ালে ও কাপড় নিয়া আসিল। একবার যখন ভিজিয়াছে, ভালো করিয়াই স্নান করিয়া নিবে। বসিবার ঘরে কেহ নাই—বৃষ্টির জন্যই আসিতে পারে নাই বোধহয়। তাহা ছাড়া রাত্রির গাড়িতে মানব রাঁচি যাইবে এমন একটা গুজব কাল সন্ধ্যায় রটিতেছিল।

অতঃপর—শুইবার ঘরে।

আলো নিবানো—ঘর ভরিয়া সুনীল অন্ধকার। পশ্চিমের জানলা দুইটা খোলা, এবং তাহারই মধ্য দিয়া অবাধ্য বৃষ্টির ছাঁট আসিয়া মেঝেটা ভাসাইয়া দিতেছে। কিন্তু এখুনিই জানলা দুইটা বন্ধ করিয়া কোনো লাভ নাই—তাহার বিছানায় কে যেন শুইয়া আছে। হ্যাঁ, তাহারই বিছানায়। মিলি—মিলি কখন তাহার বিছানার সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়া ঘুমের পদ্ম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আগে মুহূর্তেও এই অপ্রত্যাশিতের আভাস ছিল না, তবু মানব যেন বহু আগে হইতেই মনে-মনে জানিত। ঝড় মিলিকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

মানব খাটের দিকে আগাইয়া আসিল এবং মিলিকে ভালো করিয়া চিনিতে অল্প-একটু মুখ বাড়াইল। অন্ধকারে এমন দেখা ঠিক আত্মায় অনুভব করিবার মতো।

কিন্তু এতো মিলি নয়—এ তাহার মা'র মতো। সুমতির মতো। মুখে তেমনি একটি আভাময় পাণ্ডুরতা—শুইবার ভঙ্গীতে তেমনি যেন শ্রান্তি।

স্পষ্ট ও গভীর অন্ধকারে মিলিকে মনে হয় ট্র্যাজেডির নায়িকা।

মিলিকে মানব স্পর্শ করিবে। ঝড় তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে—বৃষ্টি আনিয়াছে—ঘুম। স্পর্শ করিয়া তাহার ঘুম ভাঙাইবে। এমন রাতে তাহাকে স্পর্শ না করিবার মতো অতৃপ্তি সে বহন করিতে পারিবে না।

অগত্যা মানব মিলিকে স্পর্শ করিল—আলো না জ্বালাইয়াই—স্পর্শ করিল দেহে নয়, মুঠি ভরিয়া কতগুলি চুল লইল। এবং জাগিয়া উঠিয়া সমস্ত পৃথিবীতে মিলির আর মরিবার জায়গা রহিল না।

মিলি জাগিয়া উঠিল প্রেস-ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাশলাইটের চেয়েও দ্রুত। মানব দিল আলো জ্বালাইয়া। এবং সেই রূঢ় ইলেকট্রিক আলোতেও স্পষ্ট দেখা গেল সামনে যেন তাহার মা বসিয়া। মিলির সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া তাহার মা'র ম্লান ছায়া নামিয়াছে—গভীর কালো দুই চোখে—মিলির চোখের মণি যে এত কালো তাহা কে কবে জানিত—তাহার দুইটি হাতের তালুতে, কানের পাশ দিয়া চুলের গুচ্ছ পুঞ্জিত হইয়া নামিয়া যাইবার রেখাটিতে! সেই তাহার দুঃখিনী মায়ের প্রতিমা!

মানবের তন্ময় চোখের সামনে পড়িয়া মিলি স্তূপীকৃত শাড়ি হইতে চাহিল। এবং ভুলক্রমে মানবের বিছানায় একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই—একমাত্র সেই কারণেই এখন আর তাহার ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কোনো মানে হয় না।

সেই সময়ে একটা বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিতেই মিলির সাহস হইল। না-হাসিয়া তাহার আর উপায় ছিল কী : আপনার ঘর দেখতে সাহস করে ঢুকে পড়েছিলাম—কালই আমি হস্‌টেলে চলে যাচ্ছি কিনা—

মানবের মুখে সেই সন্ধিৎসু হাসি যা দৃষ্টিকে রমণীয় করিয়া তোলে : আমিও তো আজ রাঁচি যাচ্ছিলাম। কিন্তু কী বিচ্ছিরি রাত করে এলো দেখেছ! আই মীন—কী সুন্দর রাত! চা খাই, কি বলো? নিতাই!

নিতাই তটস্থ। চা আসিতেছে।

মিলি বলিল—কেমন করে যে ঘুমিয়ে পড়লাম বুঝতে পারছি না—

মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া মানব : চুল ছড়িয়ে বাঁ কাৎ হয়ে—

বাহিরে এমন অজস্র বৃষ্টি ও দুর্দান্ত ঝড় না থাকিলে এই কথা কখনই মানবের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিত না।

একে শীতের বেলা তায় আসছি লাস্ট ট্রিপএ—শরীর ভেঙে পড়েছে। ঘরে ঢুকেই দেখি দিব্যি বিছানা পাতা। হাসিতে-হাসিতে মিলি হাত তুলিয়া এলো চুলে একটা ফাঁস বাঁধিতে লাগিল।

ফাঁস বাঁধা হইয়া গেলেও মিলি উঠিল না।

মানব কহিল—বাইরে এমন ঝড়, তার মধ্যে তোমার ঘুম এলো?

—সেইতো আশ্চর্য! জানলাগুলি বন্ধ করুন না।

মানব জানলা বন্ধ করিতে করিতে : তুমি নাকি একা-একা একেবারে হাঁপিয়ে উঠছ?

সামান্য একটু লজ্জিত হইয়া মিলি কহিল—নিশ্চয়। তাই তো ভাবছি হস্‌টেলে চলে যাবো।

—ভাবছ? মানবের কাছে মিলি ধরা পড়িয়া গেছে : কালই যাবে না তা হলে?

—আপনিও তো আজ আর রাঁচি যাচ্ছেন না।

—দেখছ না কী বৃষ্টি!

—বা, বৃষ্টিতেই তো যেতে মজা।

মানবের মাথায় চট করিয়া এক আইডিয়া আসিল : চলো না। বেড়াতে বেরুই। আমার মোটর-বাইকে।

কথাটা আয়ত্ত করিতেই মিলির দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। একটু থামিয়া ধীরে সে কহিল—দাঁড়ান, চা-টা খেয়েনি।

চা খাইয়া নিতে-নিতে বৃষ্টি থামিয়া গেল। বর্ষণান্তে ভিজা মলিন আকাশের মতোই ঘোলাটে মিলির হাসি! মুখ হইতে চায়ের বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া : এই যা।

—তাতে কি? বেড়ানোটাই উদ্দেশ্য।

মিথ্যে কথা। বৃষ্টিটাই কারণ।

মানব থামিয়া গেল। ঘনীভূত অন্তরঙ্গতায় শীতল মুহূর্তটিকে তপ্ত করিবার ইচ্ছায় মানব চেয়ারটা খাটের কাছে টানিয়া আনিল। মিলি কিন্তু একটুও সরিয়া বসিল না।

ঠিক, ঠিক তাহার মায়ের মুখ! মানবকে ঘুম পাড়াইতে-পাড়াইতে যে-মুখ নিচু হইয়া তাহার চোখের পাতায় চুমু খাইয়াছে। এই সেই মুখ—দুঃখিনী কঙ্কাবতীর গল্প বলিতে-বলিতে যে-মুখে নরম মোমের আলো পড়িয়া বেদনায় কোমল দেখাইত! এই মুখের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া কতো রাতে মানবের দেহ ভরিয়া ঘুম আসিয়াছে।

মিলির দুইটি চক্ষুর জানালায় বসিয়া মা যেন তাহার দিকে ক্ষণে-ক্ষণে উঁকি মারিতেছেন।

স্টেশনে মিলির মুখকে মনে হইয়াছিল কলিকাতার আকাশের মতো সাধারণ, বিরস—এখন মনে হইল সে-মুখে গভীর প্রশান্তি! সমস্ত মুখ-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া একটি অন্তরলালিত বেদনার সুষমা! মিলিও যেন তাহারই মতো জীবনে অমিত দুঃখ পাইতে আসিয়াছে।

ঘন নিঃশব্দতায় অন্ধকার ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

মিলি বসিয়া-বসিয়া হাতের চুঁড়িগুলি নিয়া মৃদু-মৃদু নাড়া-চাড়া করিতেছে, আর মানব দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া অকারণে পকেট হাটকায়।

বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে সে-মুহূর্তটি মিলাইয়া গিয়াছে। সমস্ত আকাশে তাহার একটি কণিকাও আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এখন আবার সেই কঠিন ও করুণ স্তব্ধতা!

মানবের আজ আর রাঁচি যাওয়া হইল না, মিলি হস্‌টেলে যাইবে কি না সে-কথা না-হয় পরে ভাবিয়া রাখা যাইবে, চা-ও এক পেয়ালা করিয়া উদরস্থ করা গেল—তারপর? এইবার হাই তুলিতে হইবে নাকি? এমন করিয়া বৃষ্টি আসার যে কোনোই মানে হয় না—তাহা তো স্বচক্ষেই দেখা যাইতেছে, পরস্পরকে তাই বলিয়া তাহা মনে করাইয়া দিতে হইবে নাকি? অতএব মিলি খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল: যাই, আমার এখনো চুল বাঁধা হয়নি।

বলিয়া ঘর ছাড়িয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতে তাহাকে দরজার কাছে ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। বৃষ্টি বন্ধ হইলেও ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া তখনো ঝড় বহিতেছে—ঢেউয়ের মতো উচ্ছ্বসিত হাওয়া হঠাৎ মিলিকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিল। তাহার খোঁপা খসিয়া পড়িয়া এক-পিঠ চুল রাশি-রাশি কালো শিখার মতো চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল; শাড়িটা গায়ের সঙ্গে সহসা লিপ্ত হইয়া যাইতেই দেহের প্রতিটি রেখা সূক্ষ্ম ও লীলায়িত হইয়া উঠিল। অবিন্যস্ত বেশ-বাস লইয়া ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে সেই যে মিলি সামান্য একটু বাধা পাইল, তাহাতে তাহাকে কী যে সুন্দর লাগিল, দুই চোখ ভরিয়া দেখা আর মানবের কুলাইয়া উঠিল না।

৯

মানবের শুইবার ঘর : রাত বারোটা বাজিয়া দশ মিনিট :

ঝিলিকে দেখিয়া তাহার মা-কে আজ অত্যন্ত কাছে মনে হইতেছে। রোগে কৃশ, নিরাভ, বিমর্ষ মা'র মুখ। আয়নার মতো ঠাণ্ডা অন্ধকারটি যেন মা'র অন্তরঙ্গ উপস্থিতি। মা তাহার আজ কোথায়? তাহাকে এই সৌভাগ্যের হাটে পৌঁছাইয়া দিয়া তিনি কোথায় পথ হারাইলেন? কেহ বলিয়াছে কোন সালে না-জানি কলিকাতার কোন-কোন বস্তিতে কলেরা লাগিয়াছিল, সেই যে তিনি হাঁসপাতালে গেলেন, আর ফিরেন নাই; কেহ ইহার চেয়েও জঘন্যতর কথা বলে। মানব তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না, বরং তিনি চলন্ত ট্রেনের তলায় পড়িয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছেন ভাবিতে তাহার স্বস্তিবোধ হয়।

সেই মা-কে মানব বহুবার ভাঙা-চোরা চাঁদের মতো বহু জনের মুখে ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়াছে, কিন্তু মিলির মাঝেই সে তাঁহাকে আজ ঘনিষ্ঠ ও সম্পূর্ণতম করিয়া দেখিল—প্রতিটি গতিরেখায় উল্লসিত, প্রতিটি দৃষ্টিপাতে সমাহিত, সৌম্য! এই প্রচুর ও প্রগলভ চাকচিক্যের অন্তরালে মা'র উপবাসখিন্ন দুঃখী মুখখানি সে ভুলিতে পারে না।

মিলির শুইবার ঘর : রাত বারোটা বাজিয়া দশ মিনিট :

পাশের বাড়ির ছাতে একটা বাতি দেখা যাইতেছে বোধহয়—তাই দেখিবার জন্য মিলি মানবের বিছানায় সামান্য-একটু গা এলাইয়াছিল। একেবারে কাৎ না হইলে বাতিটা চোখে পড়ে না; কিন্তু বাতি দেখিতে-দেখিতে মিলি মেঘ দেখিল। সেই মেঘ ক্রমশ ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী

পাকাইতে-পাকাইতে আকাশময় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল—অন্ধকার মাটির মতো ঠাণ্ডা ও ব্যথার মতো নিবিড় হইয়া উঠিল এবং বৃষ্টি আসিবার আগেই কখন যে তাহার চক্ষু ভরিয়া ঘুম নামিয়া আসিল কে বলিবে।

জাগিয়া দেখিল চারিদিকে ঝড় আর জল—সামনে মানব ; আর সে কিনা এতক্ষণ কিছুই টের পায় নাই। মানব তাহাকে না জানি কী ভাবিয়া বসিয়াছে!

কিন্তু ঘুমাইয়া যখন পড়িয়াছিলই, তখন না জাগিলেই তো পারিত। কেন যে জাগিয়াছে মিলি যেন স্বপ্নে তাহার ইসারা পাইয়াছে কিন্তু মানবের সেই স্পর্শে মিলির মনে আরেকটি মুখ জাগিয়া উঠিল—সে তাহার খেলার সাথী, নাম নরেন। দুইজনে কলাই-শাকের ক্ষেতে ছাগল তাড়াইয়া কতো ছুটাছুটি করিয়াছে, পেয়ারা গাঁছের ডালে নারকেলের দড়ি বাঁধিয়া বালিশ ভাঁজ করিয়া বসিয়া কতো দোল খাইয়াছে, কতো দুপুরে বোতলের গুঁড়া করিয়া গাবের আঠার সঙ্গে সুতার মাঞ্জা দিয়া তাহারা দুইজনে ঘুড়ি উড়াইয়াছে।

রাত্রির এই মলিন ও ভিজা কয়েকটি মুহূর্তে সেই কিশোর নরেনের স্মৃতিতে ভরিয়া উঠে।

গর্জমান ভাঙন-নদী—বান দেখিবার জন্য নরেন দুপুর বেলায় কখন না-জানি একা-একা চলিয়া আসিয়াছে। আগের দিন মিলিকে লইয়া মড়া-পোড়া দেখিবার জন্য সে কাহাকেও না বলিয়া শ্মশান-ঘাটে চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া মিলির বাবা নরেনকে ঠাসিয়া বকিয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্যই সে রাগ করিয়া মিলিকে সঙ্গে লয় নাই। সঙ্গে লইলে মিলি নিশ্চয়ই নদীর পারে একাকী তালগাছটার তলায় নরেনের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইত—এক ঝাঁক গাঙ-শালিকের মতো দূর হইতে কখন বান আসে তাহাই দেখিবার আগ্রহে মিলিও নিশ্চয় নরেনের মতোই টের পাইত না পায়ের তলে কখন প্রকাণ্ড চিড় ধরিয়া তালগাছ শুদ্ধ জমিটা আলগা

হইয়া আসিয়াছে। তাহা হইলে সেও নিশ্চয় নরেনের মতোই ঢেউয়ে ভাসিতে-ভাসিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত কে জানে।

কতো দিন ধরিয়া কতো খোঁজ করা হইল, রাক্ষুসি নদী নরেনকে কিছুতেই ফিরাইয়া দিল না।

মানবের স্পর্শে আজ তাহার জীবনের প্রথম বেদনার কথাটি মনে হইতেছে।

সেই নরেন আজ যৌবনে বলদৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষের সৌন্দর্য বাহুতে, নারীর যেমন করতলে। নারীর যদি গ্রীবায়, পুরুষের স্কন্ধে।

সেই নরেন আজ ঢেউ ভাঙিয়া সমুদ্র ডিঙাইয়া মিলির জীবনে কূল পাইল নাকি।

এই সংসারে মানবের এই আকস্মিক প্রতিষ্ঠার নানা-রকম কাহিনী শুনিয়া সে এখানে আসিবার আগে হইতেই মানবের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু যাহা কিছু চেষ্টার তাহা ইচ্ছার কাছে অবশেষে হার মানিয়া যায়।

যে-বসন্ত অরণ্যে মুখর, তরঙ্গে ফেনায়িত, আকাশে সুনীল—সেই বসন্তই মিলির দেহে রেখাসঙ্কুল ও আত্মায় অনুভবময় হইয়া উঠে। মিলি বুকের উপর দুই হাত উপুড় করিয়া রাখিয়া একমনে সমস্ত দেহের রক্ত-চলাচল শুনিতে থাকে।

মাঝখানে মাত্র এক দেয়ালের ব্যবধান।

বহু স্তব্ধতার, বহু প্রতীক্ষার, অনেক অনুনয়ের।

১০

মানব চুল ব্রাশ করিতে-করিতে এই ঘর থেকে : তোমার হল ?

মিলি কাঁধের কাছে ব্রোচ আঁটিতে-আঁটিতে—ও-ঘর থেকে : প্রায়।

দুইজনে নিচে নামিয়া আসিল। মিলির পরনে সিল্কের মোলায়েম শাড়ি —উদয়াস্তের আকাশের মতো লাল! অতিমাত্রায় প্রখর ও প্রকাশিত হইতে না পারিলে মিলির বুঝি লজ্জার আর অন্ত থাকিত না। এই শাড়ির আবরণে সে নিজের কুণ্ঠাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

মানব কহিল—সাইড-কারটা আর চলে না এখন। পেছনে বসতে পারবে না ?

মিলি ভয় পাইয়া কহিল—যদি ছিটকে পড়ে যাই!

—পড়বে কেন ? ভয় করলে স্বচ্ছন্দে আমার কাঁধ ধরবে।

মিলি হাসিয়া ফেলিল : তা হলে আপনাকে শুদ্ধু। আর ভয় নেই।

বুক বিস্ফারিত করিয়া মানব হাওয়ায় চুল ও শার্টের চওড়া কলারটা উড়াইতে-উড়াইতে প্রায় উড়িয়া চলিয়াছে। পাশে মিলি স্তব্ধ ও সঙ্কুচিত। শুধু দুই তিনটি চুল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো ভুরুর কাছে কখনো বা চোখের পাতার উপর ঘুরিয়া-ঘুরিয়া খেলা করিতেছে; এমন ভাবে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে যে দেখিলে মায়া হয়।

মিলি না বলিয়া পারিল না : আরেকটু আস্তে চালালে কি ক্ষতি হতো ?

মানব মিলির দিকে দৃকপাত না করিয়াই কহিল—সাড়ে ছটা এই বাজলো। এখুনি ঘোর অন্ধকার হয়ে যাবে।

আরেকটু হইলে ঐ বিয়ুইকটার সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়াছিল আর কি! এক চুলের জন্য বাঁচিয়া গেছে। মিলি দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিল।

মানব হাসিয়া কহিল—তুমি নিতান্ত ভীতু। ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যেতে তোমার ভালো লাগে না? বলিয়া লিণ্ডসে স্ট্রিটে সে বাঁক নিল। মিলির ঠোঁটে হাসি—হাসিলে আবার চিবুকের ডান দিকে ছোট একটি টোল পড়ে: সব চেয়ে ভালো লাগতো যদি দয়া করে আমাকে ফুটপাতে নামিয়ে দেন। আমি একটা রিকসা ডেকে বাড়ি ফিরি।

মানব কহিল—বেশ তো, দুজনে একদিন না-হয় রিকসা চড়েই বেড়ানো যাবে। এ যেন তুমি অনেক দূরে বসে আছ।

কথাটা মিলির মানবের ছোঁয়ার মতোই মনোরম লাগিল।

সিনেমায় পিছনের দুইটা গদি-আঁটা চেয়ারে দুইজনে বসিয়াছে—মাঝে একটা হাতলের মাত্র ব্যবধান। মিলি কনুইটা আঁচলের তলায় গুটাইয়া নিল।

পর্দা কথা কহিতেছে বটে, কিন্তু পরস্পরের সান্নিধ্যে অভিভূত হইয়া দুইজনে স্তব্ধ হইয়া বোধ করি একটি প্রত্যাশিত স্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সমস্ত ঘর ভরিয়া মধুর ও সুগন্ধময় অন্ধকার!

মানব হাত বাড়াইয়া মিলির হাতের নাগাল পাইল—সে-হাত ধরা দিবার জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। মানব মিলির হাতখানি মুঠার মধ্যে তুলিয়া লইল। আবেগে যে-বাণী অর্ধস্ফুট, আবেশে যে-দৃষ্টি অর্ধনিমীল—ঠিক তাহাদেরই অনুরূপ এই স্পর্শকুণ্ঠ হাতখানি—পায়রার বুকের মতো ভীরু! মানবের মুঠির মধ্যে মিলি তাহার হাতখানি যেন ঢালিয়া দিল—মানব এই স্পর্শের মধ্য দিয়া মিলির হৃৎস্পন্দন শুনিতেছে।

এই স্পর্শের মধ্য দিয়া মিলি তাহার আত্মাকে অবারিত করিয়া দিয়াছে। মানবের সমস্ত চেতনা অনুভবের গভীরতায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠে।

তার পর দিন প্রিনসেপস ঘাট:

সন্ধ্যার আকাশে মৃত সূর্যের ঐশ্বর্য, মুখর নগরের চলমান শোভাযাত্রা দেখিতে মেঘের বাতায়নে ঐ দূর প্রবাসিনী তারাটির সলজ্জ দৃষ্টি,

সমুদ্রের ঢেউ ভাঙিয়া পারহীন পরিধিহীন নিরুদ্দেশের পানে যাত্রা কী যে সে উন্মাদনা, নিয়মিত ও পরিমিত জীবনের ছোট সুখ লইয়া দিন-কাটানোর চেয়ে দুই বিশাল ও শক্তিশালী পাখা ঝঞ্ঝা-বিদীর্ণ আকাশে বিস্তারিত করিয়া দিতে কী যে সে রোমাঞ্চ, অভ্যাস নয়, বৈচিত্র্য—গতানুগমন নয়, অগ্রগতি—এই সব কথার শেষে :

মিলি বলে—ঐ একটা নৌকো করে একটু বেড়িয়ে এলে কেমন হয়?

মানব তক্ষুনি নৌকা ঠিক করিয়া ফেলে। মানব পাটাতনের উপর লাফাইয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া মিলিকে পার হইতে তুলিয়া আনে। স্রোতের ফুলের মতো হালকা নৌকাটা ঢেউয়ের গায়ে-গায়ে দুলিয়া-দুলিয়া চলে। মানব বলে—এই যেমন তুমি। আমার জীবনে অভ্যুদয় তোমার নবীন—সমস্ত পুরোনো খোলস আমি খসিয়ে এসেছি।

মিলি হাঁটুর উপর গাল পাতিয়া ঢেউয়ের ছলছলানি শুনিতে-শুনিতে তন্ময় হইয়া বলে—আর আমার জীবনে আপনার অভ্যুদয় প্রথম—এখান থেকেই হয় তো আমার জীবনের সত্যিকারের সূচনা।

রাত্রি একটু-একটু করিয়া ঘনাইয়া আসে—নদীর জলের উপরের ম্লান ও শীতল স্তব্ধতাটি অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। মানব মিলির কথা—বাড়ির কথা, শৈশবের কথা সব খুঁটিয়া-খুঁটিয়া জানিতে চায়।

মিলি উৎসাহিত হইয়া বলে : পুরোনো বাড়ি বেচিয়া তাহারা কবে নূতন বাড়িতে উঠিয়া আসিয়াছে, দক্ষিণে নদী শুকাইয়া প্রকাণ্ড চর পড়িয়াছে, একটু-একটু করিয়া এখন আবার ভাঙিতেছে নাকি—তিন বৎসর হইল তাহার মা মারা গিয়াছেন, সেই হইতে বাবা কেমন উদাস হইয়া পড়িয়াছেন, নিরালায় বসিয়া খালি সেতার বাজান—একবার ছুটিতে সে দেশের বাড়িতে বেড়াইতে যাইবে—সে এতকাল ঢাকায় পড়িতেছিল, কলিকাতায় না আসিলে তাহার জীবনে সত্যকারের রঙ ফুটিবে না বলিয়াই এখানে কলেজে সে পড়িতে আসিয়াছে।

একটা ফেরি-স্টিমার এ-দিক দিয়া আসিতেছে।

মানব কহিল—ছেলেবেলায় তোমার জীবনে একটাও কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটেনি? বলো না একটা।

মিলির মনে নরেন-দার মৃত্যুর কথাই জাগে—উহা ছাড়া এমন আর কী ঘটিয়াছে যাহা মনে করিতে আজো তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠে! চোখ বুজিয়া তাহার মুখ মনে করিতে গেলে খালি সেই রাক্ষুসি নদীর কথাই মনে পড়ে—সে-মুখ জলের মধ্যে কোথায় তলাইয়া গেছে।

প্রথমতম দুঃখানুভবের কথা বলিতে-বলিতে মিলির চোখ রাতের নদীর মতো স্নিগ্ধ হইয়া উঠে; সেই চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে-থাকিতে মানবের আবার মা'র কথা মনে পড়ে।

মিলি বলে—আপনার কথাও কিছু বলুন না—

কিন্তু হঠাৎ দুর্বল নৌকাটা ভীষণভাবে দুলিয়া উঠিল; নদী আর নির্জীব নয়, ঢেউগুলি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—নৌকাটা বুঝি এইবার উলটাইবে।

মিলি চোখের পলকে মানবের কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। উঁচু ডালের পাতার মতো মিলির বুক কাঁপিতেছে, শরীরে যতখানি ভয় ততখানি স্নেহ—নরেন-দার সঙ্গে এইবার তাহাকেও বুঝি জলের তলায় বাসা নিতে হইল! নরেন-দা তাহাকে সেই চির-বিস্মৃতির দেশে ডাকিয়া নিতে আসিয়াছে বুঝি।

মানব মিলির পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল; ভয় নেই। স্টিমারটা পাশ দিয়ে চলে গেল কি না, তাই নৌকাটা টাল সামলাতে পারে নি। মাঝিরা বেশ হুঁসিয়ার।

নদী ফের প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিতেছে, তবু সেই স্পর্শসান্নিধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সরাইয়া নিতে মিলির কেমন যেন ইচ্ছা হয় না। সর্বাঙ্গ দিয়া একটা নিবিড় উত্তাপের স্বাদ পাইতে থাকে। বলে—পারে নৌকা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলো।

কপালের উপর হইতে তাহার কয়েকটি চুল কানের পিঠের দিকে তুলিয়া দিতে-দিতে মানব বলিল—তুমি নিতান্তই মেয়ে, মিলি। বেশ তো, এক সঙ্গে না-হয় ডুবেই যেতাম।

মিলির মুখে এইবার হাসি ফুটিয়াছে : পারের কাছে এসে পড়েছি কিনা, তাই এখন যতো বীরত্ব! স্টিমারের চাকার তলায় পড়লে তখন বোঝা যেতো আপনিও নিতান্ত ছেলে কিনা। আপনিও তো কম কাঁপছিলেন না।

মানব হাসিয়া কহিল—সে কি ভয়ে নাকি? তোমাকে নিয়ে মরবার চমৎকার সম্ভাবনায়। তুমি কিচ্ছু বোঝ না।

—দরকার নেই বুঝে। বুঝতে গেলেই ফর্সা। তার চেয়ে দয়া করে বাড়ি নিয়ে চলুন।

—বাড়ি ফিরবার পথও বিশেষ সমতল নয়। জলে যদি নৌকো, ডাঙায় তেমনি মোটর। মরতে তোমার এতো ভয়?

—এতো ভয়! চোখ বুজে রাম-নাম জপতে-জপতে যদি কোনোরকমে এবার তরে যাই, তবে বিছানা ভরে গা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে সে যে কী আরাম পাবো, আপনার সঙ্গে মরে তার এককণাও পাওয়া যাবে না। ঐ তো ঘাট, না? বাঁচলাম।

এক নিশ্বাসে পথ ফুরাইয়া গেল। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া মিলি মুখে কিছু গুঁজিল কি না-গুঁজিল, তারপর বকের পাখার মতো নরম তকতকে বিছানা!

বলা-কহা নাই, কেনই বা যে পাশ দিয়া ষ্টিমার ছুটিয়া আসে, নৌকা বেসামাল হইয়া উঠে, মাঝিরা হিমসিম খায়—সমস্ত দৃশ্যজগৎ আড়াল করিয়া মুহূর্তের জন্য মৃত্যু ঘন হইয়া আসে।

কেন এমন হয়!

খোলা জানালা দিয়া শীতের ধোঁয়াটে আকাশের দিকে মিলি এক-

দৃষ্টে চাহিয়া থাকে—সারা আকাশে কোথাও এতটুকু উত্তর লেখা নাই।

তার পর ফির্‌পোতে—একতলায় :

মুখোমুখি চেয়ারে মিলি আর মানব—টেবিলের উপর রাশীকৃত খাদ্য। মিলি কোনোদিন তাহাদের নামও শোনে নাই; দাম জানিয়া এইবার সে দস্তুরমতো রাগ করিল।

কহিল—এমনি করে আপনি খালি টাকা উড়োন কেন?

চিবাইবার শব্দ করিতে-করিতে মানব নির্লিপ্তের মতো কহিল—টাকা আছে বলে।

—আছে বলেই কি এমনি অপব্যয় করতে হবে নাকি?

—অপব্যয় হচ্ছে অজস্রতার প্রমাণ। হাতে যা আছে—তা ত্যাগ করতে না পারলে আমি মুক্তি পাই না।

কাঁটা-চামচের মৃদু-মৃদু শব্দ করিতে-করিতে মিলি বলিল—মেসোমশাই আপনাকে এতো টাকাও দেন।

ঘাড় হেলাইয়া মানব কহিল—দেন। ফুরোলে যদি ফের হাত পাতি, সে-প্রার্থনাও অপূর্ণ থাকে না। কার জন্যেই বা এতো টাকা জমাচ্ছেন তিনি? একদিন আমার হাতেই তো এসে পড়বে। তবে যৌবনের এ কয়টা দিনকে দীপ্ত ও তপ্ত করে যাই না কেন!

মিলি কি বলিতে যাইতেছিল তাহাতে বাধা দিয়া: পূর্ব-পুরুষের সঞ্চিত টাকা উত্তরাধিকারীরা সাধারণত যে-রকম করে ভোগ করে সেই প্রথাটা বড্ড পুরানো হয়ে গেছে। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র আভিজাত্য নেই। মদ বা তার আনুষঙ্গিক অনুপানগুলিতে না আছে স্বাদ, না বা মাদকতা। জীবনকে ভোগ করা অর্থ নিজেকে ক্ষয় করা নয়। আমার আদর্শ মহত্তর।

বিশ্বাসগভীর আয়ত দুইটি চোখ তুলিয়া মিলি কহিল—যথা?

—আমার ভোগ করার আদর্শ নিজেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া—কর্মে, প্রচেষ্টায়, অনুধাবনে। এ তুমি আমার কী ব্যয় দেখছ? আমি নিজেকে কতো দূরপর্যন্ত উজাড় করে দিতে পারি তা তুমি জানো না। কিন্তু খেতে আর ভালো লাগছে না, না?

মিলি স্বচ্ছন্দে খাবারের প্লেটটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল—একটুও না।

—তবে চলো, এবার পালাই।

বিল দেখিয়া মিলির চক্ষু স্থির: সাড়ে বাইশ টাকা?

মানব পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিতে করিতে হাসিয়া কহিল—তাই শুধু নয়, ওয়েটারকে আড়াইটে টাকা বকশিস দিতে হবে।

—আড়াই টাকা? মিলি আকাশ হইতে পড়িল: কিন্তু কী বা আপনি খেলেন!

এ তো খাওয়ার জন্যে নয়, তোমাকে নিয়ে খাওয়ার জন্যে।

—এমনি করে ধুলো-মাটির মতো দু-হাতে টাকা উড়োতে থাকলে আপনার আর ছড়িয়ে পড়বারই বা বাকি কি? দুদিনেই সম্পত্তি যাবে উবে, একটি বৃহদাকার শূন্য আপনার মূলধন।

মানব মিলির মুখের দিকে চাহিতে পারিল না: সে-শূন্য আমার জমার ঘরেরই শূন্য, মিলি। তুমি কাছে থাকলে সেই শূন্যই আমার ঐশ্বর্য হয়ে উঠবে।

এ-সব কথা শুনিতে মিলিরও ভালো লাগে।

মানব চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল: চলো, বেরুই।

রাস্তার ও-ধারে মির্জা গাড়ি নিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—মিলির সঙ্গে গাড়িতে একটু আলস্যসুখ ভোগ করিবার জন্যই মানব মির্জাকে নিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখন আর গাড়ি নয়। মানব কহিল—চলো, মাঠে একটু হাঁটি।

নিশ্বাস ভরিয়া শিশিরার্দ্র অন্ধকারের গন্ধ নিতে-নিতে মানব কহিল—

আমার রক্তের মাঝে এক বৈরাগীর বাসা আছে, মিলি। সে আমাকে এক মুহূর্তও বিশ্রাম করতে দেয় না। এইখানে এসো একটু বসি।

মিলি আর মানব মুখোমুখি বসিল। দুইজনকে ঘিরিয়া একটি মধুর অনির্বচনীয় স্তব্ধতা রাশীকৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই নিঃশব্দতাকে মিলির কেমন যেন ভয় করিতেছে। সে যেন নিমেষে আত্মার এই অপার নিঃশব্দতায় তাহার অস্তিত্ববোধকে হারাইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ দুইজনে তাহারা এমন করিয়া চুপ করিয়া গেল কেন? ও-পারে চৌরঙ্গিতে সারি-সারি আলো ও কোলাহলের টুকরা—এ-পারে একটি অনিমেষ প্রতীক্ষা—কে কখন আগে সম্বোধন করে!

মানবই কথা কহিল—তোমাকে দেখে খালি আমার মা'র কথা মনে পড়ে, মিলি।

বলিতে-বলিতে গভীর স্নেহে মানব মিলির বাঁ-হাতখানি হাতের মুঠায় তুলিয়া লইল। সেই স্পর্শে তাহার মা'র সান্ত্বনাটি অম্লান হইয়া আছে। হাতখানি কখনো ছাড়িয়া দেয়, আবার কখনো গ্রহণ করে, কখনো কপালের উপর রাখে, কখনো-বা নিচু হইয়া তাহাতে মুখ ঢাকে। মিলির দেহ অন্ধকারের মতো নিঃশব্দস্পন্দিত হইতে থাকে।

মিলি কহিল—আপনার মা এখন কোথায় আছেন কিছুই জানেন না?

—আছেনই বা কি না তাই বা কে জানে। আমার বাবা সন্ন্যাসী, মা গৃহত্যাগিনী—একজনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও আরেকজনের দুঃখ, একজনের ঔজ্জ্বল্য ও আরেকজনের গভীরতা—আমার দিন-রাত্রি এই দুই সুরে বাঁধা আছে। আমি নিজের কথা খুব বেশি বলতে চাই—আমার বিষয় আমি নিজেই—

—বেশ তো বলুন না। আপনার মা'র কথা আমার এতো জানতে ইচ্ছা করে।

—আমারো। কিন্তু কী করেই বা জানবো বলো।

—কী করে এ-বাড়িতে আপনারা এলেন, কেনই বা তিনি চলে গেলেন—

মানব উদাসীনের মতো কহিল—সব এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু তোমার মুখ দেখে আমার ভয় হয় মিলি, মা'র হয় তো আর দেখা পাবো না। এই বলিয়া মানব মিলিকে নিজের কাছে আকর্ষণ করিল।

মিলি টলিল না, কহিল—সতীশবাবু আপনাকে তা হলে পোষ্য নেননি? তবে—

—না। এ-সব কথা এ-সময়ের জন্যে নয়। এবার উঠবে?

—না, আরো একটু বসি।

কিন্তু যে-দিনের কথা বলিতেছিলাম :

মিলি মোটর-সাইকেলে মানবের পিছনেই বসিয়াছে—ভয় করিতেছে বটে, কিন্তু এই বেগের আনন্দ তাহার দেহের প্রতিটি রেখায় উচ্ছলিত। পরনে সাদাসিধে শাড়ি—আঁচলটা দড়ির মত পাকাইয়া কোমরে বাঁধা, তাহাতে সমস্ত শরীরে একটি ক্ষিপ্রতা আসিয়াছে। একটা এলো খোঁপা বাঁধিয়া আসিয়াছিল, গাড়ির ঝাঁকুনিতে খোঁপা কখন খুলিয়া গিয়া পিঠময় চুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হাত তুলিয়া হাওয়াকে শাসন করিবার যো নাই।

একটা মোটরকে পাশ কাটাইয়া মানব কহিল—একটা দুর্ঘটনা ঘটলে কেমন হয়?

মিলি বলিল—চমৎকার। আমার আর ভয় নেই।

—ভয় নেই?

—না। চাই-ই এমন দ্রুত ছোটা আর দ্রুত পদস্খলন। তার জন্যে আমি তৈরি হয়ে আছি। মিলি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বালিগঞ্জ এভিনিউ হইয়া গড়িয়াহাট রোডে দু-তিন চক্কর দিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাস্তার পাশে গাড়ি রাখিয়া দুইজনে ঘাসের উপর বসিল। পথে লোকজন বেশি চলাফিরা করিতেছে না।

মানব বলিতে লাগিল: দুদিন বাবার প্রতীক্ষায় সেই স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টারে থেকে গেলাম, কিন্তু একবার যখন সরেছেন তখন আর যে তিনি ফিরবেন না—মা'র এই সন্দেহ কিছুতেই দূর হচ্ছিল না। অন্যায় যদিও বা তিনি করেন তো অনুতাপ করতে শেখেন নি। নিশ্চিত মুক্তির কাছে স্ত্রী-পুত্র তাঁর কাছে একান্তই তুচ্ছ মনে হয়েছিলো। বাবাকে আমি দোষ দিতে পারি না, মিলি।

মিলি বিস্মিত হইল: এই নিষ্ঠুরতাকে আপনি সমর্থন করেন?

বুক ভরিয়া নিশ্বাস নিয়া মানব কহিল—করি। জীবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুর না হলে চলে কী করে? আমি আর মা ওঁর উচ্ছৃঙ্খলতার বাধা ছিলাম—আত্মবিকাশের বাধা। কারু-কারু আত্ম-বিকাশ অধঃপতনের মধ্য দিয়েই ঘটে—তাকে বাধা দিয়ে খর্ব করে রাখলে তার জীবনের প্রবলতম সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। বাবা যে মিথ্যা মোহে পড়ে নিজের চরিত্রকে কর্তব্য বা দায়িত্বের বাঁধনে বেঁধে পঙ্গু করে ফেলেন নি, সে-জন্যে আমি তাঁকে প্রণাম করি। সবাই আমার বাবাকে ভিলেইন বলে নাক কুঁচকোয়, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে আমি তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না।

মিলি কহিল—এ আপনার পক্ষপাতিত্ব ছাড়া কিছু নয়।

—বরং তাঁর ছেলে বলেই তো আমার তাঁকে ক্ষমা করা উচিত ছিলো না। তাঁর জন্যেই যে মা পরমতম দুঃখের পথে হারিয়ে গেছেন, সে আমি ছাড়া আর কে বেশি অনুভব করে বলো? ভাগ্য না ভোজবাজি খেললে বাবার অপরাধে আমি সমাজের কোন আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়তাম তা কল্পনা করলেও তুমি শিউরে উঠবে। তবুও এতো সবের কোথাও নিশ্চয়ই

প্রয়োজন ছিলো। বাবার চরিত্রের এই মহত্ত্ব আমাকে খুব একটা নাড়া দেয়, মিলি।

—কিছু মনে করবেন না, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে অসহায় স্ত্রী-পুত্রকে ঠেলে দিয়ে পালানোকে মহত্ত্ব বলতে মন সরে না।

মানব জোর দিয়া কহিল—তোমাদের মনে যে মরচে পড়ে আছে। ধর্মের জন্যে স্ত্রী-পুত্রকে কেউ তুচ্ছ করলে তোমরা দু-হাত তুলে স্বস্তিবাচন করবে, কিন্তু জেনো ধর্মও আত্মবিকাশই।

মিলি হাসিয়া কহিল—আপনার এ-সব মতগুলিকে আমার ভয় করে।

—যাই বলো, পৃথিবীতে দারিদ্র্যই একমাত্র দুঃখ নয়—সে-দুঃখ উত্তীর্ণ হয়ে একদিন বাবার এই দৃষ্টান্তকে আমি সম্মান করতে পারবো এ-আশা তিনি করেছিলেন নিশ্চয়। আমার রক্তে এমনি একটি বন্ধনমোচনের সুর আছে। তোমার আমাকে ভয় করে, মিলি?

মানবের হাতের মধ্যে নিঃশঙ্ক স্নেহে হাত দুইখানি সমর্পণ করিয়া মিলি কহিল—আপনার মার কথা বলুন। সেদিন বলতে-বলতে থেমে গেলেন—

—শেষটা আমি জানি না। গোড়ার পরিচ্ছেদগুলি অতিমাত্রায় দীর্ঘ ও করুণ। তা শুনলে বাঙালি মেয়ের চোখে জল এসে পড়বে। পরের দুঃখে অকারণ অশ্রুবর্ষণ করে লাভ নেই। সেই সব দুঃখের রাত কাটিয়ে যেদিন আমার মা'র প্রথম সুপ্রভাত হল সেদিন আমরা এ-বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছি মাত্র। সেদিন এ-বাড়িতে তোমার মাসিমার বিয়ে হচ্ছে।

একটু শীত-শীত করিতেছিল বলিয়া আঁচলটা পিঠের উপর দিয়া পুরু করিয়া টানিয়া লইয়া মিলি কহিল—ঠিক সেই দিনই?

—হ্যাঁ, বড়লোকের বাড়িতে উৎসব দেখে মা'র হাত ধরে ঢুকে পড়লাম। তিনদিন তখন খেতে পাইনি কিছু, নেমন্তন্ন-বাড়িতে ঠাঁই হয়ে গেল। কিন্তু সেই থেকে যে কী করে এ-বাড়িতে শিকড় গেড়ে বসলাম ভাবতে আমি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাই, মিলি। মা'র দৈন্যের মালিন্য তাঁর

চেহারার সে স্বাভাবিক আভিজাত্যটুকুকে নষ্ট করতে পারে নি। তোমার মেসোমশাই সতীশবাবু তা বুঝতে পেরেছিলেন।

একটু থামিয়া : সতীশবাবু মাকে আশ্রয় দিলেন। মা নিচের ঘরেই পড়ে রইলেন বটে, আমি এক-এক ধাপ ডিঙিয়ে ক্রমশ ওপরে উঠতে লাগলাম। জানোই তো তোমার মাসিমা তৃতীয় পক্ষ। প্রথম স্ত্রী শুনেছি নাকি সন্তানবতী হতে পারেনি বলে শাশুড়ির বাক্য-যন্ত্রণা সইতে না পেরে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছিলো—দ্বিতীয়টি নাকি এখনো পিত্রালয়ে বর্তমান আছেন। তা, তোমার মাসিমারো তো এই দশ বৎসর পুরতে চললো। কিন্তু আমাকে পেয়েই তোমার মেসোমশাই নিবৃত্ত হলেন—কিন্তু কেন যে তিনি আমাকে ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করতে শুরু করলেন সেইটেই আমার কাছে রহস্য থেকে গেল। পোষ্য নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না—তাঁর পিতৃহৃদয় আমার জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন একেবারে।

মিলি ব্যস্ত হইয়া কহিল—মাসিমাও আপনাকে কি তেমনি করে নিতে পেরেছেন?

—তাঁর স্বামী যেখানে সদাব্রত, সেখানে তাঁর কৃপণতাকে আমি কেয়ার করি না। কিন্তু ছেলে হবার সময় তাঁর এতোদিনে পেরিয়ে গেছে মনে করে তিনিও ইদানি আমার প্রতি সদয় হয়ে উঠছেন। কিন্তু আমি কোথাকার কে বলো তো—কী অসাধ্যসাধন না করছি! এতো সব দেখে তোমার সত্যিই কি সন্দেহ হয় না মিলি, যে সত্যিই আমি জীবনে সুখ পেতে আসিনি?

—কিন্তু আপনার মা'র কী হল?

দীর্ঘনিশ্বাস দমন করিয়া মানব কহিল—আমাকে এ-বাড়ির দোতলায় পৌঁছে দিয়েই তিনি অন্তর্ধান করলেন। কোথায় তিনি গেলেন—কেউ কিছু বলতে পারলো না।

মিলি মানবের হাতের উপর হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিল—হয়তো তিনি স্বামীরই খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন।

—বাবার প্রতি মা'র সেই মিথ্যা অনুরাগ ছিলো না, মিলি। সংসারে এমন কোন অত্যাচার তাঁকে সইতে হল যে আমাকে পর্যন্ত তিনি হারিয়ে যেতে দিলেন? আমার জীবনে অন্তত লুকিয়ে উঁকি দিতেও তিনি এলেন না—

মিলির দুইটি সান্ত্বনাসিক্ত চোখের দিকে চাহিয়া, তাহাকে দেহের কাছে একটু আকর্ষণ করিয়া : শুধু তোমার এ-দুটি চক্ষু ছাড়া!

১১

ইহার পর আরো একদিন আছে। প্রায় এক বৎসর পরে।

দিন নয়—রাত্রি। খাওয়া-দাওয়া কখন চুকিয়াছে—যে-যার ঘরে ঘুমাইবার কথা।

মিলি তাহার ঘরে টেবিলের কাছে বসিয়া কি-একটা বই পড়িতে চেষ্টা করিতেছে, হঠাৎ চোখ ফিরাইয়া দেখিল পর্দা ঠেলিয়া মানব ঘরে ঢুকিল, একটু হাসিল—কোনো কথা না কহিয়া সেল্ফ হইতে একটা ছবির পত্রিকা লইয়া একেবারে বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িল।

কাগজের পৃষ্ঠা উলটাইতে উলটাইতে : তুমি পড়ায় এতো মনোযোগী হয়ে উঠলে কবে থেকে ?

মিলি ঘাড় না ফিরাইয়াই কহিল—খেয়ে-দেয়ে তক্ষুনি শুতে নেই।

—কিন্তু বিছানায় আসতে কিছু দোষ আছে ?

—তুমিই বরং চেয়ারটা টেনে পাশে এসে বোস না।

—তার পর ?

—খুব খানিকটা আড্ডা দেওয়া যাবে। পর্শু ছুটি—তুমি যাচ্ছ তো আমার সঙ্গে ?

—কোথায় ?

—বা, সেই কবে থেকেই তো নাচছ যে পূজোর ছুটি হলে আমাকে সঙ্গে করে আমাদের দেশের বাড়িতে যাবে।

—আরো অনেক দেশ আছে, মিলি। তাদের এক-আধটার নাম শুনলে দস্তুরমতো তুমি লাফাতে শুরু করবে।

মিলি চেয়ারটা ঘুরাইয়া বসিল : যথা ?

—যথা, ধরো নিউইয়র্ক। ঐ পুঁচকে পদ্মা নয়, বিরাট আটলান্টিক

মিলি নিচের ঠোঁটটা সামান্য উলটাইয়া ফুঃ করিল।

বালিশ ছুইটাতে বুকের ভর রাখিয়া মানব কহিল—তুমি বিশ্বাস করছ না বুঝি ? সত্যি বলছি চলো না, ভেসে পড়ি! নিউইয়র্ক পছন্দ না হয়, ভেনিসে না-হয় বাসা বাঁধবো। বাসা বাঁধতে হলে অবশ্যি ইটালিতেই—

মিলি পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া কহিল—সেখানে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে শেষকালে য়্যাড্রিয়াটিকে ভাসিয়ে দাও আর কি। তখন বুঝি আর আমার মুখের দিকে তাকাবে ভেবেছ! আমি তো তখন তোমার কাছে নেহাৎই বাঙলা-দেশের নরম তুলসী-পাতা। তার চেয়ে কায়ক্লেশে এখানেই থেকে যাও না-হয়।

উত্তেজনায় মানব বালিশ ছাড়িয়া ছুই কনুইয়ের উপর ভর রাখিয়া একটু সোজা হইল : না, না, সুযোগ পেলে ছাড়তে নেই। আমি তোমার মেশোমশায়কে সেদিন বলেছিলাম, তিনি টাকা দিতে প্রস্তুত। তোমার প্যাসেজ আমি নিজেই জোগাড় করে নিতে পারবো। কিসের তোমার এই বটানি, কিসের বা ইলিসিট মাইনর। চলো, মোটা-সোটা স্যুটকেশ সাজিয়ে দুজনে পড়ি বেরিয়ে! বাধা যদি বা কিছু থাকে, থাক। কোথাও কিছু একটা বাধা না থাকলে ভালো লাগে না।

মিলি চেয়ার ছাড়িয়া ধীরে-ধীরে বিছানার একটি ধারে আসিয়া বসিল। স্নিগ্ধস্বরে কহিল—কেমন যেন খুব সহজ লাগে। সহজ লাগলেই নিজেকে কেমন যেন দুর্বল মনে হয়। বলিতে-বলিতে পা দুইটি গুটাইয়া মিলি সেতার বাজাইবার ভঙ্গিতে বসিল।

মানব কহিল—অন্তরের বাধা কবে যে পার হয়ে এলাম। আজ ছ-মাসের ওপরে তোমার মাসিমা তাঁর বাপের বাড়িতে আছেন—কেন আছেন বলতে পারো ?

—কি করে বলবো ?

—তাই অন্তঃপুরেরও সমস্ত বাধা শিথিল ছিলো। তোমার মেসোমশাই সারা দিন-রাত্রি সাধু-সন্ন্যাসী নিয়েই মশগুল—আমরা কে কোথায় কি করছি চোখ ফেরাবারও তাঁর সময় নেই।

মিলি একটা বালিশ লইয়া তাহাতে সামান্য একটু কাৎ হইল—বাঁ-হাতের তালুর উপর এলো খোঁপাটা আলগোছে নোয়ানো : কিন্তু ছেলেবেলায় শুনেছিলাম যে তিনি দারুণ ডাকসাইটে অত্যাচারী ছিলেন। প্রথম স্ত্রী তো আত্মহত্যা করতেই বাধ্য হল, দ্বিতীয় স্ত্রীকে নাকি লাথি মেরে বাড়ির বার করে দিয়েছিলেন। তবু তাঁর সন্তান চাই—তাই আবার তাঁর সহধর্মিণীর প্রয়োজন ঘটলো। আজকাল নেহাৎ ধর্মে-কর্মে মন দিয়েছেন বলেই এখানে আসতে দিতে কাকীরা আর আপত্তি করলে না। নইলে তো বোর্ডিংএই চলে যেতাম।

এইবার মানব মিলির ডান-হাত ধরিল : যাও না।

মিলি হাসিয়া কহিল—তুমি বোর্ডিংএর দারোয়ান থাকবে বলো, ঠিক যাবো।

—কিন্তু রাত্রে তোমার বিছানায় ঠিক শুতে দেবে ?

মিলি মানবের হাতের কব্জিতে জোরে এক চিমটি কাটিয়া বসিল।

মানব কহিল—তুমি মেয়ে হয়েছ বলেই যে তোমার গায়ে হাত তোলা যাবে না এটা নারীর সমানাধিকারের দিনে মেনে চললে তোমাদের অসম্মান করা হবে ; অতএব—

নিটোল বাহু দুইটির কি সুন্দর ডৌল—মানব দুই হাত দিয়া মিলির দুই বাহু মুঠি করিয়া ধরিয়া একেবারে তাহাকে কাছে লইয়া আসিল।

মিলি তাড়াতাড়ি দুইটা আঙুল দিয়া মানবের ঠোঁট চাপিয়া ধরিল, দরজার পর্দার দিকে সভয়ে দৃষ্টি ফেলিয়া চাপা গলায় কহিল—চুপ ! দেখছে।

মানব ভয় পাইয়া আকর্ষণ শিথিল করিয়া প্রশ্ন করিল—কে ?

মিলি তক্ষুনি ছাড়া পাইয়া এলো খোঁপাটা আঁট করিয়া বাঁধিতে-বাঁধিতে ইলেকট্রিক বালবটার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল—আলো।

মানব তৎক্ষণাৎ টুপ করিয়া স্যুইচটা অফ করিয়া দিল।

তীর অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের যেমন ঢেউ আসে, তেমনি করিয়া অন্ধকারে ঘর ভরিয়া উঠিল। সেই অন্ধকার ক্রমশ একটু তরল হইতেই মানবের মনে হইল এই বিছানাটা যেন হ্রদ, আর মিলি যেন একটা রাজহংস। দেহের প্রতিটি রেখা স্বচ্ছ, প্রতিটি ভঙ্গি সুষম, প্রতিটি লীলা লঘু।

অনেকক্ষণ কেহ কোনো কথা কহিল না। শুধু, রাত্রি যে গভীর, নীরবতা যে নিদ্রাচ্ছন্ন এবং অন্ধকারে সমস্ত অন্তরাল যে অপসৃত—দুইজনে নিশ্বাস নিতে-নিতে তাই কেবল অনুভব করিতে লাগিল।

মানব মিলির কোলের উপর মাথা রাখিয়া আস্তে কহিল—চলো, নতুন বাড়িতেই যাই।

মানবের কপালে ডান-হাতখানি পাতিয়া মিলি কহিল—চলো, বাবা তোমাকে দেখে নিশ্চয়ই খুব সুখী হবেন।

—কিন্তু প্রস্তাব শুনে হবেন কি?

কপাল হইতে হাত গালের উপর নামিয়া আসিয়াছে: আপত্তি করবার কোনোই তো কারণ দেখছি না।

—আপত্তি একটু করলে ভালো হতো, মিলি।

হাত পাঞ্জাবির তুলা দিয়া বুকের কাছে লুকাইয়াছে: আপত্তি করলে কে আর শুনছে বলো। আমাদের ভেনিস তো পড়েই আছে।

দুই হাত দিয়া মিলির কটি বেষ্টন করিয়া জানুর উপর মুখ রাখিয়া মানব তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ, বাধা কোথাও পেলে লাভ করবার মধ্যে বেশ একটা উন্মাদনা পাই। আচ্ছা, এক-হিসেবে তুমি তো আমার মাসতুতো বোন—তোমার বাবা বা কাকারা কেউ আপত্তি করবেন না?

মানবের ঘাড়ের কাছের চুলগুলিতে আঙুল বুলাইতে-বুলাইতে মিলি

কহিল—বাইরের ঐ-সব কৃত্রিম বাধাকেই তুমি বড়ো করে দেখ নাকি? আমরা যদি এমনতরো ঘনিষ্ঠ হয়েই উঠি কোনোদিন, তবে সে-ই তো আমাদের বড়ো পরিচয়।

—সেই আমাদের বড়ো পরিচয়, না মিলু?

মানব মিলির রাশীভূত শাড়ির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তাহার সর্বাঙ্গের ঘ্রাণ নিতে লাগিল।

কতক্ষণ কেহই কোনো কথা কহিল না।

মুখ না তুলিয়াই মানব কহিল—তবু কোনো বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে কাউকে পাবার মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি নেই, মিলি। প্রেয়সীর জন্যে যদি জীবন ভরে আঘাতের স্বাদ না পাই, তবে সে যে মৃত্যুর চেয়েও প্রিয়তরা এ-কথা বুঝি কি করে?

মিলি এই স্পর্শবন্যোচ্ছ্বাস হইতে হঠাৎ নিজেকে নির্লিপ্ত করিয়া লইল। অভিমানে করুণ করিয়া বলিল—ধরো, আমার অনিচ্ছাই যদি সেই বাধা হয়?

মানব অবাক হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার এই স্পর্শবিরহিত অস্তিত্ব যেন সে সহিতে পারিবে না। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সে অসহায়ের মতো প্রশ্ন করিল—তোমার অনিচ্ছা মানে?

মিলি তখন বিছানার অন্য প্রান্তে সরিয়া গিয়াছে: ধরো, একদিন যদি আমি বুঝি যে এ শুধু উদ্বেগ, ভালোবাসা নয়—এতে খালি দাহ আছে, সুধা নেই—অর্থাৎ আমার ইচ্ছা বা বাসনা যাই বলো, যদি একদিন মিলিয়ে যায় আর সমস্ত প্রতীক্ষার উপরে ধীরে-ধীরে উপেক্ষা নেমে আসে—

—সেই তোমার বাধা, মিলি? সেই বাধাকে আমি জয় করতে পারবো না ভাবছ?

বলিয়া মানব দুই হাত বাড়াইয়া মিলিকে বুকের মধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ডাকিল—মিলি!

মিলি মানবের বুকের মধ্যে এতটুকু হইয়া গেছে। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে উত্তর করিল—বলো।

—যে-দেহে দাহ নেই সে-দেহে স্বাদও নেই।

মিলিকে ঘনতর স্পর্শে আরো সন্নিহিত করিয়া মানব কহিল—আমাদের প্রেমে এই ভঙ্গুর ভাব-প্রবণতা নেই, মিলি। আমরা পরস্পরের কাছে প্রখররূপে প্রকাশিত।

মানবের দুই অধর মিলির চক্ষুর কাছে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মিলি কথা না কহিয়া মানবের কাঁধের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিল।

মানব হাত বাড়াইয়া সুইচটা টানিয়া দিয়া কহিল—এমন দৃশ্য চোখ ভরে না দেখে আর পারছি না।

কিন্তু আলো জ্বালিতেই চোখের পলকে কী যে হইয়া গেল মানব বুঝিতে পারিল না। মিলি হঠাৎ দুই হাতে সবলে সমস্ত স্পর্শের ঢেউ ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। একেবারে টেবিলের ধারে চেয়ারে গিয়া বসিল। তাহার মুখ দেখা যাইতেছে না। হাত তুলিয়া চুল ঠিক করিয়া কাপড়ের আঁচলটা পিঠের উপর দিয়া প্রসারিত করিয়া দুই কাঁধ ও বাহু ঢাকিয়া হঠাৎ সে বই নিয়া মনোযোগী হইয়া উঠিল।

উগ্র আলোক মানবের চোখেও সহিতেছে না।

কিন্তু পলাতক মুহূর্ত কি আর ফিরিয়া আসে?

তবুও মানব আরেকবার আলোটা নিভাইয়া দিল।

মিলির স্বরে স্পষ্ট বিরক্তি : বা, আমাকে পড়তে দাও।

—কাল পোড়ো।

—না।

—বেশ, কালকেও পোড়ো না। কালকে রাতে তাহলে—

—সত্যি বলছি আমাকে পড়তে দাও। তোমার না-হয় চাকরি না করলে চলবে, কিন্তু আমার একটা ইস্কুল-মাস্টারি তো অন্তত চাই।

মানব হাসিয়া উঠিল: তোমাকে আমি অনায়াসে অন্য চাকরি দিতে পারবো। এখন একবারটি উঠে এস দিকি।

—না, তুমি আলো জ্বালো।

—জ্বালবো, তুমি আমার দিকে মুখ করে বসবে বলো?

মিলি এইবার মামুলি ব্রহ্মাস্ত্র হানিল: দরজা খোলা আছে জানো? ঘর অন্ধকার করে বসে আছি, যদি কেউ দেখে ফেলে?

—যদি কেউ দেখে ফেলে, সেই জন্যে তো তাকে ভালো করেই দেখতে দেওয়া উচিত। অন্ধকার ঘরে এই কৃত্রিম দূরত্ব রেখে আমাদের নির্জীবের মতো বসে থাকাটাই তো অস্বাভাবিক। অথচ দরজা বন্ধ করলেই আমরা পরস্পরের কাছে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়বো। তার চেয়ে চলো না একটু বেড়িয়ে আসি।

মিলির স্বরে সেই ঔদাসীন্য: না, আমার এখন মুড নেই।

মানব এইবার বিছানা ছাড়িয়া দাঁড়াইল; কহিল—আলো জ্বালতেই বুঝি টের পেলে যে দরজা খোলা আছে। আর দরজা খোলা পেয়ে রাশি-রাশি লজ্জা আর ভীরুতা বুঝি তোমাকে গ্রাস করলো। বুঝতে পারছি তোমার এই লজ্জাই হচ্ছে আমার প্রেমের বাধা। তাকে কি আমি জয় করতে পারবো না?

বলিয়া মানব ঝুইয়া পড়িয়া মিলির উপর নিশ্বাস ফেলিল।

একটি মুহূর্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মতো মিলির সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রতীক্ষার তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে স্নায়ু-শিরাগুলি অভিভূত, ক্লান্ত হইয়া আসিল।

কিন্তু মানব কহিল—আজ থাক।

বলিয়া ফের সুইচটা টানিয়া দিয়া ঘর আলো করিয়া সে কহিল—তুমি বরং পড়ো।

তারপর বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় একটা মোটর-বাইকের ঝকঝকানি শুরু হইয়াছে। মিলি তবুও জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া একটিবার দেখিল না। ঘড়িতে একবার নজর পড়িল। এখন না-পড়িয়া শুইতে পারিলে সে বাঁচে। বিছানাটার দুর্দশা দেখিয়া তাহার শুইতেও ইচ্ছা হইল না। বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল। পরে ফের ঘরে গেল। আলো নিভাইল। এবং চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। ঘুমের জন্য নয়, কখন আবার মানব ফিরিয়া আসে!

অনেকক্ষণ পরে।

সিঁড়িতে ও-কাহার জুতার শব্দ মিলিকে বলিয়া দিতে হইবে না। মিলি চট করিয়া আলো জ্বালিয়া আবার তেমনি মাথা হেঁট করিয়া বসিল। ঘরে আলো দেখিয়া যদি সে একবার আসিয়া প্রশ্ন করে—এখনো পড়া শেষ হয় নাই? কিম্বা অসাবধানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বলিয়া যদি একবার ছোঁয়!

মিলি একমনে ঘড়ির কাঁটার শব্দ অনুধাবন করিতে লাগিল।

কিন্তু মানব হয়তো জানিত আজ রাত্রে মিলির ঘুম না আসিবারই কথা।

১২

অনেক দিন সুধীরের দেখা নাই, তাই মানব তাহার খোঁজ নিতে বাহির হইয়াছে।

ক্রিক রো পার হইতেই টিপি-টিপি বৃষ্টি শুরু হইল এবং শাঁখারিটোলা লেইনে ঢুকিতে-না-ঢুকিতেই মুষলধারে। এই গলিরই গা হইতে অপরিসর সংকীর্ণ একফালি রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে—তাহারই শেষ প্রান্তে সুধীরদের বাড়ি—টিনের চাল ও মাটির দেয়াল।

মানব সজোরে দরজায় আঘাত করিতে লাগিল।

ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের সাড়া আসিল : আরেক ধাক্কা দিলেই কষ্ট করে দরজা আর আমাকে খুলতে হবে না। বৃষ্টিতে কে-ই বা তোমাকে বেরুতে বলেছিলো শুনি ? দরজা খুলিতেই মানব অপ্রস্তুত হইবার ভান করিয়া কহিল—এই যে আশা। সুধীর বুঝি বাড়ি নেই ?

আশা সংকুচিত হইয়া কহিল—না। আসুন।

ভিতরে একখানা মাত্র ঘর—এককোণে একটা তক্তপোষ পাতা। তক্তপোষেরই উপরেই কেরোসিন কাঠের একটা সেল্‌ফ, তাহাতে বই, চায়ের বাসন ও দাবার কতগুলি ঘুঁটি ছত্রখান হইয়া আছে। ছেঁড়া ময়লা বিছানাটা একপাশে তুলিয়া রাখিতেই তাহার দীনতা আরো বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। নিচে মাদুর বিছাইয়া সুধীরের বৃদ্ধা মা একটা কাঁসার বাটিতে করিয়া মুড়ির সঙ্গে মুলো কামড়াইয়া খাইতেছেন—আর আশা হয় তো ঐ কাঁথাটাই সেলাই করিতেছিল।

সেই অর্ধ-অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে মানব একটা রূঢ় অট্টহাসের মতো আবির্ভূত

হইল। চোখ মেলিয়া ঘরের এই নিদারুণ কদর্যতা দেখিয়া তাহার সমস্ত স্নায়ু-শিরা কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিল—বাহিরে যে প্রচুরপ্রবাহে বৃষ্টি হইতেছে সে-কথাও তাহার মনে রহিল না। কিছু টাকা ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেই হয়। সঙ্গে চেক্-বইটা সে লইয়া আসিয়াছে।

মানবকে দেখিয়া সুধীরের মা অভিভূতের মতো মুলোটা দাঁত দিয়া কামড়াইয়া রহিলেন: কথা কহিল আশা:

—একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি, বসুন। একটা তোয়ালে এনে দি।

মানব দাঁড়াইয়াই রহিল: না, বসবো না। সুধীরের সঙ্গে একটা কথা ছিলো। কোথায় গেছে?

আশা কহিল—কাজ তাঁর চব্বিশঘণ্টা, অথচ একটা কাজ আজ পর্যন্ত তাঁকে পেতে দেখলুম না। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না। এই তক্তপোষে বসতে বুঝি আপনার ঘেন্না হচ্ছে?

মা-ও এইবারে সায় দিলেন: বোস বাবা। গরিবের ঘরে তোমার যোগ্য অভ্যর্থনা কী করে করবো বলো? সেই তোর উলের আসনখানা বের করে পেতে দে না, আশা। এই জলে কোথায় আবার বেরুবে? (নিম্নস্বরে) তোমার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিলো।

নিতান্ত সংকুচিত হইয়া তক্তপোষের একধারে মানব বসিল। একটা কুৎসিত আবহাওয়ার মাঝে পড়িয়া সে যেন নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। এইবার আবার তাহাকে এক সবিস্তার দুঃখের কাহিনী গিলিতে হইবে। চলিয়া যাইতেই বা তাহার পা উঠিতেছে না কেন?

কারণ খুঁজিতে গিয়া আশার দিকে চাহিতেই দেখিল, সে হাতে করিয়া একখানা তোয়ালে নিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—যদি বসলেন-ই, তবে ভিজে মাথাটা মুছে ফেলুন।

—না, দরকার নেই। বলিয়া মানব পকেট হইতে প্রকাণ্ড একটা গরদের রুমাল বাহির করিয়া প্রথমে কপাল ও পরে ঘাড়ের খানিকটা মুছিল।

চুলে হাত ঠেকাইল না। রুমালটা বিস্তৃত করিতেই একটা সতেজ, প্রগল্‌ভ গন্ধ ঘরের কুণ্ঠিত স্তব্ধতাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

আশা কহিল—তোয়ালেটা কিন্তু ফর্সাই ছিলো। আজ সকালে কেচেছিলাম।

বিদ্রূপের খোঁচায় মানবের চোখ ফুটিল। আশাকে সে ইহার আগে আরো অনেকবার দেখিয়াছে—নিতান্ত মামুলি দু-একটা আলাপও যে না হইয়াছে তাহা নয়, তবু এমন মুখোমুখি হইয়া কোনোদিন সে দেখে নাই। ময়লা সেমিজের উপর ততোধিক ময়লা একখানি শাড়ি পরিয়া আছে—সজ্জা-উপকরণ গাত্রবর্ণের সঙ্গে চমৎকার সামঞ্জস্য রাখিয়াছে বটে—চুলগুলি রুক্ষ, রিক্ত হাতে ও সকরুণ ধৈর্যশীল মুখে অবিচল একটি কাঠিন্য। তাহাতে আকৃষ্ট হইবার মতো কোনো সঙ্কেতই মানব খুঁজিয়া পাইল না। যুবতী সে নিশ্চয়ই, কিন্তু যৌবন অর্থ তো শুধু ষোলোটি বৎসরের ভারে আক্রান্ত হওয়া নয়; যৌবন অর্থ সেই লীলা বা ছটা, যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঊর্মিচূড়ায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে—যৌবন অর্থ লাবণ্যের চঞ্চল নির্ঝরলেখা! না গতিচাপল্যে উজ্জীবিত, না লীলাবিভ্রমে কৌতুক-ময়ী—সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া একটি গাঢ় সহিষ্ণুতা—মানব তাহাতে উন্মাদনা পাইবে কেন?

আশার উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া মানব সুধীরের মাকে প্রশ্ন করিল—কী কথা ছিলো বলুন। আমার বেশি সময় নেই। বলিয়া মানব উঠিয়া দাঁড়াইল—মাটির দেয়াল হইতে কেমন একটা চাপা অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ তাহার নিশ্বাস চাপিয়া ধরিতেছে।

আশা কথা না কহিয়া পারিল না: এই বৃষ্টিতে বেরুলে আপনার দামি চাদরখানা একেবারে কাঁথা হয়ে যাবে।

মানব উদাসীনের মতো কহিল—একখানা চাদর নষ্ট হলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না।

আশা সামান্য একটু হাসিয়া কহিল—কিন্তু চলে গেলে মা'র বোধকরি একটু অসুবিধে হবে।

—সেই জন্যেই তো খবরটা জেনে যেতে চাইছি।

মা মেয়েকে ধমক দিয়া উঠিলেন: তুই যা দিকি, বাসনগুলো মেজে ফেল এবার।

আশা যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে: উলের আসনখানা বের করে দিয়ে যাই। ঐ শুকনো কাঠে বসতে ওঁর অসুবিধে হচ্ছে।

অগত্যা মানবকে আবার শুকনো কাঠেই বসিতে হইল।

সামনের নিচু দাওয়ায় আশা এক-পাঁজা এটো বাসন লইয়া বসিয়া বাঁ হাতে কাক তাড়াইতে লাগিল। মাথার উপর একটা ভিজা গামছা চাপাইয়া সে অনর্থক বৃষ্টির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে চায়—দেখিতে-দেখিতে সর্বাঙ্গ সিক্ত হইয়া উঠিল—খোলা জানালা দিয়া হঠাৎ একটু নজর পড়িতেই মানবের কেমন যেন মনে হইল এই অযাচিত বর্ষার শ্যামশ্রীর সঙ্গে আশার এই কমনীয়তাটুকু না মিশিলে কোথায় বোধহয় অসঙ্গতি থাকিত।

মা কথাটা কিছুতেই পাড়িতে পারেন না।

মা'র কথার লক্ষ্য কি মানব তাহা জানিত। তাই সে উসকাইয়া দিল: সুধীরের সেই টিউশানিটা বুঝি গেছে? আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলো—কতো তার চাই?

মা'র রুদ্ধস্বর এইবারে অনর্গল হইয়া উঠিল: চাকরিটা গেছে তো সেই কবে। তারপর একটা কুটোও জোগাড় করতে পারে নি। কিন্তু তা তো নয়। তার চেয়েও বড়ো বিপদে পড়েছি, বাবা।

মানব প্রস্তুত। ঘরের বাইরে বাসন-মাজার আওয়াজও যেন ক্ষীণতর হইয়া আসিল।

মানবের মুখে সহানুভূতির আভাস পাইয়া মা বলিয়া চলিলেন—

মেয়েও আমার গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আগুনের মতো হু-হু করে বয়েস বেড়ে গেল—মাথার উপরে কেউ নেই যে একটা পাত্র জুটিয়ে দেয়। তা সুধীরই আজ ছ'মাস ধরে হাঁটাহাঁটি করে একটি সম্বন্ধ যোগাড় করেছে। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার দুঃসাহস তো আর আমাদের মানবে না, বাবা—অদেষ্ট যেমন করে এসেছি তেমনি তো হবে।

মানবের সামান্য একটু কৌতূহল হইল : ছেলেটি কি করে ?

—শ্যামপুকুরে নাকি মনিহারি দোকান আছে। দোকান শুনছি ভালোই চলছে। তবে ছেলেটির বয়স কিছু বেশি—প্রথম স্ত্রী এই বৈশাখে মারা গেছে। ছেলেপুলে হয়নি—এমন মন্দ কি বলো ?

মানব মুক্তকণ্ঠে সায় দিল : না, মন্দ কি ! তা, ছেলের পছন্দ হয়েছে তো ? কথাটা আশাকে শুনাইয়া বলে মানবের ইচ্ছা ছিলো না ; তবু হঠাৎ বাসন-মাজার শব্দ একেবারে বন্ধ হইয়া গেলো দেখিয়া সে ঠিক স্বস্তি বোধ করিল না।

—হ্যাঁ বাবা, ছেলে নিজে এসেই দেখে গেছে। যতোক্ষণ সে দেখছিল ততোক্ষণ দম বন্ধ করে ইষ্টমন্ত্র জপ করেছি—এই যাত্রায় মেয়ে যেন আমার পাশ করে। আর-আর যে-কয়জন এর আগে মেয়ে দেখতে এসেছিল, তারা কেউ ঘর-দোরের হাল-চাল দেখে কেউ বা মেয়ের রঙ ময়লা দেখে নাক সিঁটকে চলে গেছে। কিন্তু নেহাৎ কপালজোরেই বলতে হবে যে মেয়েকে আমার তার চোখে ধরলো। পাত্র এর চেয়ে ভালো আর আশা করতে পারি ?

মানব রুমাল দিয়া গলা ও গাল রগড়াইতে রগড়াইতে কহিল—না, দিব্যি পাত্র। দোকান-পাট আছে, স্ত্রীকে ভরণপোষণ করবার জন্যে কারু কাছে হাত পাততে হবে না—পায়ে-দাঁড়ানো ছেলে, কলেজের ছোকরাদের চেয়ে ঢের ভালো। আর দেরি নয়, লাগিয়ে দিন তাহলে। এই দুর্দিনে

কোথায় কে ফ্যা-ফ্যা করতো, তার চেয়ে করে-কম্মে স্বচ্ছন্দে সংসার চালিয়ে নিতে পারবে।

কথাটা আশাকে মর্মমূল পর্যন্ত বিঁধিল।

বসা অবস্থাতেই মা প্রায় মানবের পায়ের কাছে আগাইয়া আসিলেন; স্বর নামাইয়া কহিলেন—কিন্তু বিপদ জুটেছে অন্যদিক থেকে। ছেলে পাঁচশো টাকা পণ না পেলে কিছুতেই বিয়ে করবে না। সাধ্যসাধনা করতে সুধীর আর কিছু বাকি রাখেনি বাবা, কিন্তু বড়ো জোর সে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ছাড়তে পারে বলে শেষ কথা দিয়েছে—

ঢোক গিলিয়া মা আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন মানব নির্লিপ্তের মতো কহিল—তা পণ তো সে চাইবেই।

কথাটা মানব সমাজতত্ত্বের একটা স্বতঃসিদ্ধ সূত্র ধরিয়াই বলিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া এই কথা শুনিয়া আশার মুখ-চোখ নিদারুণ অপমানে জ্বালা করিয়া উঠিল। সে ভাবিল মানব বুঝি তাহারই রূপহীনতার প্রতি কঠিন শ্লেষ করিয়া এমন নিষ্ঠুর কথা উচ্চারণ করিয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, মানবের তাহাতে কিছু যায় আসে না। এই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে যতোদিন পর্যন্ত নর-নারী স্বেচ্ছায় ও আত্মপ্রেরণায় না মিলিত হইবে ততোদিন এই পণপ্রথাকে কিছুতেই দূর করা যাইবে না। একমাত্র প্রেমই পণ্য নয়।

মা'র পাংশুমুখের রুক্ষ রেখাগুলি একটু কোমল হইয়া আসিল। তিনি কহিলেন—অতো টাকা কোথা থেকে দিই বলো? টাকার জন্যেই তো দিন পিছিয়ে যাচ্ছে!

এতোটুকু দ্বিধা নাই, না বা এতোটুকু লজ্জা—মানব উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—সুধীর আমাকে এতোদিন এ-কথা বলেনি কেন? কতো আগেই তাহলে আমি দিয়ে দিতে পারতাম। পাত্র হাতে এসে পড়লে কি আর ছেড়ে দিতে আছে? ওদের সময় দিতে গেলেই তখন আবার ওরা

নানান রকম খুঁৎ বার করে বসবে। তা, কতো টাকা আপনাদের এখন চাই?

আহ্লাদে মা'র সারা দেহ যেন কেমন করিয়া উঠিল; এই ঘর-দুয়ার বিছানা-বালিশ কিছুই যেন আর তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে রহিল না। নিষ্পলক চোখে মানবের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন—সব শুদ্ধু ছশো টাকা তো লাগবেই, বাবা। তুমিই কি সব দিতে পারবে?

মানব চাপা ঠোঁটে সামান্য একটু হাসিয়া কহিল—কেন পারবো না? ছশো টাকা তো মাত্র টাকা! হাতে যখন আছেই তখন পরের একটা উপকারেই না হয় ব্যয় করে যাই। কী যায় আসে।

এ কী দয়া না উপেক্ষা, উপকার না ঔদ্ধত্য—বাহিরে দাঁড়াইয়া আশা থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল মা একেবারে মানবের পায়ের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়াছেন, আর মানব পকেট হইতে ব্যাঙ্কের চেক বই বাহির করিয়া মোটা ফাউণ্টেনপেনএ তাহাতে দস্তখৎ করিতেছে।

আশা ভিজা-গায়েই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সৌজন্যলেশহীন রুক্ষস্বরে কহিল—আপনার বৃষ্টি যে কখন থেমে গেছে তার বুঝি খেয়াল নেই? এই বিচ্ছিরি নোংরা ঘরে বসে অনর্থক সময় নষ্ট করছেন কেন? একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে আনবো?

সই-র একটা টান দিবার মুখে মানব থামিয়া পড়িল।

আশার এই মূর্তি দেখিয়া মা-ও ভড়কাইয়া গেলেন। চুল ঝুটি করিয়া বাঁধা, ভিজা গামছাটা কোমরে আঁট করিয়া জড়ানো—চোখে যেন তাঁহার ধাঁধা লাগিয়া গেলো, একবার মনে হইল সামান্য দোকানির দোকান আলো না করিয়া কোনো হাকিমের পার্শ্ববর্তিনী হইয়া একত্র মোটর হাঁকাইলে নিতান্ত বেমানান হইত না।

তবু মেয়েকে তাঁহার শাসন করিতে হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—

তুই কেন তোর কাজ ফেলে এখানে কর্তৃত্ব করতে এলি? যা, কাপড়টা ছেড়ে আয় শিগগির করে।

আশা তবু নড়িল না। কথায় প্যাঁচ দিয়া কহিল—সময়ের দামও তো ওঁর কম নয়—

মানব হাসিয়া কহিল—কিন্তু এই মিনিটটির দাম ছশো টাকা। তোমাকে পার করার মাশুল দিয়ে যাচ্ছি।

আশা সহসা জ্বলিয়া উঠিল। কান দুইটা লাল করিয়া কহিল—কি?

মা কহিলেন—কী আবার? তোর এতে মাথা গলাবার কী হয়েছে? তুই যা না এখান থেকে।

আশা মাকে নিষ্ঠুর দৃষ্টির আঘাত করিল; এক পা আগাইয়া আসিয়া কহিল—তুমি বুঝি আবার এঁর কাছ থেকে ভিক্ষা চাইছ? এমনি করে কি তুমি দাদার সমস্ত প্রচেষ্টার মহত্ত্বকে খর্ব করবে নাকি?

মা কহিলেন—তুমি ওর কথায় কান দিয়ো না, মানু। লেখাটুকু শেষ করে ফেলো।

মানব আবার কলম তুলিল।

মানবের দিকে ফিরিয়া আশা প্রশ্ন করিল—কী আপনার স্পর্ধা যে এমনি করে সবাইকেআপনি অপমান করতে সাহস পান? আমরা গরিব হয়েছি বলেই কি আপনার এই অত্যাচার সইতে হবে নাকি?

মা কাতরকণ্ঠে শোক করিতে লাগিলেন—তুই একে অত্যাচার বলিস নাকি হতভাগী? তুমি ওর কথায় কিছু মনে কোরো না বাবা, দুঃখে-তাপে মাথা-মুণ্ডু কিছু আর ওর ঠিক নেই। তুমি ঐটুকুন লিখে ফেলো। মানব সই করিয়া চেকটা নিতান্ত অবহেলায় আশারই দিকে ছুঁড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—দিন-ক্ষণ এবার ঠিক করে ফেলুন। গয়না যা দু-একখানা লাগবে মাকে বলে আমিই পরে দিয়ে দিতে পারবো।

আশা মেঝে থেকে চেকটা কুড়াইয়া লইয়া গম্ভীর হইয়া কহিল—কিন্তু

আপনার এই দানের মর্যাদা আমরা রাখতে পারলাম না। দয়া করে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

মা কথা ঘুরাইলেন—সুধীর তোমাকে রাত্রে বাড়িতে গিয়ে পাবে তো? এতোক্ষণে ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

পাবে। মানব দরজার কাছে পৌছিবার আগেই আশা পথ আটকাইয়াছে। মানব কহিল—সরো।

—আপনার এই চেক আপনি ফিরিয়ে নিন।

—এ কি তোমার আদেশ নাকি?

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু এ-চেক তো আমি তোমাকে দিইনি। পড়তে জানো? দেখ তো কার নাম।

—কিন্তু আমাকে উদ্দেশ করেই তো দিয়েছেন। আমি বেঁচে থাকতে এ-অপমান আমি নিতে পারবো না। নিন ফিরিয়ে!

মা এইবার মেয়ের প্রতি রুখিয়া আসিলেন—তুই এ-সবের কী বুঝিস লো হতভাগী? ছাড় দরজা। দিন-দিন যতোই ধিঙ্গি হচ্ছে ততোই ওর বুদ্ধি খুলছে। তুমি ওর কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না, মানু।

মানব মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসিল—না, না, সে আবার একটা কথা! বিয়ের কথা শুনে সবাইরই একটু বুদ্ধি ঘুলোয়।

মা ফের ধমক দিলেন—সরে দাঁড়া বলছি।

আশা তবু অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। অত্যন্ত নম্র ও ধীর স্বরে কহিল—আপনি যান, কিন্তু এই চেক আমি ছিঁড়ে ফেলবো।

মা উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন: ছিঁড়ে ফেলবি কি? তবে বিয়ে না করে আমাদের মুখ পোড়াবি নাকি?

আশা কহিল—তার জন্যে একজনের অসংযত ও উদ্ধত দান আমি গ্রহণ করতে পারবো না, মা।

অমন দৃঢ় সতেজ ও সহজ কণ্ঠে মেয়ে তাঁহার কথা কহিতে পারে মা স্বপ্নমনেও কখনো তাহা চিন্তা করেননাই ; মানবও অবাক হইয়া গেলো। এমন যাহার তেজ সে কিনা অপ্রতিবাদে যাহার-তাহার সঙ্গেই আঁচলের গিঁট বাঁধিয়া বনবাসে বাহির হইয়া পড়িবে।

তাই সে টিপ্পনি কাটিয়া কহিল—কিন্তু চেকটা যদি ছিঁড়ে ফেলো তাহলে এ-যাত্রায় আদর্শ পতিব্রতা হবার সুযোগ আর মিলবে না দেখছি।

—সে-সুযোগ আপনার টাকা দিয়ে কিনতে চাই না।

—কিন্তু এই টাকারই জন্যে তো সেই সুযোগ এতোদিন পিছিয়ে ছিলো।

—তাহলে তা চিরদিনের জন্যেই পিছিয়ে থাক বলিয়া আশা সহসা ক্ষিপ্তের মতো সেই কাগজের ফালিটা টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

আর এক মুহূর্তও সে সেখানে দাঁড়াইল না।

শুধু চলিয়া যাইবার সময় তাহার পিঠের উপর চুলের স্তূপ ভাঙিয়া কীর্ণ-বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেই তাহাকে নিমেষে একটা অপস্রিয়মানা ঝটিকার মতো মনে হইল। অন্ধকারের সে-দীপ্তি মানবের দুই চক্ষু ঝলসাইয়া দিল।

মা খানিকক্ষণ অভিভূতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং অবশেষে মানবকেও চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেই পরিত্যক্ত কাঁসার বাটিটা তুলিয়া লইয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিলেন।

১৩

হরীতকীবাগান লেইনএ মেয়েদের যে হসটেল ছিলো মিলি সেখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। পরিয়াছে আগুনের মতো লাল সিল্কের শাড়ি—তাহার গায়ের শ্যামল রঙের সঙ্গে একটা অনির্বচনীয় ছন্দ লাভ করিয়াছে—যেন অপরাহ্নে একটি বিষণ্ণ ও ক্ষীণাঙ্গী নদীর জলে সূর্যাস্ত হইতেছে। মোনা লিসার হাসির মতো দুইটি রঙের এই অতীন্দ্রিয় সৌহার্দটুকু যদি কেহ তুলিকায় ধরিয়া রাখিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে অন্নসংস্থান করিতে আর দ্বিতীয় ছবি আঁকিতে হইত না।

ভিজিটার্স রুম পার হইতেই প্রথমে মিলির সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হইল যে শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে মানবের প্রথম কল্পনায় সহজেই মিলি হইতে পারিত। নাম তাহার শোভনা। হসটেলের ছাত্রীদের সেই এক রকম কর্ত্রী—ধোপাবাড়িতে শাড়ি-সেমিজ পাঠাইবার তদারক করিতেছে।

বিধুর গোধূলিবেলায় একটি দীর্ঘ রশ্মিরেখার মতো মিলির আবির্ভাবে সমস্ত বাড়ি-ঘর-দোর সহসা ঝলমল করিয়া উঠিল।

তাহার দিকে চাহিয়া শোভনা বলিল—ঘরে হঠাৎ আগুন লাগলো কোত্থেকে?

ধরিত্রী বলিল—ঘরে কোথায়, দেখছিস না ওর শরীরে।

নির্ধূম অগ্নিশিখার মতো মিলির দেহ কাঁপিয়া উঠিল। নীচে যতোগুলি মেয়ে ছিলো তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া মিলি উপরে উঠিয়া আসিল; ধরিত্রীর হাত ধরিয়া কহিল—সত্যিই ভাই, শরীরে আগুন লেগেছে।

মিলি এই বোর্ডিঙবাসিনীদের থেকে ভিন্ন কলেজে পড়িত, তাই তাহার সম্বন্ধে সামান্য কানাঘুষা ছাড়া তেমন কোনো মারাত্মক খবর তাহারা পায় নাই। তেমন কানাঘুষা কোন কৈশোরোত্তীর্ণা বোর্ডিঙ-বাসিনীর সম্বন্ধে না শুনা গিয়াছে! পুরুষের সংস্পর্শ-রূপ অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা এড়াইয়া একে-একে এতোগুলি বৎসর অতিক্রম করাই তো অস্বাভিক। কিন্তু সেই সংস্পর্শে যে শরীরে আগুন জাগিয়া উঠিবে ও সেই রোমাঞ্চময় দহনানুভূতি যে সমস্ত জীবনে সঞ্চারিত, পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে তাহারই চমৎকার অভিজ্ঞতা কয়টা মেয়ে লাভ করিয়াছে শুনি?

তাই মিলির এই একটি সামান্য কথার শ্লক পাইয়া সমস্ত মেয়ের মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। এক নিমেষেই তাহারা বুঝিল এ ঠিক স্লিপার বা ব্লাউজের প্যাটার্ণের মতো প্রেমের ফ্যাশান নয়—এ নিতান্ত একটা সমুচ্ছ্বসিত আনন্দের বুদ্বুদ।

সবাই মিলিকে ছাঁকিয়া ধরিল। মিলির মনের কাছাকাছি হইবার আশায় উষা কহিল—কে এই আগুন লাগালো?

—তোরা সবাই তাকে দেখেছিস।

—আমরা দেখেছি? এমন ভাগ্যবান কে? কোথায়?

—শেয়ালদা স্টেশনে—সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ভোরবেলায়। ঢাকা মেইল যখন ইন্ করলো। সূর্য ওঠবার আগে। মানে আকাশে আর আমার মনে একসঙ্গে যখন সূর্য উঠলো।

ধরিত্রী চিনিয়াছে, বুলা চিনিয়াছে, শোভনাও নিচে থেকে আসিয়া চিনিবে।

আরো একটি মেয়ে হয়তো চিনিল—নাম অণিমা—সাঁওতালি ঝুমকোর ঝালরগুলি গালের আধখানায় আসিয়া টিক টিক করিতেছে—কহিল—ও! সেই গুণ্ডাটা?

এক পশলা হাসির শিলাবৃষ্টি হইয়া গেলো।

মিলি কহিল—তোমরা এখন হাস বা তার পর কাঁদ, আমাকে খাওয়াও শিগগির।

শোভনা পিছন-মোড়া নাগরাটাকে চটি-জুতায় রূপান্তরিত করিয়াছে, দুই পায়ে তাহাই ফট-ফট করিতে-করিতে উপরে উঠিয়া আসিল।

—শোভা-দি, খাওয়াও আমাকে।

ঊষা কহিল—ও প্রেমে পড়েছে শোভা-দি, অতএব কিছুকাল ও হাওয়া আর হাবুডুবু খাচ্ছে। এর পর কিছু ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে ওকে ছেড়ে দাও।

শোভনা বয়সে একটু ভারি বলিয়া সবাই তাহাকে একটু সমিহ করিয়া চলে। সে দুই হাতে ভিড় সরাইয়া দিয়া কহিল—কী তোরা ফাজলামো করছিস। (মিলির হাত ধরিয়া) আয় মঞ্জু, আমার ঘরে।

দল বাঁধিয়া সবাই আবার শোভনার ঘর আক্রমণ করিল। নিচু তক্তপোশে, টেবিলের উপর থেকে বই সরাইয়া, ট্রাঙ্ক-সুটকেসের উপর যে যেখানে পারিল বসিয়া পড়িল। ধোপাকে কাল আসিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শোভনা মিলির বাঁ হাতখানি নিজের কোলের উপর প্রসারিত করিয়া কহিল—কলেজ ছুটি হচ্ছে কবে? এখানেই থাকবি, না—

ধরিত্রী দুই হাঁটুর উপর কনুয়ের ভর রাখিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল, সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল: এ-সব বাজে কথা কী জিগগেস করছ, শোভা-দি? বলো, কবে ও পিঁড়িতে চড়ে মূর্তিমানের চারপাশে সাত-পাক ঘুরবে?

শোভনা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—এতো দূর গড়িয়েছে নাকি?

শোভনা সেই জাতের মেয়ে যার মাত্র পালিশই আছে, ধার নাই—আঙুলের নখ থেকে ললাট-ফলক পর্যন্ত পাৎলা আয়নার মতো ঝক ঝক করিতেছে; তার গাম্ভীর্যটা মেকি—জীবনে কোনোদিন ভাবাকুল

হইতে পারে নাই বলিয়াই তাহার এই সারশূন্য কঠিনতা। সে নিজেকে সবার থেকে যে একটু দূরে সরাইয়া রাখে সে তার মিথ্যা প্রাধান্যবোধের দোষে। তার ভাবখানা এই : সে ভাবের স্রোতে পড়িয়াও শোলার মতো ভাসে, অন্ধের মতো আচ্ছন্ন হয় না। অর্থাৎ দেহের সবল স্বাস্থ্যে ও প্রাণের সতেজ প্রাচুর্যে নিজেকে ও বিকীর্ণ করিতে পারে না বলিয়াই বয়োধর্মের এই স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের প্রতি উহার কপট বিতৃষ্ণা আছে। ইহাই এক ধরনের অস্বাস্থ্য, এবং এমন অসুস্থ মেয়ের সংখ্যা দিন-দিন বাড়িতেছে। মিলি কথা না কহিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতেছে দেখিয়া শোভনা কিঞ্চিৎ শাসনের সুরে কহিল—সত্যিই এতো দূর গড়িয়েছিস নাকি?

মিলি পা দুইটা ঈষৎ দুলাইতে-দুলাইতে কহিল—আমরা তো আর 'বিবাহের চেয়ে বড়ো'-তে বিশ্বাস করি না। খালি বাবার একটা ফর্ম্যাল্ মতের অপেক্ষা করছি। খবরটা নিজে গা করে দিতে এলাম।

শোভনার মুখ-চোখের এমন একটা ভয়াবহ অবস্থা হইল যেন কি একটা সর্বনাশের খবর শুনিয়াছে। এখনো কি মিলিকে রক্ষা করা যায় না?

অণিমা সামনে সরিয়া আসিয়া কহিল—একেবারে শেষ কথা দিয়ে ফেলেছিস?

মিলি হাসিয়া বলিল—ব্যাকরণ ঠিক করে শুদ্ধ ভাষায় এতে আবার কোনো কথা দিতে হয় নাকি?

ঊষা টিপ্পনি কাটিয়া বলিল—এ-ক্ষেত্রে মুখই একমাত্র নীরব, অথচ শরীরের সমস্ত স্নায়ু-শিরা মুখর হয়ে ওঠে।

শোভনা মুখের উপর সেই কৃত্রিম গাম্ভীর্যের পরদা টানিয়া কহিল—কথা দিলেই বা কি! ফিরিয়ে নিতে কতোক্ষণ!

মিলি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তলাইয়া বুঝিবার সময় তাহার নাই। সে চঞ্চল হইয়া কহিল—এখুনি আবার হয়তো রাস্তায় আমার জন্যে হর্ন বেজে উঠবে। কিছু জিনিসপত্র কিনতে

হবে তারপর। বাবার মত নিতে কালই আমরা চিটাগং মেইলে বেরিয়ে পড়বো!

—কাল-ই? বাবা যে তোর মত দেবেন তুই ঠিক জানিস?

মিলি মুখ টিপিয়া হাসিল: বাবার অমত করবার কিছুই নেই। আমি তো আর অপাত্র খুঁজিনি। আর যদি মত না-ই দেন, সেই তবে আমাদের বাধা। কোনো বাধার বিরুদ্ধে লড়তে না পারলে 'জেষ্ট' থাকে না।

অণিমা এক পাশে এতোক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে নাকটা ঈষৎ একটু কুঞ্চিত করিয়া কহিল—না, অপাত্র আর কিসে! দু' হাতে টাকা উড়োয়—শুনছি নাকি শিগগিরই বিলেত যাবে—

কথার বন্যায় অণিমার নিশ্বাস রোধ করিয়া মিলি একেবারে উথলিয়া উঠিল: এবার আর ওঁর একা বেরুনো হচ্ছে না। আমিও সঙ্গে থাকবো। আর আমিও সঙ্গে থাকবো বলেই নীল সমুদ্র অতো উত্তাল হয়ে উঠতে পারবে। ভেনিসে গিয়ে বাসা বেঁধে থাকবো—সেই তো আমাদের আইডিয়া। চাষ করবো দুজনে।

শোভনার শুকনো ঠোঁটে নিরাভ একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। হাসির অর্থখানা এই: হে বিধাতা, স্বপ্নবিলাসিনীকে ক্ষমা করিয়ো। নির্বোধ বালিকা জানিতেছে না যে ও কি করিতেছে।

অণিমার কথা তখনো শেষ হয় নাই: কিন্তু চরিত্রখানা কি—

প্রেমের ব্যাপারে চরিত্র লইয়া আলোচনাটা অবিবাহিতা মেয়েদের কাছে অত্যন্ত মুখরোচক।

শোভনা আচার্যার মতো মাথা নাড়িয়া কহিল—না, না, সে-কথা কেন?

—সে-কথা নয়ই বা কেন, শোভা-দি? অণিমাও অপগতমোহ বিংশ-শতাব্দীর মেয়ে—প্রেমে অবিশ্বাসী হওয়াই তার ফ্যাশান: এখনো মঞ্জুকে সাবধান করে দেবার সময় আছে।

মিলি খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল: আমাকে সাবধান করবে কি অণু-দি? আমি কি আর ফিরবো ভেবেছ? একেবারে ভেনিসে—

অণিমার নাসাকুঞ্চন অধরে ও চিবুকে সংক্রামিত হইল: আঁস্তাকুড়ে। পুরুষমানুষকে তো জানিস না। দুদিন নেড়ে-চেড়ে নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন মুখ দেখাবি কাকে? মোটর-বাইকের পেছনে বসে হাওয়া খাচ্ছিস, ভাবছিস একেবারে উড়ে গেলাম! কয়েকদিন উড়ে পরে দেখবি নিশ্বাসের জন্যে হাওয়া গেছে ফুরিয়ে।

মিলি হাসিয়া কহিল—তখনকার কথা তখন। যাক, ঐ হর্ন বাজলো। আমি চললাম, শোভা-দি।

হর্ন কোথায় একটা বাজিল বটে, কিন্তু গাড়ি কোনো দুয়ারে দাঁড়াইল না।

ফের ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—পুরুষের নামে অকারণ দুর্নাম করা-ই তোমার ব্যবসা, অণু-দি। দয়া করে চুপ করো, এ-সব কথা আমি শুনতে চাই নে।

শোভনা সেই ঘোলাটে মুখে—মিলির শাড়ির আঁচলটা পাট করিতে করিতে কহিল—চটিস নে। তোর ভালোর জন্যে বলছে। ও-ছেলের বাজারে খুব নাম-ডাক নেই। শেষকালে তোকে নিয়ে একটা কাণ্ড হোক এ আমরা সইতে পারবো না। পুরুষমাত্রেই নিতান্ত 'শ্যালো'—তাই দুদিন রঙিন ফানুস উড়িয়েই নেয় ছুটি। ফানুস যায় ফেটে, চুপসে।

রেলিঙ ধরিয়া নিচে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মিলি কহিল—যাক, কিন্তু এখনো আসছে না কি রকম!

অণিমা টিপ্পনি কাটিয়া কহিল—আর আসে কি না ছাখ।

—কিন্তু আমিও তো যেতে পারি। বলিয়া মিলি সত্য-সত্যই চলিবার জন্য পা বাড়াইল।

শোভনা কহিল—দাঁড়া। ঠাট্টা নয়, মিলি। তোর ভালোর জন্যেই

বলছিলাম। একেবারে তলিয়ে না গিয়ে চোখ তুলে চারদিক একবার চেয়ে দেখিস।

মিলি গভীর স্বরে কহিল—বিচার-বিশ্লেষণ করে ভালোবাসতে পারি না। সম্পূর্ণ মানুষকেই যখন গ্রহণ করবো, তখন তার সমস্ত অসম্পূর্ণতাও স্বীকার করে নেব বই কি। তলিয়ে যেতেই আমি চাই—নিঃশেষে নিমগ্ন না হতে পারলে আমার স্বস্তি নেই।

—একেবারে কি ঠিক করে ফেলেছিস?

গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া মিলি বলিল—সম্পূর্ণ।

—কিন্তু মানব যদি এখন তোকে প্রত্যাখ্যান করে?

অণিমার চোখে-মুখে এক হিংস্র দীপ্তি ভাসিয়া উঠিল। সেই দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ করিতে মিলি কহিল—সে স্বাধীনতা তার নিশ্চয় আছে, কিন্তু সাধ্য হয়তো নেই। তবু যদি সে প্রত্যাখ্যান করে, করবে—আমি তবু মিথ্যা সন্দেহে বা অবিশ্বাসে এই উন্মাদনাকে ম্লান করে দেব না, শোভা-দি। তেমন ব্যর্থতা আমাদের জীবনের ঐশ্বর্য। ব্যর্থ হবার মাঝেও একটা গভীর আনন্দ আছে।

শোভনার ঠোঁটের কিনারে আবার সেই কৃষ্ণপক্ষের ডুবন্ত চাঁদের হাসি ভাসিয়া উঠিল, যাহার অর্থ: হে বিধাতা, এই অবোধ অনভিজ্ঞ শিশুকে দয়া করিয়া আঘাত করিয়ো না। মুখ ভারি করিয়া কহিল, কিন্তু তোর বাবাই যেন এ বিয়েতে বাধা দেন—

—তাই আশীর্বাদ করো, শোভা-দি। কঠিন বাধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেন প্রেমকে আরো সহিষ্ণু ও সবল করে তুলতে পারি। যুদ্ধে যদি হেরেও যাই, তবু সে-পরাজয়কে আমি ক্ষুণ্ণ করবো না দেখো।

অণিমার অস্ত্র তখনো ফুরায় নাই। সে কণ্ঠস্বরটাকে বিকৃত করিয়া কহিল—দেখিস শেষকালে সূর্পণখা সেজে বসিস নে।

মিলি স্বচ্ছ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া কহিল—তবু যুদ্ধ করবার

রোমাঞ্চ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবো না। নিশ্চিন্ত সর্বনাশ জেনেও—যখন একবার পাখা মেলেছি—ঝাঁপিয়ে আমি পড়বোই।

আর কি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা যায় শোভনা হয়তো তাহাই ভাবিতেছিল, এমন সময় একথালা মিষ্টি লইয়া উষা আসিয়া হাজির।

—আয় শিগগির মিলি, আমাদের ঘরে। কিছু মিষ্টিমুখ করে যা পোড়ারমুখি।

এই বিশ্রী আবহাওয়া থেকে ছাড়া পাইয়া মিলি বাঁচিল। অণু আর শোভনা নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এখন আর কোনো কথা নাই; বিমর্ষমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া কোনো কথা আর থাকিতেও পারে না। কে কাহাকে অন্ধকারে একা ফেলিয়া আগে অন্তর্ধান করিবে মনে-মনে দুইজনে বোধকরি তাহাই ভাবিতেছে।

হিড়-হিড় করিয়া মিলিকে ঘরে টানিয়া আনিয়া বিছানায় বসাইয়া দিয়া উষা কহিল—কতো খেতে পারিস, খা।

ধরিত্রী আর বুলারও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তাহারও হাত লাগাইল।

উষা বলিল—কিন্তু আমাদের মিষ্টিমুখ হচ্ছে কবে?

—তারিখ এখনো ঠিক হয়নি। কিন্তু তোদের মিষ্টিমুখের আবার তারিখ কি! যে কোনো দিন।

বুলা কহিল—ভেনিসে যাবার আগে দেখা কোরো ভাই।

তাহার কথা-বলার ধরন দেখিয়া মিলি হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল: ভেনিস ততোদিন ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করলে হয়।

জল খাইতে-খাইতে হঠাৎ থামিয়া ঢোক গিলিয়া: ঐ এলো আমার ডাক। আমি এবার চলি।

উষা মধুর অন্তরঙ্গতার সুরে কহিল—শোভাদিদের ঐ সব বাজে কথায় মন খারাপ করিস নে। পরের নিন্দা করতে পারলেই ওদের হলো।

নিচে হর্ন আবার বাজিয়া উঠিল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে-নামিতে মিলি হঠাৎ থামিয়া পড়িল। গলা তুলিয়া অন্ধকারকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—চললাম, শোভা-দি। নেমন্তন্ন করলে যেয়ো কিন্তু তোমরা।

অন্ধকার নিরুত্তর।

আরো এক ধাপ নামিয়া : ভীষণ কোনো ব্যর্থতাও যদি জীবনে আসে তার ভয়ে আমি এ-আনন্দকে ত্যাগ করতে পারবো না। অতোটা সঙ্কীর্ণতা আমার সইবে না কখনো।

ধরিত্রী, ঊষা আর বুলা মিলির পিছে পিছে নামিয়া আসিয়াছে—তাহাকে বিদায় দিবার ছলে একেবারে সামনের রোয়াকটুকুতে। ইচ্ছা, মানবকে একবার দেখিয়া লয়—তাহাদের যে পরিচিতা, তাহার জীবনে এ কোন জ্যোতির্ময় সূর্যোদয় হইল। আশা, কবে আবার তাহারা মিলির মতো এতোখানি অহংকারে জীবনের ব্যর্থতাকে পরাভূত করিবার প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবে।

বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া অণু ও শোভনাও কিঞ্চিৎ ঝুঁকিয়া পড়িল। মানবকে ভালো করিয়া দেখা গেলো না।

মোটরটা অদৃশ্য হইলে অণিমা কহিল—এই মেয়েটাও মারা পড়লো।

দুর্বল, ভীরুস্বরে শোভনা কহিল—আলোর পোকা!

১৪

স্টিমারের নাম টাইফুন।

নদীর জল ঝির-ঝির করিয়া কাঁপিতেছে ; রূপোর চুমকি-বসালো সিল্কের শাড়ি রোদে শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে—জায়গায়-জায়গায় কুঁচকানো। ফার্স্ট ক্লাশের ডেকএ বেতের সোফায় বসিয়া মানব সকালবেলাকার খবরের কাগজটা নিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। মিলি রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া একটা চাষার ছেলের মাছ-ধরা দেখিতেছে।

মানব কহিল—স্নান করে নাও না।

স্টিমারটা আগে ছাড়ুক।

—এই ছাড়লো বলে। কী খাবে তার পর ? ভাত ?

—নিশ্চয়।

—সুখানিকে তাহলে বলি।

—ব্যস্ত হবার দরকার নেই। এ-দিকে এসো এগিয়ে। দেখ, দেখ, কী সুন্দর !

মানব মিলির গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। রোদে হাওয়া একটু তাতিয়া উঠিয়াছে : মিলির বেণী-ছেঁড়া কয়েক টুকরা চুল মানবের গালে মৃদু-মৃদু লাগিতেছে। মানব কহিল—কোথায় ?

মিলি কহিল—চারদিকে।

—আমি তো দেখছি আমার পাশেই।

মিলি আরো ঘেঁষিয়া আসিল : আমার কিন্তু ট্রেনের চেয়ে স্টিমার বেশি ভালো লাগে। ঢেউ দেখলেই মন আমার উথলে উঠে। বেশ একটু ভয়-ভয় করে কি না—তাই।

মানব জিজ্ঞাসা করিল—ঐ হাল্কা ডিঙিটা করে নদী পাড়ি দিতে পারো ?

—পারি, যদি তুমি সঙ্গে থাকো।

—আমি সঙ্গে থাকলে আর কী এগোবে ?

—যদি ডিঙিটা নেহাৎ ডোবে-ই, তোমাকে আঁকড়ে ধরতে পারবো তো ? জানি তুমি আমাকে নদীতে ফেলে রেখেই পারে উঠবে, তবু—

গালে গাল লাগাইয়া মানব কহিল—তোমাকে ফেলে উঠে পড়বো কী করে বুঝলে ? তোমার ওজন কতো ? বলিয়া মিলির কোমরে হাত দিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া তখুনিই নামাইয়া দিয়া কহিল—ফুঃ ! আমার রেইন-কোটটার চেয়ে হাল্কা। আমার মাথার পালকের বালিশ মাত্র। দিব্যি মাথায় করে তুলে আনবো।

এমনি সময় ভোঁ দিয়া স্টিমার পার হইতে সরিয়া আসিতে লাগিল, ক্রমশ ঘুরিয়া গেল—মিলির চোখের সমুখে নূতন দৃশ্য। তীরে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা দাঁড়াইয়া আছে, পিছনে পাতার কুটির—ঘন কলাগাছের বেড়ার সীমায় ছায়া-নিবিড়। বিধবার সিঁথির মতো শাদা পায়ে-চলা পথ। ঐ বুঝি ঘেঁটু ফুল ফুটিয়া আছে !

মিলি কহিল—তোমার ও-রকম পাতার ঘরে থাকতে ইচ্ছা করে না ?

মানব হাসিয়া কহিল—মনে মনে করে বৈ-কি।

—আমি যদি সঙ্গে থাকি ?

—তুমি থাকবে বলেই তো দু'দিন অন্তর ফিরপোতে ডিনার খেতে কলকাতায় চলে আসি সটান।

—না না, একেবারে এখানকার বাসিন্দা হয়ে যাবো। তুমি লাঙল হাতে নিয়ে চাষ করবে, আর আমি কুলো নাচিয়ে ধান ঝাড়বো। তুমি কাঠ ফাড়বে, আর আমি কুড়োব শুকনো পাতা।

—কিম্বা ঐ নৌকোয় থাকতে তোমার আপত্তি হবে ? আমি মাঝি হয়ে

দিন-রাত দাঁড় বাইবো, আর তুমি ছইয়ের ভেতরে বসে রান্না করবে। জাল পেতে আমি ধরবো মাছ, তুমি কুটবে কুটনো।

—রাত্রি বেলা ?

—পারে কোথায় নৌকো লাগিয়ে জলে পা ডুবিয়ে দুজনে বসে-বসে গল্প করবো।

—কিসের গল্প ?

—এই, এখানে আর ভালো লাগে না। নিউ-এম্পায়ারে নতুন যে রাশ্যান নর্তকী নাচছে, তা চলো একবার দেখে আসি। মোটর-বাইকে লেইকটা বার-কতক চক্কর মারি। চীনে-হোটেলের হ্যাম কিন্তু অনেক দিন খাইনি।

মিলি খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ; কহিল—যাই বলো, তুমি নিতান্ত শহুরে। শহর তোমার কাছে মদের মতো।

—আর গ্রাম বুঝি তোমার কাছে পাথরের গ্লাশে মিছরির পানা। দুদিনেই ঠাণ্ডা। টেম্পারেচার পঁচানব্বুয়েরো নিচে।

মিলি গাঢ় গভীর স্বরে কহিল—যাই বলো, আমি হয়তো কিঞ্চিৎ কবি হয়ে উঠেছি। পৃথিবীকে সুন্দর বলে অনুভব করাই তো কবি হওয়া, না ?

—কিন্তু আমরা সে-স্টেইজ পার হয়ে এসেছি। আমরা পৃথিবীকে সুন্দরী বলে অনুভব করি বলেই তাকে জয় করতে চাই। কী বলো ? বলিয়া মিলিকে সে ধীরে আকর্ষণ করিল।

মিলি সেই স্পর্শের মাঝে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল—যাই, চুলটা খুলি।

—দেখি আমি তোমার বেণীর বন্ধন মোচন করিতে পারি কি না।

মানবের উৎসুক হাত হাতের মুঠির মধ্যে টানিয়া নিয়া মিলি বলিল—আমি চান করতে গেলে তুমি ভাতের কথা বলে দিয়ো। খিদে পেয়েছে বেশ।

তবু মিলির মুক্ত হইবার চেষ্টা দেখা যায় না।

কে-একটি তৃতীয়-শ্রেণীর যাত্রী ভুল করিয়া এ দিকে ঢুকিয়া পড়িয়া-

ছিল; তাহারা প্রথমে টের পায় নাই। পরে সেই যাত্রীটি তাহার বন্ধুদের এই মনোরম দৃশ্যটি দেখাইবার জন্য কখন দুয়ারের বাহিরে জড়ো করিয়াছে। অসাবধানে কে-একজন একটা আওয়াজ করিয়া উঠিতেই মিলির প্রথমে নজর পড়িল। অমনি সবাই চম্পট।

মিলি কহিল—না, বেলা বেড়ে চললো। বাথরুমে জল আছে তো?

হাঁটু গাড়িয়া নিচু হইয়া ডেকএর উপর বসিয়া মিলি স্যুটকেস খুলিয়া কাপড় সেমিজ ব্লাউজ পেটিকোট তোয়ালে তেল সাবান খোলস ইত্যাদি বাহির করিতে লাগিল। শীর্ণ শুকনো বেণী দুইটা দুই কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর নামিয়া আসিয়াছে—আঁচলটা এলোমেলো, পায়ের দুমড়ানো পাতা দুইটি নদীর ফেনার মতো শাদা।

মিলি স্নানের ঘরে প্রচুর জল লইয়া একটা বড় মাছের মতো খলবল করিতেছে—স্টিমারের ঢেউ-ভাঙার শব্দ ভাঙিয়া সেই সুর জলতরঙ্গের মতো মানবের কানে লাগে।

মিলি বলে: নদীর উপর কি-কি দৃশ্য দেখছ আমাকে বঞ্চিত করে—শিগগির বলো।

মানব বলে: আমি সম্প্রতি খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ছি।

ঘরের ভিতর হইতে কথা আসে: বলো কি? প্রতি মুহূর্তে নদীর নূতন রূপ—প্রথম-প্রেমে-পড়া কিশোরীর মতো।

—আমি তো দেখছি জল আর জল। মুখে দিলে নোনতা, চোখে অত্যন্ত ঘোলা। পান করবার যেটুকু, সেটুকু তোমার ঠোঁটে। তুমি নেহাৎ অদৃশ্য বলেই কথাটা বলতে পারলাম। অপরাধ মার্জনা কোরো।

একটুখানি পরে আবার কথা আসে: আমি হলে নদীর বা তীরের এক কণা সৌন্দর্যও হারাতে দিতাম না। এ-জায়গাটা কি খুব ফাঁকা?

—না, এখানে দিব্যি চর জেগেছে—নতুন চর। উড়ি ঘাস; দু চারটে বক দেখা যাচ্ছে।

প্রায় কান্নার সুরে : বা, আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—তোমার ঘরে জানলা নেই ?

—আছে একটা, কিন্তু পাখি-তোলা। এঁটে বসেছে। কী হবে ? ওদের থামতে বলো।

—মাঝিরা চরে জাল শুকোচ্ছে। দুটো বক এই উড়লো। এখেনে রাজ্যের কচুরি-পানার ভিড়।

—তারপর ?

—দাঁড়াও। টিকিট-চেকার এসেছে।

কতক্ষণ বাদে : গেছে ?

—হ্যাঁ।

—বাবাঃ, মরেছিলাম আরেকটু হলে।

—কেন ?

—কচুরি-পানা দেখতে ভিজে গায়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম! বড়ো জোর বেঁচে গেছি।

—কিন্তু এখনো অনেক জিনিস দেখবার আছে। এই একটু বাদেই মিলিয়ে যাবে। যদি দেখতে চাও তো বেরিয়ে এসো। জীবন ক্ষণস্থায়ী, দৃশ্যপট নিয়ত-পরিবর্তনশীল।

—কবরেজি ভাষায় কথা কইছ যে। কী এমন দৃশ্য ?

—একটা কুমীর ডাঙায় উঠে রোদ পোহাচ্ছে।

মিলি হাসিয়া বলে : মিথ্যা কথা।

—আচ্ছা, বেশ। দেখ, দেখ, কী প্রকাণ্ড হাঁ।

—জু-তে ঢের দেখেছি।

—এই দেখ একটা হাল্কা ডিঙি স্টিমারের মুখে পড়ে উলটে গেল আর-কি।

—উলটে যায়নি তো ?

—যায়নি বটে, কিন্তু ঢেউর বাড়ি খেয়ে একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছে।

—ও-রকম তো আমাদের নৌকোও একবার হয়েছিলো। গঙ্গায় তোমার মনে নেই? এ তেমন নতুন কী!

মানব তবু আশা হারায় না: কিন্তু গাঙ-শালিক তুমি দেখেছ কোথাও? ঝাঁক বেঁধে ষ্টিমারের রেলিঙে এসে বসেছে।

—কই দেখি।

মিলি দরজা ঠেলিয়া শুকনো কাপড়ে হাসিতে-হাসিতে বাহির হইয়া আসিল।

—কোথায় গেলো তোমার গাঙ-শালিক?

মানব হাসিয়া বলিল—তোমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে পালিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া দুইজনে সামনের ডেকএ চেয়ার টানিয়া বসিয়াছে; হাওয়ার জোয়ারে চুল আঁচল খবরের কাগজ উড়িয়া পড়িতেছে। তৃপ্ত চোখে রৌদ্র-মদির নদীর লাবণ্য দেখিতে-দেখিতে হঠাৎ মিলি কহিল—এসো, খানিকটা ড্র-ব্রিজ খেলি।

বেতের একটা টিপয় দুইয়ের মাঝে রাখিয়া মানব তাস ডিল করিতে বসিল। তাস না তুলিয়াই ডাক পড়িল: ফোর নো-ট্রাম্পস্।

মিলি হাসিয়া বলিল—স্টেইক রেখে খেলতে হবে।

—যুধিষ্ঠিরের মতো দ্রৌপদীকে পণ রেখে?

—দ্রৌপদীকে নিয়ে আমি কী করবো?

—তবে এই মনি-ব্যাগটা?

—ওটা তো ফাঁকা—টাকার পুঁটলি তো তোমার বাক্সে।

—তবে এই আংটিটা?

—ওটা অমনিই পরিয়ে দাও না।

মানব বলিল—তুমি যেমন ভাবে কথা বলছ তাতে মনে হচ্ছে আমি যেন রাশি-রাশি ডাউন দিয়ে বসে আছি। কিন্তু মহারাণী যদি হারেন, তিনি কী দেবেন?

হাতের তাস গুছাইতে-গুছাইতে মিলি বলিল—মহারাণী হারতে বসেননি।

—কিন্তু যদিই দয়া করে হারেন, কী পাওয়া যাবে?

—কী আবার! ফলের ঝুড়ির ছাড়ানো খোসাগুলি।

—এ মোটেই সমান-সমান হল না। তুমি তোমার হাতের চুড়িগুলো।

—আর, এই বুঝি সমান ভাগ হল? তার চেয়ে অন্য হিসেব করা যাক· এসো!

—আমারো মাথায় এসেছে কিন্তু।

লজ্জায় রাঙা হইয়া মিলি বলিল—আমারো।

কিন্তু পরক্ষণেই হাতের সমস্ত তাস উলটাইয়া দিয়া কহিল—বাবাঃ, এই হাতে ভদ্রলোক খেলতে পারে? হেরে ভূত হয়ে যেতাম।

মানব তাড়াতাড়ি দুই হাত বাড়াইয়া টিপয়ের বাধা ডিঙাইয়া মিলিকে বুকের মধ্যে টানিয়া নিয়া কহিল—আমার হাতের তাস নিয়ে খেলে জিতেই বা তোমার ভূত হতে বাকি থাকতো কী!

মুখখানি নিজের বাহুর মধ্যে লুকাইয়া মিলি মানবকে মৃদু-মৃদু বাধা দিতে লাগিল। এই মধুর বাধাটুকুর বোধকরি তুলনা নাই! মানব মিলির মাথাটা কাঁধের তলায় ধীরে-ধীরে শোয়াইয়া কানের পিঠের চুলগুলি নিয়া আস্তে-আস্তে আদর করিতে লাগিল।

ডান-হাতের মধ্যমায় কখন মানব তাহার আংটিটি পরাইয়া দিয়াছে।

মিলি হঠাৎ মাথা তুলিয়া কহিল—এখন এক পেয়ালা করে চা খেলে হত।

মানব কহিল—এ নিতান্তই তোমার কথা পাড়বার ছল মাত্র। বেলা দুটোয় তুমি চা খাও।

দুই চোখে টলটলে খুশি নিয়া মিলি কহিল—আজ সব দিক থেকেই অনিয়ম করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ঐ একটা স্টেশন এলো বুঝি। এখেনে স্টিমার থামবে। বলিয়া মিলি চেয়ার ছাড়িয়া রেলিঙ ধরিতে ছুটিল।

মানব স্মিত হাস্যে মিলির এই দ্রুত পলায়নটি উপভোগ করিল। অথচ ইচ্ছা করিলে মিলিকে সে বাহুর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিত। ইচ্ছা করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। ইচ্ছার উপর এই অপ্রতিহত প্রভুত্ব খাটানোর মতো বিলাস আর কী হইতে পারে! হাতের মুঠোয় ব্যয় করিবার মতো জিনিস পাইলেই মানব তাহা অনায়াসে উড়াইয়া দিয়া বসিয়াছে—হাতের মুঠাও তাহার কোনোকালে তাই শূন্য থাকে নাই। কিন্তু মিলিকে সে অনন্তকালের জমার ঘরে রাখিয়া দিতে চায়—কোথাও এতটুকু ব্যয়ের ক্ষতি যেন তাহার সহিবে না। কেন-জানি এই কেবল তাহার মনে হয়, মিলি তাহার সঙ্কীর্ণ অস্তিত্বটুকু দিয়া মানবের জীবনব্যাপী অবকাশের আকাশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে—সে-পূর্ণতাকে সে কৃপণের মতো সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। মিলির দিকে চাহিয়া তাহার বড় মায়া করে—ইচ্ছা করে উহাকে কোলে করিয়া জাগিয়া-জাগিয়া দুঃখের রাত সে পোহাইয়া দেয়!

মিলি যেন তেমন বাতি নয় যাহা উস্কাইয়া দিলে বেগে জ্বলিয়া উঠিবে। মিলি যেন সেই দূরের তারা—সমস্ত রাত্রি ভরিয়া যাহার স্তিমিত দ্যুতি!

মিলি বলিল—এই স্টেশনে অনেক লোক উঠবে। ঐ দেখ, জলে নেমে আঁকসি তুলে দোতলার প্যাসেঞ্জারদের থেকে ভিক্ষা চাইছে। চলো, ডেকটা একবার ঘুরে আসি।

মিলি যেন ছুটির দিনে দুপুর-বেলায় বাড়িতেই আছে—তাহার তেমনি বেশ। গায়ে সেমিজ—ব্লাউজের হুক না আটকাইয়াই ইস্ত্রি-ভাঙা মচমচে আঁচলটা কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়াছে; প্রান্তমূলে চাবির গোছার ভার রহিয়াছে বলিয়াই হাওয়ায় যা-হোক স্খলিত হইতেছে না। চুলগুলি

এলো—তেলে কুচকুচ করিতেছে—পিঠে-বুকে একাকার হইয়া আছে। পায়ে অয়েল্‌-ক্লথের চটি। মুখে পথ-ভ্রমণের এতটুকু মালিন্য নাই। সম্মুখের ডেকএ বাহির হইয়া আসিতেই অগণিত যাত্রীর সমবেত দৃষ্টি তাহার মুখে পড়িল। অগত্যা আঁচলটা সামলাইয়া মাথার উপর একটা ঘোমটার মতো করিয়া টানিয়া দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

মিলি বায়না ধরিল : কিছু পাত-ক্ষীর কেনো। চায়ের সঙ্গে খাওয়া যাবে।

মানব ঠাট্টা করিয়া বলিল—কিছু গরম দুধও কিনে রাখ। হাঁড়ির চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছে।

—কলা? এই অমৃতসাগর কলা কত করে?

মিলি দস্তুরমতো দরদস্তুর শুরু করিয়াছে।

মানব বলিল—আঁচলটা বিছোও দিকি। কিছু চিঁড়েও কিনে নিই। কামিনীভোগ চিঁড়ে।

মিলি মানবের কথায় কান দিবে না। সে পাত-ক্ষীর ও কলা কিনিল। কহিল—তুমি এখেনে দাঁড়াও, আমি এগুলো রেখে আসি। পরে নিচে নামবো একবার।

এক হাতে কলার কাঁদি ও অন্য হাতে কলাপাতায় বাঁধা শুকনো ক্ষীর লইয়া মিলি যাত্রীদের প্রসারিত পাদপদ্মের অরণ্য ভেদ করিয়া অন্তর্হিত হইল। এইবার যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার কেশ-বেশের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

বেমজবুত কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা করিতে যাত্রীরা নাকাল হইতেছিল। মানব আর মিলি নিচে নামিয়া আসিল—এঞ্জিনের পাশে। জায়গাটা ভীষণ গরম। ভয়ে মিলির গায়ে ঘাম দিল। তাঁতের মাকুর মতো দুটো বিশাল লৌহদণ্ড এমন বেগে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ওঠা-নামা করিতেছে—মিলির মনে হইল কখন নির্দিষ্ট পথ হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া তাহাকেই গ্রাস করিয়া ফেলে বুঝি।

মিলি ব্যস্ত হইয়া বলিল—শিগগির ওপরে চল। দৈত্যের পাকস্থলী আর দেখতে চাইনে।

জায়গাটা জল পড়িয়া পিছল হইয়াছে; তাড়াতাড়ি মিলির হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া মানব কহিল—পাকস্থলীর ক্রিয়া ঠিকমতো না চললেই তো মৃত্যু।

—তবু পাকস্থলীর চেয়ে বাইরের স্বাস্থ্যটাই আমরা কামনা করি। পাকস্থলী নিয়ে মাথা ঘামাই না।

—যেমন তোমার রূপ। যেমন তুমি। কোথায় এমনি কল কব্জার সোরগোল চলেছে খবর রাখি না। তোমার চোখের অন্তরালে কোন স্নায়ুর কি কাজ—জানতে আমার বয়ে গেছে।

উপরে আসিয়া হাওয়া পাইয়া মিলি বাঁচিল। খোঁপাটা খুলিয়া পিঠের উপর চুল ছাড়িয়া দিয়া বুকের কাপড় আলগা করিয়া সে গভীর নিশ্বাস ফেলিল। ট্রে সাজাইয়া বয় চা দিয়া গিয়াছে।

গরম চায়ের বাটিতে—হ্যাঁ, বাটিই বটে—ঠোঁট ডুবাইয়া তক্ষুনি মুখ সরাইয়া আনিয়া মিলি জিভ উলটাইয়া মৃদু-মৃদু ঘসিতে-ঘসিতে উপর-ঠোঁটটা ঠাণ্ডা করিয়া কহিল—চাঁদপুর কতোক্ষণে পৌছুব?

—রাত সাড়ে-আটটা হবে। স্টিমার কিছু লেইট আছে।

—বাড়ি পৌছুতে প্রায় ভোর, না? আমাদের নতুন বাড়িটা কতোদিন আমি দেখিনি। সামনে বিরাট নদী—এখন নাকি শুকিয়ে এসেছে। ধূ-ধূ মাঠও আমার ভালো লাগে।

—প্রকাণ্ড কিছু-একটা মুক্তির চেহারা দেখলে আমিও অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করি।

—ওটা আমাদের সাবেক বাড়ি নয়। কয়েক বছর আগে ওর পোজিশান দেখে বাবার ভারি ভালো লাগে। ওটা উনি কিনেছেন। এতোদিন তো ওটা মালি-মজুরের জিম্মাতে থেকে ভেঙে-ধ্বসে একসা হয়ে যাচ্ছিলো।

বাবার শখ হলো ওটাতে উনি কায়েমি হয়ে বসবেন। তাই ওটার গায়ে শুনছি নতুন করে চুন-বালি উঠেছে। বাড়িটা বিশাল—সামনে সমুদ্রের মতো মাঠ।

মানব টোস্টে ছুরি দিয়া মাখন মাখাইতে-মাখাইতে কহিল—বাড়িতে আর কে আছেন?

—আর, আমার এক বিধবা পিসিমা; গোরাও আছে নিশ্চয়।

—কে গোরা?

এই সব অত্যাবশ্যকীয় খবর মানব আগে লয় নাই কেন?

মিলি কলার খোসা ছাড়াইতে-ছাড়াইতে কহিল—পিসিমার ছেলে। এই বোধহয় নয়ে পড়েছে। পুঁটি-মাছের মতো চঞ্চল। ঐ ছেলেকেই পেটে নিয়ে পিসিমা বিধবা হন। স্বামী মারা যাবার পর শ্বশুরবাড়িতে ওঁর স্থান হলো না। বাবা-কাকাদের ঐ একটিমাত্র বোন—সবাইর ছোট। বাবাই তাঁর ছোট বোনকে আগলে ফিরছেন।

কলায় একটা কামড় দিয়া: দেখবে আমার পিসিমাকে। যেমন নিষ্ঠা তেমনি ধৈর্য। পিসিমাকে পেয়ে মায়ের দুঃখ আমি ভুলে আছি।

প্রত্যেকটি শব্দ স্নেহে ভিজাইয়া মানব কহিল—মাকে তোমার মনে পড়ে?

চিবোনো বন্ধ করিয়া মিলি বলিল—মনে পড়তে পারে না বটে, তবু আমি মনে-মনে মায়ের মুখ রচনা করি। বাবার জীবনে মায়ের যে দীর্ঘ ছায়া পড়েছে তার থেকে আমি তাঁর একটা শান্ত ও সুন্দর পরিচয় পাই।

বেলা এখন পড়িয়া আসিয়াছে, গাছের তলাগুলি মায়ের কোলের মতো ঠাণ্ডা। মানব কহিল—তোমার বাবাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করে।

মিলির হাসি কোণের সেই উদ্ধত দাঁতটি ছুঁইয়া ধীরে-ধীরে মিলাইয়া আসিল।

—ইচ্ছে তো করে, কিন্তু যুগলমূর্তি দেখে তিনি যদি ঠ্যাঙা নিয়ে তেড়ে আসেন ?

মানব না-হাসিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল—না, তিনি উপদ্রবই করতে পারেন না। রাত থাকতে উঠে যিনি সেতার বাজিয়ে উপাসনা করেন, তাঁর মনে নিশ্চয়ই এমনি একটি উদার শান্তি আছে যা আমাদের মিলনের পক্ষে অনুকূল বায়ুসঞ্চার করবে। স্ত্রীর বিরহ যাঁর জীবনে এমন লাবণ্য বিস্তার করেছে তিনি কখনোই স্বয়ম্বৃতা মেয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না।

চা-টা এইবার ঠাণ্ডা হইয়াছে; নিশ্চিন্ত হইয়া ঠোঁট ডুবাইয়া মিলি কহিল—কিন্তু স্টিমারের ঐ পাকস্থলীটা তো দেখলে ? আমি কিন্তু তাতে বেশি জোর দিই না। আমি ভাবছি—

মিলি টোস্টে কামড় দিয়া ঠোঁট ও নাক ঢাকিয়া মানবের দিকে কেমন করিয়া চাহিল।

মানব কহিল—তা ছাড়া কী আবার ভাববার আছে। তোমার বাবার কর্তৃত্ব ছাড়া আর-কিছু আমি মান্যই করবো না। তোমার বাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে বরং তাতে কিছু শ্রী থাকবে, অন্যে কেউ এতে মাথা গলাতে এলেই তা নির্বিবাদে গুঁড়ো হয়ে যাবে। আমি তখন দুঃশাসন।

তেমনি করিয়া চাহিয়া মিলি বলিল—কিন্তু তার চেয়েও দুঃসহ দুঃখের কারণ ঘটতে পারে।

মানব প্রথমে কিছুই ভাবিয়া পাইল না; একেবারে যেন জলে পড়িয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। পরে কি-একটা কথা ভাবিয়া লইয়া উত্তেজনায় চায়ের তলানিটা ডেকএর উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া জোর গলায় কহিল—আর কিছুই ঘটতে পারে না।

ভীত, বিমর্ষকণ্ঠে মিলি কহিল—তুমি যদি ঐ চায়ের তলানির মতো অমনি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও ?

পীড়িতমুখে মানব কহিল—তেমন কোনো স্থচনা তুমি দেখেছ নাকি !

মানবের মুখ দেখিয়া মিলির কষ্ট হইতে লাগিল। তবু দৃঢ় হইবার ভান করিয়া বলিল—আমার মাঝে আকৃষ্ট হবার কী-বা থাকতে পারে আমি ভেবে পাই নে। বাইরের জৌলুস যে-টুকুন আছে তা মিলিয়ে যেতে কতোক্ষণ!

—তুমি কি খালি বিধাতার সৃষ্টি নাকি—আমার নও? আমি তো আমার প্রতিমাকে বিসর্জন দেবার জন্যে তৈরি করিনি।

কেহ আর অনেকক্ষণ কথা কহিল না। স্টিমার সমানে চলিয়াছে। দুইজনের চোখের সামনে দিনের আলো তরল হইয়া আসিতেছে। পাখিদের দল বাঁধিয়া বিদায় নিবার সময় আসিল।

মানবের কাছে মিলি মাত্র সামান্য নারী নয়—যে-নারীকে এতদিন সে ভাবিত ঝকঝকে গয়না আর চকচকে শাড়ি। মিলি তাহার কাছে মূর্তিমতী প্রেম—পৃথিবীর আদিম নরের কাছে পরিধিহীন আকাশ। ঐ ভঙ্গুর মৃন্ময় দেহটি মানবের কাছে সমুদ্রের মতো পরমতম বিস্ময়। যে নামহীন বিধাতা এতদিন অগোচরে কাল কাটাইতেছিলেন, তিনি সহসা মিলির দেহে বাসা নিলেন। নদীর উপরে এই ঘনায়মান সন্ধ্যা পার হইয়া মানব যেন বহুবিস্তীর্ণ পৃথিবী অতিক্রম করিয়া একা-একা কোথায় যাত্রা করিয়াছে!

মিলির হাতের উপর ধীরে-ধীরে হাত বুলাইতে-বুলাইতে মানব কহিল—এই সন্ধ্যা হলো। অল্প-অল্প মেঘ জমেছে। পূবে হাওয়া দিয়েছে। ঝড় না ওঠে।

মিলি কথা না কহিয়া সর্বাঙ্গে সন্ধ্যার এই কোমল মুহূর্তটির শ্বাস অনুভব করিতে লাগিল।

মানব বলিল—সময়টা ভারি ভালো লাগছে। এই দুর্লভ সোনার সন্ধ্যাটি আমার মনে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। এমন বিশ্রাম জীবনে আর কোনোদিন পাইনি, মিলি।

আবহাওয়াকে সহজ ও সরল করিবার সুযোগ আসিয়াছে। মিলি কহিল—তুমি যে দেখছি হঠাৎ বুড়িয়ে গেলে। এ কী কথা শুনি আজ 'মন্থরের' মুখে! তুমি বিশ্রামের ভক্ত!

—আমরা আজকের দিনে প্রতিমুহূর্তে রোমাঞ্চ চাই বলেই প্রতিমুহূর্তে শ্রান্ত হচ্ছি। বিশ্রামের ক্ষণগুলিকে উপভোগ করার আর্ট ভুলে গেছি বলেই আমরা জগৎ জুড়ে নিরুদ্দেশ গতির ঝড় তুলে দিয়েছি। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে আজকের দিনে এরোপ্লেনে অ্যাল্‌পস্‌ ডিঙিয়েও আমরা গরুর গাড়ির যুগের চেয়ে বেশি সুখ পাইনি।

মিলি মজা পাইয়া কহিল—তোমার হঠাৎ এই পক্ষাঘাত শুরু হলো?

মানব তন্ময় হইয়া বলিয়া চলিল: যতোই আমরা ছোটার নেশায় ধুমকেতু সাজি না কেন, আমাদের মন আজো ছন্দের অনুবর্তী, মিলি। আমার কেন-জানি না এখন খালি এই কথাই মনে হচ্ছে, আমাকে হাউই-এর মতো মঙ্গলগ্রহের দিকে ছুঁড়ে দিলেও এই গা এলিয়ে বসে থাকার চেয়ে বেশি রোমাঞ্চ আমি পাবো না। পুরাকালে পরীরা—যেমন ধরো ড্যাফনে—য়্যাপোলোর ভয়ে কেমন দিশেহারা হয়ে ছুটতো, খবর রাখো তো? আমরাও তেমনি ছুটছি—জীবনকে অবসন্ন হতে দেব না ভেবে। একটু থামতে পারলে হয়তো দেখতাম ড্যাফনের মতো আমরাও পালিয়ে বেঁচে কখন ফুল হয়ে ফুটে উঠেছি। উদ্দাম ছোটার চেয়ে একটি গাঢ়তম মন্থরতম মুহূর্ত ঢের সুখের।

—আপাততো নয়। মিলি বলিল—বেশ ভালো করেই মেঘ জমছে। ঝড় উঠবে। যা স্টিমারের নাম! আমার ভয় করছে। যদি স্টিমার ডুবে যায়।

—পাগল! এ-স্টিমারের সারেঙ খুব ওস্তাদ সারেঙ। অনেক ঝড়কে সে হালের বাড়ি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওঠ, একটু বেড়াই।

—চাঁদপুর পৌঁছুতে আর কতোক্ষণ?

ঘড়ির দিকে চাহিয়া : ঘণ্টা দেড়েক হয়তো।

—তা হলেই হয়েছে। বাবার মত নেবার আগেই এ-যাত্রা সমাধা হবে। ভগবানে বিশ্বাস কর তো তুমি? আমার মোটেই আসে না।

মানব হাসিয়া উঠিল: ভগবান যে এতে বেরসিক নন সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

—মরতে আমার সত্যিই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমাদের ইটালি যাওয়া বাকি আছে। যাবে তো?

মানব মিলির কতগুলি চুল মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—মেঘনার ওপরে সামান্য মেঘ দেখেই তুমি শিউরে উঠছ!

—দাঁড়াও, চুলটা বাঁধি। বাক্সগুলি এলো—গুছোতে হবে না? হোল্‌ড্‌-অল্‌টা তখন শুধু-শুধু মেললে। বাঁধো এবার।

—এখনো দেরি আছে। দাঁড়াও, একটা মজা দেখ।

মিলি ফিরিল।

মানব তাসগুলি হাওয়ার মুখে ছুঁড়িয়া দিল। মনে হইল এক ঝাঁক উড়ন্ত পাখি।

মুখ টিপিয়া মিলি হাসিল। বলিল—তোমার পুঁটলি থেকে নোটগুলি বের করে অমনি ছুঁড়ে দি?

তারপর বৃষ্টি নামিল। অন্ধকারের ঢেউয়ের উপরে দূরে-দূরে দুয়েকটি বাতির কণা দুলিতেছে।

মানব কহিল—বৃষ্টি দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। বৃষ্টি না এলে মেঘনা সর্বাঙ্গসুন্দরী হতে পারে না। দেখ, কতো দূর পর্যন্ত সার্চ-লাইট পড়েছে। মিলি আর কথা কয় না। নদীর সীমা আর দেখা যায় না। মনের সঙ্গে মিলিয়া নদীও বুঝি তট হারাইয়াছে।

খুব কাছে মুখ সরাইয়া আনিয়া মানব কহিল—ভয় করছে?

মিলি আবদারের সুরে ভেঙচাইয়া কহিল—খিদে পাচ্ছে? চোখ ঢুলছে?

দেখ না তোমার ঘড়িটা ? দিনে এতোখানি স্লো যায়—কলকাতায় থাকতে সারিয়ে আনোনি কেন ?

কখন আবার দেখিতে-দেখিতে বৃষ্টি থামিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই ষ্টিমার যেন আনন্দে বাঁশি বাজাইল।

—এই, এসে গেছে চাঁদপুর !

মানব কহিল—না, এখনো দেরি আছে।

—ছাই দেরি। শিগগির জিনিস-পত্র গুছিয়ে ফেলো বলছি। সঙ্গে আবার চাল করে এই লাঠিটা এনেছ কেন ?

—বৃষ্টি তাড়াবার জন্য !

—না, আমাকে তাড়াতে ?

মানব মিলিকে ধরিয়া ফেলিল। বুকের কাছটিতে ঘন করিয়া টানিয়া আনিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই বলা হইল না।

মিলি কহিল—থাক, হয়েছে। ছাড়ো। মানব তাহাকে আস্তে ছাড়িয়া দিল।

নোয়াখালিতে ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল—তখনো বেশ অন্ধকার আছে। গাড়ি দাঁড়াইতেই বুড়া চাকর ভীম প্রত্যেকটি কামরার জানলায় মুখ বাড়াইয়া মিলিকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

মিলি তখনো ঘুমাইতেছে ; তাহার গায়ে ঠেলা মারিয়া মানব কহিল—গাড়ি এইখেনেই খতম। নামতে হবে না ? ওঠ, পাততাড়ি গুটোও। দেখি, তোমাকে নিতে কেউ এলো কিনা।

জানলা তুলিয়া মানব মুখ বাড়াইল।

—তুমি এ-দেশের কাকে চিনবে ? বলিয়া মিলি মানবের পাশে মুখ বাড়াইল। তারপরে ঈষৎ গাল ফিরাইয়া : আমাদের কেউ এখন একটা স্ন্যাপ নেয় না ? ঠিক টুরিস্টের মতো লাগছে।

ভীম নিরাশ হইয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল ; মিলি গাড়ি

হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল—এ কেমন ধারা হলো? বাবা কাউকেও পাঠালেন না?

মানব কুলির মাথায় স্যুটকেস দুইটা চাপাইয়া দিতে-দিতে কহিল—পা দিতে-না-দিতেই অভ্যর্থনার চমৎকার আভাস পাচ্ছ। আমি সঙ্গে আসছি এ-কথা শখ করে লিখতে গেলে কেন?

চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে মিলি বলিল—এ ককখনো হতে পারে না। বাবা অন্তত গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—এখুনিই গিয়ে লাভ নেই। অন্তত ভোর হলে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারবে। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছেন, এখন ওঁকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না বরং ওয়েটিং-রুমে—ইজিচেয়ার আছে তো?—যে রোথো স্টেশন! এ কোন ভূতের দেশে নিয়ে এলে? বরং চলো ওয়েটিং-রুমে—মশার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও খানিকক্ষণ গুঞ্জন করি।

কুলিকে উদ্দেশ করিয়া মিলি কহিল—স্টেশনে গাড়ি আছে রে?

একটা গাড়োয়ানই যাত্রী পাকড়াইতে এ দিকে আসিতেছে দেখা গেল। তাহার হাতে চাবুক—অর্থাৎ মেহেদি গাছের লিকলিকে একটা ডাল; কিন্তু কুলি বলিল, ও হাঁকায় গরুর গাড়ি, বাবুদের নেহাৎই দুরদৃষ্ট।

মানব উৎফুল্ল হইয়া বলিল—আপ-টু-ডেইট হও, মিলি। গরুর গাড়িই সই। বিছানা বিছিয়ে একটু ঘুমোনোও যাবে, আর বাড়ি যেতে-যেতে ফর্সা। এক ঢিলে দুই পাখি।

অগত্যা মিলি গরুর গাড়ির গাড়োয়ানকেই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হীরালাল বাবুর বাড়ি চেন?

এতক্ষণে বুঝি ভীমচন্দ্রের হুঁস হইল। সে এতক্ষণ লণ্ঠন উঁচাইয়া মিলিকেই দেখিতেছিল—তাহার দিদিমণি যে রাতারাতি মেমসাহেব হইয়া উঠিয়াছে বুড়া চক্ষু কচলাইয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাহা

ছাড়া সঙ্গে এ কোন নবাবজাদা আসিয়াছেন, দিদিমণি স্বচ্ছন্দে তাঁহার হাতে একটা ঝটকা টান মারিয়া কহিল—চলো গরুর গাড়িতেই।

কর্তার নাম শুনিয়া ভীমের সন্দেহ ঘুচিল। আগাইয়া আসিয়া কহিল—আমিই তো এসেছি।

—এতোক্ষণ ঘুমুচ্ছিলে বুঝি? মিলির মুখ খুশিতে ভরিয়া উঠিল: বাচলাম। আরো আগে আসতে পারো নি?

—কতো আগেই তো এসেছিলাম। কিন্তু আপনি যে ফার্স্টো কেলাসে আছেন তা কে জানতো। সোভান মিঞা গাড়ি নিয়ে বসে আছে।

মানব তখনো গরুর গাড়িতে উঠিবারই সরঞ্জাম করিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া মিলি বলিল—লোক পেয়েছি। চলে এসো। গাড়ির আর দরকার নেই।

মানব কয়েক পা ফিরিয়া আসিয়া কহিল—এ তো গাড়ি নয়, রথ। চলো, একশো বছর আগে পিছিয়ে যাই একটু। সেই তো আধুনিক হওয়া।

—কিন্তু বাবা যে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—ঐ গাড়ি চড়ে মাল-পত্র নিয়ে তোমার লোক আগে বেরিয়ে যাক, আমরা পরে যাচ্ছি। নদীতে চোখের সামনে সন্ধ্যা দেখেছিলে, এবার দেখবে ভোর।

প্রস্তাবটায় নবীনতার উন্মাদনা আছে বটে, কিন্তু বাবাকে যত তাড়াতাড়ি পারে দেখিবার জন্ত মিলির চোখের দৃষ্টি এখন ব্যাকুল, উধাও। সে কহিল—না। বাবা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেই গাড়িতেই যাবো। গরুর গাড়িতে ধুঁকতে ধুঁকতে আমি যেতে পারবো না। গিঁটে-গিঁটে ব্যথা ধরে যাক! চলে এসো। মালগুলি তুলে ফেলো, ভীম।

মিলি তাহার চেনা মাটিতে পা দিয়াছে—তাই তাহার কথায় আদেশের সামান্ত একটু তেজ আছে। মানবের প্রভুত্ববোধে অলক্ষিতে যেন একটু ঘা লাগিল। একবার বলিতে ইচ্ছা হইল: তোমরা যাও, আমি আসছি

গিছে। কিন্তু বিছানা পাতিয়া মিলি আসিয়া পাশে না বসিলে এই অভিনব অভিযানের অর্থ কী! কথাটা বলিলে নেহাৎই একটা খেলো অভিমানের মতো শোনাইবে। অথচ এতো সহজে হারিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

প্রথম দেখাতে মানবের প্রতি ভীমের মন ভক্তি-গদগদ হইয়া উঠে নাই—ঐ লোকটিই তাহার দিদিমণিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। ফাস্টো কেলাসে আসিয়া এখন কি-না গরুর গাড়িতে চড়িবে! নিম্নস্বরে কহিল—সঙ্গে উনি কে, দিদিমণি?

মানব কহিল—দয়া করে দাদা বলে পরিচয় দিয়ো না।

মিলি গায়ের উপর আঁচলটা ঘন করিয়া টানিয়া কহিল—শীত পড়ে গেছে দেখছি এখানে। মাল উঠেছে সব? আর মায়া বাড়িয়ে কী হবে? চলো।

পরিচয় দিবার কুণ্ঠাটুকু ভীমের কেমন অদ্ভুত ঠেকিল। লণ্ঠনটা সে নিভাইয়া দিয়া কহিল—সব শুদ্ধু সাতটা উঠেছে। আর কিছু নেই তো? চলিতে-চলিতে হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মিলি কহিল—আমার আংটি! আংটিটা কোথায় পড়ে গেছে।

—কিসের আংটি?

—সেই যে তুমি ষ্টিমারে পরিয়ে দিয়েছিলে। এই আঙুলটাতে।

—পড়ে গেছে?

মানবের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই বিবর্ণতা ধরা পড়িল তাহার কণ্ঠস্বরে।

মিলি কহিল—লণ্ঠনটা ফের জ্বালাও, ভীম। দেখি গাড়িতে কোথাও পড়েছে নাকি। তখনই ভেবেছিলাম বুড়ো আঙুল ছাড়া ও-আংটি কোথাও বসবে না। যে মোটা-মোটা আঙুল। কেন যে সখ করে পরিয়ে দিতে গেলে!

লণ্ঠন লইয়া গাড়ির আনাচ-কানাচ তন্ন-তন্ন করিয়া খোঁজা হইল। ঐ দিকে আবার সোভান মিঞা হাঁক পাড়িতেছে।

—দাঁড়াতে বলো না একটু। কারুরই যেন তর সয়না। কেন যে সখ করে আংটি পরিয়ে দেওয়া! গেলো হারিয়ে।

ফিরিয়া আসিয়া ম্লান-মুখে মিলি কহিল—পাওয়া গেলো না।

—আমি তা জানতাম।

রিক্ত আঙুলটাতে ডান-হাতের আঙুল বুলাইতে-বুলাইতে মিলি কহিল —কত দাম আংটিটার?

ততোধিক ঔদাসীন্যে মানব বলিল—যৎসামান্য। টাকা ষাট হবে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মিলি কহিল—মোটে? অমন কতো ষাট টাকা তুমি জলে ফেলে দিয়েছো।

—অনেক।

দুইজনে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়া উঠিল। মিলি বসিল মানবের মুখোমুখি সিটটাতে।

কাদার রাস্তায় গাডির চাকা বসিয়া যাইতেছে—ঘোড়া দুইটার পিঠে চাবুক মারিবার জায়গা না-ই বা থাকিল; তবুও গাড়োয়ান রেহাই দিতেছে না। রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে বলিয়া ব্যাঙেরা চারদিক থেকে মহা সোরগোল শুরু করিয়াছে—রাস্তার পরে করবী-গাছের ঝোপে অসংখ্য জোনাকি। ঝিঁ-ঝিঁর আওয়াজে কানে তালা লাগে। কেহ কোনোই কথা কয় না—গাড়ির খোলা দরজা দিয়া ভিজা অন্ধকারে অস্পষ্ট গাছ-পালার দিকে তাকাইয়া আছে।

কতো দুর আসিতেই একটা পাঁউরুটির দোকানে কুপি জ্বলিতে দেখা গেল।

এইবার মিলি কথা কহিতে পারিবে। মানব কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারে সে অস্থির হইয়া তাহাই এতোক্ষণ পরীক্ষা করিতেছিল।

তাড়াতাড়ি সে সামনের সিট ছাড়িয়া মানবের পাশে প্রায় তাহার কোলের উপরই বসিয়া পড়িল। স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল—আংটিটা হারিয়ে ফেলেছি বলে তোমার লাগছে ?

তেমনি উদাসীন হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মানব কহিল—না, কী বা ওটার দাম! অমনি কতো টাকা আমি জলে ফেলেছি।

মিলি বিমর্ষ হইয়া কহিল—আমাকে কি শকুন্তলার মতো আংটি দেখিয়ে পরিচয় দিতে হবে নাকি যে ওটার শোকে মুখ গোমড়া করে বসে থাকবো ?

—মুখ গোমড়া করে কে বসে আছে ?

—তুমি। আমার চেয়ে তোমার ঐ আংটিটাই বড়ো হল নাকি ?

কোলের উপর মিলি মানবের বাঁ-হাতখানি টানিয়া লইল।

হাতের স্পর্শটি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। মানব তাড়াতাড়ি মিলির অভিমানী হাতখানা দুই হাতের মধ্যে নিবিড় করিয়া ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

পথ আর ফুরায় না। কোথা দিয়া যে কোথায় নিয়া চলিয়াছে দিশা পাওয়া ভার। অন্ধকারে সমস্ত কিছু ঝাপসা।

একটা বাঁক নিতেই হু-হু করিয়া হাওয়া ঢেউর মতো তাহাদের ডুবাইয়া ফেলিল। সামনেটা হঠাৎ যেন প্রকাণ্ড একটা আকাশ হইয়া গিয়াছে। কোথাও এতটুকু গাছ-পালার চিহ্ন নাই—একেবারে ফাঁকা।

দুইজনে চোখোচোখি হইল।

মানব কহিল—এই বুঝি নদী ?

মিলি কহিল—চর। জলের আর চিহ্ন নেই। নদী এখন বাঁয়ে বেঁকে গেছে। জোয়ারের সময় ঝির-ঝির করে জল আসে শুনেছি। পায়ের পাতা ডোবে মাত্র। দুয়েকটি নতুন ঘর উঠেছে দেখছি।

শুকনো নদীর সঙ্গে-সঙ্গে কি-একটা বিস্মৃত ব্যথার সুর মানবকে ঘিরিয়া ধরিল। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া ভাবিবার তাহার অবসর নাই। সহসা তাহার গায়ে ঠেলা মারিয়া মিলি কহিল—ঐ, ঐ আমাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আমি ও-বাড়িতে একবার মাত্র এসেছিলাম খুব ছেলে-বেলায়। কি প্রকাণ্ড একেকটা কোঠা, আমরা দস্তুরমতো লুকোচুরি খেলতে পারবো। দেখতে পাচ্ছ?

ঘননিবিষ্ট কতোগুলি গাছের ফাঁকে আবছা করিয়া বাড়ি একটা দেখা যায় বটে। কিন্তু কোথা দিয়া যে সে কোথায় চলিয়াছে মানব কিছুই আয়ত্ত করিতে পারিল না।

শেষকালে গাড়িটা বাড়িরই সিংহ-দরজায় আসিয়া থামিল।

অন্ধকারে মনে হয় যেন রূপ-কথার বিশাল রহস্যপুরী। গাড়ি হইতে নামিয়া মানব একদৃষ্টে বাড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল। রাত থাকিতে এমন সময় কোনোদিন সে বিছানা ছাড়িয়া আকাশের নিচে দাঁড়ায় নাই—তাই যেন সে কিছুই ধারণা করিতে পারিল না। শুধু একটা অকারণ বেদনা তাহার মনকে ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সামনের কম্পাউণ্ডে হীরালালবাবু চটি-পায়ে পাইচারি করিতেছিলেন। মিলি আসিয়া পায়ের উপর গড় হইতেই হীরালালবাবু তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন। পিঠে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিলেন—রাস্তায় কোনো কষ্ট হয় নি?

—বিকেলে আকাশে ভীষণ মেঘ করেছিল। ভাবলাম হল বুঝি কাণ্ড। পিসিমা কোথায়? এখেনে কবে বাগান করলে, বাবা?

দেখাদেখি মানবকেও প্রণাম করিতে হইল।

হীরালালবাবু তাহার মাথায় আশীর্বাদ-হস্ত রাখিয়া কহিলেন—একেবারে ভেতরে চলে যাও। সোজা শুয়ে পড়ো গিয়ে। তোমাদের জন্যে বিছানা তৈরি। ঘর দেখিয়ে দে, ভীম। এক ফোঁটাও যে ঘুমুতে পারোনি মুখের

চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। এখনো দিব্যি রাত আছে—বেশ একটু গড়িয়ে নিতে পারবে।

মিলি কহিল—আমরা এখন চা খাবো, বাবা।

—বিছানায় বসে বসেই খাবেখন। নিরু সব ঠিকঠাক করে রেখেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে আর হিম লাগিয়ো না। নিয়ে যা, ভীম। আলোটা জ্বলিয়েছিস ?

—আর তুমি ?

—আমি আরো একটু বেড়াবো।

ভীম পথ দেখাইয়া নিয়া চলিল।

মিলি মানবের পাশে আসিয়া কহিল—কেমন লাগছে ?

মানবের প্রেতাত্মা যেন উত্তর দিল : ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না।

বারান্দা পার হইয়া ভিতরের দালানে পা দিতেই দেখা গেল পিসিমা কাঠের একটা বড়ো টেবিলের উপর স্টোভ ধরাইয়াছেন। পিছনে পায়ের শব্দ শুনিতেই খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। মিলি প্রণাম করিয়া কহিল—তুমি এতো সকালেই উঠেছ ? বাবাকে লুকিয়ে দু-পেয়ালা চা চট করে দিতে পারবে আমাদের ?

মানব যন্ত্রচালিতের মতো প্রণাম করিয়া উঠিল।

পিসিমা হাসিয়া কহিলেন—ভীম এখন গিয়ে গরু বের করবে। টাটকা দুধে তবে চা হবে। তোমরা ততোক্ষণ গড়িয়ে নাও একটু। এই হল বলে।

—একটু র পেলেই বা মন্দ হতো কী। কী বলো ?

মানব কিছুই বলিতে পারিল না। শূন্যদৃষ্টিতে কোন দিকে যেন চাহিয়া আছে।

মানবের কাছ থেকে সাড়া না পাইয়া মিলি কহিল—গোরা ঘুমিয়ে আছে বুঝি ? ওর জন্যে এয়ার-গান এনেছি একটা। খবরটা ওকে দিয়ে আসি।

স্টোভের উপর কেটলি চাপাইয়া পিসিমা কহিলেন—খবর পেলে তোকে আর ও শুতে দেবে না। কেরোসিন কাঠের বাক্সে প্রকাণ্ড এক মিউজিয়ম বানিয়েছে, তাই নিয়ে এখুনি হুলুস্থুল বাধাবে। আরেকটু সবুর কর। ভোর হোক।

মিলি একটা চেয়ারে বসিয়া জুতার স্ট্র্যাপ খুলিতে-খুলিতে কহিল—আমার কোন ঘর? কোণেরটা? ওঁর?

প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মানব ঘরের দেয়াল পর্যবেক্ষণ করিতেছে।

—ভীম দেখিয়ে দেবেখন। কোথায় গেল ও? তুমি এসো আমার সঙ্গে। এই দিকে।

মানবকে বলিয়া দিতে হইবে না।

১৬

বাহির হইতে দরজা ভেজাইয়া পিসিমা অদৃশ্য হইলেন।

প্রকাণ্ড ঘর—মধ্যখানে স্প্রিঙের খাট পাতা। বলক-দেওয়া দুধের মতো ধবধবে বিছানা—শিয়রে ছোট একটা টিপয়ের উপর বাতির একটা স্ট্যাণ্ড। বাতিটা সদ্যোজাত শিশুর চোখের মতো মিটমিট করিতেছে। নূতন চুনকামে দেয়ালগুলি অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন—হাত ঠেকাইলেই যেন শিহরিয়া উঠিবে।

ঘরের মধ্যে আসিয়া সে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া পড়িল। আর এক পা-ও চলিবার তাহার ক্ষমতা নাই। সে শুইবে, না বাতিটা জোর করিয়া নিভাইয়া দিবে, না, দরজা ঠেলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবে—কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। হঠাৎ নজরে পড়িল ও-পাশের জানালা একটা খোলা—অন্ধকার ফিকে হইয়া আসিতেছে। বাহিরের আলো সে সহ্য করিতে পারিবে না—খেয়াল হইল জানালাটা বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু জানালা বন্ধ করিতে আগাইতে তাহার সাহস হয় না। ভয় করে। স্পষ্ট মনে হয় কে যেন জানালার বাহিরে তাহার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। স্পষ্ট। তাড়াতাড়ি সে দেয়ালের কাছে সরিয়া আসিল। দেয়ালটা ঠাণ্ডা। কাহার চোখের জল দিয়া তৈরি। উঃ, কী হাওয়া। হ্যাঁ সত্যিই তো, কে যেন কাঁদিতেছে।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মানব বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। বালিশে মুখ ডুবাইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া তাহার চোখের দৃষ্টি অন্ধ করিয়া ফেলিল। মনে হইল মৃত্যুবিবর্ণ চোখে শিয়রের বাতিটা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ

করিতেছে। হাত তুলিয়া বাতিটা নিভাইতে যাইতেই ধাক্কা লাগিয়া মেঝেতে পড়িয়া সেটা চুরমার হইয়া গেল।

ঘরের ভিতর কে যেন ঢুকিয়াছে।

বালিশে মুখ ডুবাইয়াই রুদ্ধ ভীত স্বরে মানব প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল : কে?

—আমি পিসিমা। বাতিটা পড়ে ভেঙে গেল বুঝি?

মানব আশ্বস্ত হইল।

—তা যাক। তুমি ঘুমোও। আমি ঝাঁটা এনে কাঁচগুলি জড়ো করে রাখছি। না, না, তোমার উঠতে হবে না।

পিসিমা চলিয়া গেলে মানবের আবার ভয় করিতে লাগিল। বালিশ হইতে কিছুতেই সে মুখ তুলিতে পারিল না।

একমনে মায়ের মুখ স্মরণ করিতে-করিতে আস্তে-আস্তে শরীরের কঠিনতা শিথিল হইয়া আসিল। পিসিমাকে আগেই বলিয়াছিল—জানালাটা বন্ধ করে দিন। হাওয়া তো নয়, তুফান। বাহিরে কোথায় ভোর হইতেছে জানিয়া কাজ নাই। মানব যেন নিমেষে পূর্বজন্মলোকের অন্ধকারে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মিলি একটুখানি শুইতে-না-শুইতেই উঠিয়া পড়িয়াছে।

—পিসিমা, চা?

একমাথা রুক্ষ চুল ও এক-গা এলো শাড়ি লইয়া মিলি দালানে ছুটিয়া আসিল।

পিসিমা কহিলেন—এই তোর ঘুম হল?

—চা না খেলে কি ঘুম হয়? দাও শিগগির। এটা শুধু ফাউ হচ্ছে। চান করে এসে রিয়েল চা খাবো।

পিসিমা কাপএ চা ঢালিতে লাগিলেন : মানব এখনো ওঠে নি বুঝি?

—ওঠাই গিয়ে।

—না, না, ঘুমুচ্ছে।

চায়ে চুমুক দিয়াই কাপটা নামাইয়া রাখিয়া মিলি কহিল—যাই, গোরাকে তুলে আনি।

গোরা নিজেই আসিয়া হাজির। লজ্জায় ও খুশিতে লাল হইয়া মিলির ডান-হাতটা ধরিয়া কহিল—আমাকে এতোক্ষণ জাগাও নি কেন? ভীমের সঙ্গে স্টেশনে যাবো বললাম, মা কিছুতেই যেতে দিল না।

হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়া মিলি কহিল—তোর জন্যে একটা জিনিস এনেছি, গোরা। কী বল দিকি?

গোরা হাসিয়া বলিল—লজেন্সএর শিশি নয় তো? তোমার যেমন বুদ্ধি, হয়তো এক পাত জলছবি, নয় তো একটা হাফ-প্যাণ্ট সেলাই করে এনেছ।

—না রে, দুষ্টু। একটা বন্দুক।

—বন্দুক? গোরার চোখ দুইটা বড়ো হইয়া উঠিল: সত্যি কি আর! খেলনা, না?

—সত্যিকারের বন্দুক দিয়ে তুই কী করবি?

—বা, আমাদের পুকুর-পারে দস্তুরমতো সেদিন নেকড়ে-বাঘ এসেছিল। শেয়ালগুলো তো উঠোনের ওপর এসেই হল্লা করে। তারপর পাখি! পাখির মাংস কোনোদিন খেলাম না, মেজ-দি। যাই হোক, বার করো শিগগির। শব্দ হবে তো?

গোরা মিলির আঁচল ধরিয়া টানাটানি শুরু করিল।

তাহার মা ধমক দিয়া উঠিলেন: আগে মুখ ধুয়ে আয় বলছি। একবাটি গরম দুধ খেয়ে তবে কথা। রোজ সকালবেলা দুধের বাটি নিয়ে আমাকে জ্বালায়।

—আসছি মুখ ধুয়ে। মোটে তো এক বাটি দুধ। সত্যিকারের বন্দুক পেলে কড়া-শুদ্ধু খেয়ে ফেলতে পারি।

রোদ উঠিয়াছে। হীরালালবাবু বাগান তদারক করিতে বাহির হইয়াছেন।

বাগানের মালীকে ডাকিয়া কহিলেন—জেলে ডেকে আনো জলদি। কিছু মাছ ধরাতে হবে। মৃগেলের বাচ্চা নিশ্চয়ই এখন বড়ো হয়েছে। পেঁপে কিছু পাকলো কি না দেখি গে।

গোরার মিউজিয়ম দেখা সারা হইল। যত রাজ্যের ঝিনুক, কড়ি, শামুক, লাট্টু, ভাঙা কাঁচ, পাঁচ-ফলা ছুরি, শ্মশান থেকে কুড়াইয়া আনা হাড়ের টুকরো। সমস্ত কিছুর সঙ্গেই গোরা একটা করিয়া গল্পের লেজুড় জুড়িয়াছে—তাহাতে যেমন কল্পনার বিভীষিকা আছে, তেমনি আছে মজা।

—এই যে ঘোড়ার খুর দেখছ মেজ-দি, এটা হচ্ছে চৈতকের। প্রতাপাদিত্য যে একসময় ঐ বালির রাস্তা ধরে বেড়াতে এসেছিলেন। আর এই যে পেতলের আংটিটা দেখছ ওটা সতীর বাঁ-পায়ের কড়ে আঙুলে ছিলো। বিষ্ণু যখন তার চক্র দিয়ে সতীকে কেটে ফেললেন, আংটিটা পড়লো এসে আমাদের কলাবাগানের ঝোপে। ওখানে একটা মন্দির করা উচিত—

এমনি সব গল্প।

কে-এক পাড়ার সাথী গোরাকে ডাকিতে আসিয়াছে। পেয়ারা গাছের ডাল কাটিয়া ডাং বানাইতে হইবে। এয়ার-গানটা লইয়া লাফাইতে-লাফাইতে গোরা বাহির হইয়া গেল।

এ কেমন ধারা ঘুম! অবারিত মাঠের উপর এমন স্বর্যোদয় সে কবে দেখিয়াছে? রাতের আকাশের তারার মতো কতো পাখির কতো রকম স্বর! মোটর বাইকের ঝকঝকানি শুনিতে-শুনিতেই তো কান দুইটা ঝালাপালা হইয়া গেল। বিশ্রামেও একটা শ্রী থাকা উচিত!

ঘাটলার কাছে হিঞ্চে শাকের ভিড় জমিয়াছে। নিচের ধাপে বসিয়া দুই পায়ে মিলি তাহা সরাইয়া দিতে লাগিল। অনেক দিন সে সাঁতার কাটে নাই। সে যে ডুব-সাঁতারে পুকুরটা পার হইয়া যাইতে পারে আর

সবাইর চক্ষু এড়াইয়া মানব তাহা দেখিয়া গেলে পারিত। কিন্তু জলে বেশিক্ষণ থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

দরজা এখনো খোলে নাই। চুল না আঁচড়াইয়াই মেঝের উপর ভিজা পায়ের দাগ ফেলিতে-ফেলিতে মিলি নিঃশব্দে দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ক্লান্ত একটা পশুর মতো মানব তখনো ঘুমাইতেছে। ঘরে এতক্ষণ রোদ আসে নাই বলিয়াই। মিলি জানালা দুইটা খুলিয়া মানবের দিকে তাকাইল। তবু সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল না।

মিলি নিঃশব্দে তাহার শিয়রে আসিয়া বসিল। বালিশের উপর রোদের ও-দিকে মুখ তাহার কাৎ হইয়া আছে—মিলি নিচু হইল—গাঢ় নিশ্বাসের শব্দে সে মাঝপথে হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। ঘুমে মানুষের মুখ এমন করুণ ও অসহায় দেখায় নাকি? মানব বোধহয় এখন কোনো দুঃখের স্বপ্ন দেখিতেছে। একান্ত মমতায় মিলি তাহার কপালে হাত রাখিল।

স্পর্শে জাদু আছে। মানব চোখ মেলিয়াছে।

মোমের মতো পরিষ্কার বিছানা—সাবানের মতো নরম। জানালার উপরে ঐ বুঝি সেই সিঁদুরে আমগাছটা দেখা যায়—ঝড়ের সন্ধ্যায় যাহার তলায় সে মায়ের সঙ্গে আম কুড়াইয়াছে। সেই বুড়া নারকেল গাছটা বয়সের ভারে বাঁকা হইয়া এখনো বাঁচিয়া আছে। শিয়রে কে বসিয়া? মা নয় তো?

না, মিলি। মা হয় তো কোনো সকালবেলা তাহাকে জাগাইতে আসিয়া এমনি শিয়রে বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইয়া থাকিবেন। স্পষ্ট তাহার মনে পড়ে না বটে, কিন্তু এমন ঘটনা ঘটে নাই-ই বা কে বলিল?

মানব ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল: অনেক বেলা হয়ে গেছে যে।

মিলি হাসিয়া কহিল—না, তোমার জন্য বসে আছে।

—তুমিও এতোক্ষণ ঘুমুচ্ছিলে নাকি? আমাকে জাগাতে পারো নি?

—জাগাবো কি? তোমার স্বাস্থ্যের যে ব্যাঘাত হবে। আমিই বরং সাত-সকালে পুকুরে নেমে স্বাস্থ্যক্ষয় করলাম।

মানব বিছানা হইতে এক লাফে নামিয়া পড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিল। সেই! অবিকল! অতীতের স্মৃতির অন্ধকারে আর তাহাকে হাতড়াইয়া ফিরিতে হইবে না। ভিতরের বারান্দায় কড়িকাঠের ফাঁকে-ফাঁকে খড়কুটা গুঁজিয়া সার বাঁধিয়া সেই চড়ুই-পাখিদের বাসা। অগণিত সন্ততির ভিড়। সব সেই—খালি পেন্সিলের রেখার উপর রঙ বুলানো হইয়াছে। রান্নাঘরের সেই বাঁধানো দাওয়া—ঐখানটার মেঝে খুঁড়িয়া সে মার্বেল-খেলার গাব্বু করিয়াছিল—সেটা এখনো অটুট আছে। ঐ থামটায় ঠেস দিয়া না বসিলে তাহার খাওয়া হইত না—এই ডালিম-গাছটার তলায় সে একবার পড়িয়া গিয়া বিছানায় সাত দিন শুইয়া ছিল। তাহারই মতো কে-একটি ছেলে—এই বোধকরি গোরা—পেয়ারা গাছটায় দোল খাইতেছে। সেই ভেলু কুকুরটা এখন নিশ্চয় আর বাঁচিয়া নাই।

এই বাড়ি হইতেই একদিন সে মায়ের হাত ধরিয়া বাবার সঙ্গে শূন্য হাতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সেই রাস্তা—সাদা মাটির রাস্তা—কতোদূর গিয়া নদীর চরের সঙ্গে সমতল হইয়া গিয়াছে।

হীরালাল—হ্যাঁ, তাহার দাড়ি ছিল—নামটা মনে পড়ে বটে। নোয়াখালি—বাঙলার মানচিত্রে নয়, মনেরই কোথায় যেন নামটা লুকাইয়া ছিল। অথচ দুয়ে মিলিয়া যে এমন চেহারা নিয়া দাঁড়াইবে কে জানিত।

মিলি ডাকিয়া বলিল—তুমি এখুনি বেরুচ্ছ কি রকম? চা খাবে না?

ম্লান হাসিয়া মানব কহিল—একটু মর্নিং-ওয়াক করে আসি।

—না, না, রোদে আর মর্নিং-ওয়াক নয়। কোঁচড় ভরিয়া একগাদা ফুল লইয়া হীরালালবাবু পথের মাঝখানে বাধা দিলেন: স্নান করে নাও আগে। এসো। সামনের এক ভদ্রলোককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

বেটারা মাছ কিছুই পেল না হে বিপিন। দু-চারটে শোল আর পুঁটি। বাজারটা একবার ঘুরে এসো।

হীরালালবাবুকে দেখিতে প্রায় ঋষির মতো। দাড়িগুলি পাকিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া আছে। কণ্ঠস্বরটি অকারণে কোমল! দেখিয়া ভক্তি হইবারই কথা। কিন্তু মানবের মন গোঁ ধরিয়া বাঁকিয়া বসিল। তাঁহার সঙ্গে একটা সঙ্ঘর্ষ তাহাকে বাধাইয়া তুলিতেই হইবে।

তাই বাড়ির মুখে পা না বাড়াইয়াই সে কহিল—নতুন সহরটা একবার ঘুরে আসি।

—এ আবার সহর! নদীতে কিছু আর এর রেখেছে? সেই দীঘিই বা কই, সেই সব ঝাউগাছের সারই বা কোথায়? এসো, এসো, সহর হবেখন।

মানব তবু অবাধ্যতা করিতে চায়।

কিন্তু দুয়ারের পাশে দাঁড়ানো মিলির দুইটি চক্ষু তাহাকে বাধা দেয়। কী ভাবিয়া মন তাহার খুশি হইয়া উঠে।

চা খাইতে-খাইতে মানব মিলিকে বলিল—ভারি সুন্দর বাড়ি। আমার এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না।

হীরালালবাবু কহিলেন—থাকো না যদ্দিন খুশি। কিন্তু এ-বাড়ির কী চেহারা যে ছিলো আগে! বহু পুরনো আমলের বাড়ি—আমিই কিনে নিয়ে এর ভোল ফিরিয়েছি।

মানবের গা আবার জ্বলিতে থাকে। সে গম্ভীর হইয়া কহিল—পুরনো আমলের বাড়িকে পুরনো করেই রাখা উচিত। সংস্কার করে তার মর্যাদাহানি করা পাপ।

কথায় একটা রূঢ়তা আছে। কিন্তু বৃদ্ধ প্রসন্ন হাসিতে ললাট ও চোখ উদ্ভাসিত করিয়া বলিলেন—তা হলে এ-বাড়িতে বাস করতাম কি করে?

—বাস করবেন কেন? বাস করতে কে বলেছে?

মিলি কহিল—সামন্য একটু বিরক্ত হইয়াই কহিল—পয়সা দিয়ে কিনে তা হলে শুধু-শুধু বাড়িটাকে খাড়া করে রাখা হবে ?

—না, না, তা বলছি না। মানব চায়ের কাপএ মুখ ডুবাইল।

হীরালালবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

আবার কথা উঠিল কলিকাতার জীবনযাত্রা নিয়া। তাহার কল-কারখানা, কুশ্রিতা-কোলাহল—সব কিছুর উপর হীরালালবাবুর অমানুষিক বিরক্তি। মানব জোর গলায় কহিল—সহরে দিবারাত্র যে উদ্দাম শক্তির ঝড় বইছে তা আপনাদের বুড়ো হাড়ে সইবে কেন ? যারা অকর্ম্মণ্য হচ্ছে, তারাই চায় শান্তি।

উত্তর দিল মিলি—সুরে কোথায় একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে : এই না ষ্টিমারে আসতে-আসতে তুমি এরোপ্লেন ছেড়ে গরুড গাড়ির ভক্ত হয়ে উঠেছিলে। স্টেশনে নেমে বাবা, উনি এক গরুর গাড়ি ঠিক করে বসলেন। নামানো মুস্কিল।

হীরালালবাবু আবার হাসিয়া উঠিলেন।

মানব এই বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের সুযোগ কামনা করে—মিলির সঙ্গে সে তর্ক করিতে বসে নাই। হীরালালবাবুর মনে কোথায় এতটুকু জ্বালা নাই, স্বভাবে নাই বিন্দুমাত্র অস্থিরতা। সব-কিছুর প্রতি তাঁহার নিরুদ্বেগ প্রশান্ত দৃষ্টি।

না হইলে—তাহার মেয়ের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ হইয়া এত দীর্ঘ পথ সে স্বচ্ছন্দে চলিয়া আসিল, তিনি এতটুকু আপত্তি তুলিলেন না। চাকরকে দিয়া বিছানা পাতাইয়া রাখিলেন। ঘরে আসিয়া পা দিতে-না-দিতেই অভ্যর্থনার ঘটা শুরু হইয়া গেল। তাঁহার মেয়ের এই অন্তরঙ্গতার প্রতি তিনি এতটুকু ভ্রূকুটি করিলেন না।

হীরালালবাবু কহিলেন—বেশ তো, গরুর গাড়ি চড়ে একদিন সোনাপুর বেড়িয়ে এসো। তুইও যাবি নাকি মিলি ?

মৃদু হাসিয়া মিলি কহিল—তার চেয়ে গোরার কাঠের বাক্সের গাড়ি চড়ে গেলেই হয়!

হীরালালবাবুর হাসির বিরাম নাই।

ঘাটের পথটুকু চলিতে-চলিতে মানব কহিল—বিয়ের পর আমরা এ বাড়িতে এসে কয়েকদিন থাকবো। কি বলো?

সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া মিলি গভীর সুখস্বাদ অনুভব করিল। কহিল—কেন ভেনিস?

—এখানে থেকে-থেকে যখন শ্রান্ত হয়ে উঠবো তখন। তোমার সঙ্গে-সঙ্গে আমি এ-বাড়িটারো প্রেমে পড়ে গেছি।

মিলি কহিল—চমৎকার বাড়ি।

—সত্যি, চমৎকার। তোমার বাবার কাছে কথাটা আজ রাত্রেই আমি পাড়ি।

দুষ্টু হাসিয়া মিলি বলিল—এখানে থাকবার কথা তো?

—কায়েমি হয়ে থাকবার কথা। কিন্তু এমন হেঁয়ালি করে নয়। সোজা স্পষ্ট কথায়।

—না, না, সে ভারি বিশ্রী হবে। মিলি কহিল—তুমি অমন ব্যস্ত হয়ে কিছু তাঁকে বলতে যেয়ো না। তাঁকে বুঝতে দাও। তিনি নিজের থেকেই বলবেন একদিন।

মানব আপত্তি করিল: নিজের থেকে বলবার মতো অসহিষ্ণু তিনি হবেনই না কোনোদিন।

মিলি গম্ভীর হইয়া কহিল—আমরাও না-হয় একটু সহিষ্ণু হলাম। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদটা একটু দীর্ঘ হলে ক্ষতি কি। বাবাকে আরো খানিকটা বুঝতে দিয়ে মত চাইলেই ব্যাপারটায় আর বিস্ময় থাকবে না। এ-বাড়িতে থাকতে চাও, থাকো—যদ্দিন মন চায়।

বিকেলে মানব বলিল—চলো, গাঁয়ের পথে বেড়িয়ে আসি একটু।

মিলি কহিল—তুমি যাও একা। রাত্রে আমি রান্না করবো ভাবছি।
হীরালালবাবু কহিলেন—আয় না একটু বেড়িয়ে। অন্ধকার হবার আগে ফিরে এলেই চলবে।
—তা আমি যেতে পারি, দাঁড়াও। জুতো পরে আসি।
আসিয়া দেখিল, বাবার কথা উপেক্ষা করিয়াই মানব চলিয়া গিয়াছে।
মানব যখন ফিরিল তখন রাত অনেক। শ্মশান হইতে মড়া পুড়াইয়া আসিবার মতো চেহারা। ঘর-দোর সব বন্ধ, কোথাও একটা আলো জ্বলিতেছে না। বাড়িটা যেন একটা বিরাটকায় দৈত্যের মৃতদেহ। চাহিয়া থাকিতে ভয় করে।
মানব অন্দরের উঠান পার হইয়া বারান্দায় উঠিয়া দরজায় করাঘাত করিয়া ডাকিল : মিলি।
মিলি দরজা খুলিয়া দিল। বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া গায়ে একটা চাদর টানিয়া দিয়া মোমের আলোতে এতক্ষণ সে বই পড়িতেছিল। ঘরের কোণে একটা লণ্ঠনও নিবু নিবু করিতেছে।
মিলির কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তি : এ কি তুমি কলকাতার রাত পেয়েছ ?
—মোটে নয়টা। এরি মধ্যে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া সব চুকে গেছে?
—চুকে গেছে মানে ? সবাইর এখন একঘুমের পর পাশ ফেরবার সময়। চলে এসো রান্নাঘরে। তোমার জন্যে এখনো আমার খাওয়া হয় নি।
হাত-পা ধুইয়া পিড়েতে বসিয়া মানব কহিল—তুমিও আমারই সঙ্গে একই থালায় বসে যাও না।
মিলি মুখোমুখি বসিয়া বলিল—ও আমার অভ্যেস নেই। এতোক্ষণ কোথায় ছিলে ?
—কোথায় আবার থাকবো। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। খুব ভালো লাগছিল।
—চেহারাখানা তো 'গাবুরের' মতো হয়েছে।

—চেহারা দেখে কী আর বোঝা যায় বলো। এই বাড়ির চেহারা দেখেই কি বোঝা যায় এর পেছনে কান্নার কী করুণ ইতিহাস আছে?

দুই গরস মুখে তুলিয়াই থালাটা ঠেলিয়া দিয়া মানব কহিল—আমার খিদে নেই, মিলি।

—খিদে নেই মানে?

—শরীরটা ভালো লাগছে না।

—কলকাতায় তো তোমার এই ফ্যাশান ছিলো না।

—সত্যি বলছি, উলটে আসছে।

মুখ নামাইয়া করুণ স্বরে মিলি কহিল—আমি রান্না করেছি কি না, তাই।

—তুমি রান্না করেছ নাকি? ম্লান হাসিয়া মানব ভাতের থালাটা ফের টানিয়া আনিল।

—কী করবে, গরিবের বাড়িতে অভ্যর্থনার ত্রুটি কিছু ঘটবেই।

—বিনয়ে তুমি মহাজন।

মানব খাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

কোথায় যেন তাল কাটিয়া গিয়াছে। আলাপ আর জমিতে চায় না। ভাতগুলি থালার চারদিকে ছিটাইয়া ফেলিতে-ফেলিতে মিলিও উঠিয়া পড়িল।

তোলা-জলে আঁচানো সাঙ্গ করিয়া মানব কহিল—অন্ধকারে মাঠে একটু বেড়াবে, মিলি?

—আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আর দাঁড়াতে পারছি না। বলিয়াই সে দ্রুত পায়ে ঘরে গিয়া বিছানায় ডুব মারিল। যেমন খাওয়া, তেমনি ঘুম।

মানব বারান্দায় পাইচারি করিতেছে। ঘরে আসিয়া যে একটু গল্প করিবে তাহাও তাহাকে আজ মনে করাইয়া দিতে হইবে নাকি? মোম জ্বালাইয়া আবার সে পড়িতে চেষ্টা করিল। সারি-সারি অক্ষরে সে কান পাতিয়া খালি মানবের পদশব্দ শোনে।

বিছানা ছাড়িয়া শেষে তাহাকে হার মানিতে হইল। বাহিরে আসিয়া মানবকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—ঘুমুতে যাবে না? কিন্তু ভালো করিয়া তাহার চোখের দিকে চাহিতেই মিলি অবাক হইয়া গেল।

শুকনো, রুক্ষ চুল। মুখাভাসে কঠিন পাণ্ডুরতা। চেহারা দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত পীড়িত ও পরিশ্রান্ত বলিয়া মনে হয়।

মানব তাহার কাছে একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল—তোমাদের এ-বাড়িতে ভূত আছে, মিলি?

—ভূত! মিলি হাসিবে না ভয় পাইবে কিছু বুঝিতে পারিল না।

মানব বিমর্ষমুখে কহিল—আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই এসো।

—কেন, এই না তুমি এ-বাড়ির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলে।

—না, না, এই বিশ্রী জায়গায় একা-একা কতো দিন থাকা যায় বলো।

—একা-একা নাকি?

—প্রায়। আমার ঘরটা তো ও-দিকে, না?

—তুমি এখুনিই শুতে যাবে নাকি?

—তোমার তো ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছো কি করে?

—না, এবার শোব।

মিলি দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

আবার সেই ঘরে মানবকে রাত্রিযাপন করিতে হইবে। চারপাশের দেয়ালের চাপে দম বন্ধ হইয়া আসে। দুই চক্ষু মেলিয়া ধরিয়া সে অন্ধকার দেখে।

শেষ রাত্রে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া হীরালালবাবু সেতার বাজান। মানবের ঘুমের মধ্যে স্বরটা মিশিয়া যায়। ঘুমের মধ্যেই মনে হয় তাহার মা যেন এই বাড়ির কক্ষে-কক্ষে কাঁদিয়া ফিরিতেছেন।

১৭

মানব পাঁচ দিনের বেশি টিকিতে পারিল না। এই পাঁচ দিনে সে শুকাইয়া গিয়াছে—কাল রাত থেকে জ্বর-ভাব। ইহার আগে কোনো-দিন তাহার শরীর খারাপ হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। মিলিকে সে কহিল—এদিকে-ওদিকে আমার জামা-কাপড় জিনিস-পত্র সব ছড়িয়ে আছে। একটু গুছিয়ে দাও দয়া করে।

—কেন?

—আজকেই আমি এখান থেকে পালাবো। আমার ভালো লাগছে না।

—কী ভালো লাগছে না? মিলি কুণ্ঠিতস্বরে কহিল—আমাকে?

—তোমাকে খুব বেশি ভালো লাগছে বলেই তো পালাচ্ছি। শরীরটাই এখানে ভালো থাকলো না।

—তুমি এ-কদিন যে অনিয়ম করেছ।

মানব হাসিয়া কহিল—বেশি-রকম নিয়মে থেকে। কলকাতায় গিয়ে দুদিন মোটর-বাইক হাঁকালেই সেরে যাবে।

মিলি মানবের কাছে একটু সরিয়া আসিয়া কহিল—কলিকাতায় গিয়ে ভালোই থাকবে তা হলে।

—আশা করি। হ্যাঁ—আমার স্মেলিং-সল্টের শিশিটা খুঁজে পাচ্ছি না। গোরা সেদিন ওটা চাইছিল। হয়তো ওটা ওর মিউজিয়মে জমা হয়েছে।

—দেখি।

মিলি অনেকক্ষণ আর দেখা দিল না।

কথাটা হীরালালবাবুর কানে উঠিল। তিনি কহিলেন—জোর করে

তোমাকে এখানে বেঁধে রাখি কী করে? তোমার এখানে যে নিত্য-নূতন অসুবিধা হচ্ছে তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।

মানব মুখের উপরেই কহিল—সে-কথা সত্যি। তবে অসুবিধেটা যে নিতান্তই শারীরিক আমার কপালে হাত দিয়ে বুঝতে পারবেন।

হীরালালবাবু তাহার কপালে হাত রাখিয়া বলিলেন—এ কী! তোমার দেখছি দিব্যি জ্বর হয়েছে। তুমি যাবে কি রকম?

কি একটা কাজে মিলি এই দিকে আসিয়াছিল; হঠাৎ মানবের চোখে পড়িয়া যাইতে সে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হীরালালবাবু তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন—মানবের জিনিস-পত্র আর গুছিয়ে দিতে হবে না। একেবারে ওকে বিছানায় চালান করে দে। দিব্যি জ্বর হয়েছে দেখছি।

মানব হাসিয়া কহিল—সেই জন্যেই তো বিছানা-পত্র নিয়ে পাড়ি দিচ্ছি। রোগে ভুগে অসুবিধের চূড়ান্ত হোক আর-কি।

মিলি চলিয়া যাইতে-যাইতে রুক্ষস্বরে কহিল—অসুখ করলে এখেনে ওঁর যোগ্য চিকিৎসা হবে নাকি? ওঁকে দেখবার মতো এখানে ডাক্তার আছে?

মানব কহিল—চিকিৎসা করবার ডাক্তার আছে কি না জানি না, কিন্তু সেবা করবার একটিও নার্স এখানে পাওয়া যাবে না। সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

হীরালালবাবুও আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। বড়োলোকের বংশধরকে লইয়া পরে বিপদে পড়িতে হয় মিলির কথায় সেই আভাস পাইয়া তিনি থামিয়া গেলেন।

মানব অনেকক্ষণ ধরিয়া মিলিকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে, নিভৃতে সে একটি-বারো ধরা দিতেছে না। কাপড় কুঁচাইয়া আলনাতে সাজাইয়া রাখিয়া এখন সে পিসিমার সঙ্গে তরকারি কুটিতে বসিল। সেখানেই গল্পের

আসর জমাইতে মানব আসিয়া জলচৌকির উপর বসিতেই মিলি উঠিয়া পড়িল : যাই, চুলটা বেঁধে আসি গে।

মনে-মনে মানব খুশি হইল। সে কলিকাতা যাইবে—এই বেগের মুখেই তাহার মন হাওয়ার মুখে তুলার মতো উড়িয়া চলিয়াছে। ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো এই বাড়িটা যে এতদিন তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল, মুহূর্তে তাহা তাসের বাসার মতো ঝরিয়া পড়িল। ইহার জন্য তাহার মায়া নাই—পচা জায়গায় নদীর শ্মশান বুকে লইয়া চিরকাল জাগিয়া থাকুক! এইখানে কোনোদিনই সে আর মরিতে আসিবে না। কতো বাসা ছাড়িয়া কতো নূতন নীড়ের সন্ধানে তাহার বেগ-চপল ডানা প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে—মাটি কামড়াইয়া গাছের শিকড়ের মতো পড়িয়া থাকিতে তো সে আসে নাই।

মানব উঠিয়া পড়িয়া কহিল—আমাকেও তা হলে উঠতে হল, পিসিমা।

মৃদু হাসিয়া পিসিমা বলিলেন—জানি।

পুবের দিকের কোণের ঘরটায় জানলার কাছে মেঝের উপর মিলি বসিয়া আছে। হাতে একটি চিরুনি আছে বটে, কিন্তু চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো। সন্ধ্যার আকাশ তাহার আয়না।

মানব কাছে আসিয়া বসিল—এতো কাছে বসিয়াও স্পর্শ না করাটি মানবের ভারি ভালো লাগে।

মানব কহিল—আমি চলে যাচ্ছি বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে?

মিলি হাসিয়া উঠিল : ভীষণ। বুকটা ফেটে যাচ্ছে একেবারে।

—তা যাচ্ছে না জানি। কিন্তু আমাকে থাকতেও তো একটিবার বলছ না।

—যে-অনুরোধ তুমি রাখবে না আমি তা করতে যাবো কেন?

—কি করে তুমি জানো যে তোমার অনুরোধ আমি রাখতাম না?

—সে আমি জানি। আমাকে আর তা বলে দিতে হয় না।

—তুমিও আমার সঙ্গে চলো না।

—বয়ে গেছে। আমি দেওঘরে ছোটকাকার বাড়িতে যাবো ভাবছি। এখানে একা-একা আমারো মন টিঁকবে কি করে? বাকি ছুটিটা সেখানেই কাটাবো কোনোরকমে।

—কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যাবো বলে আমার মন ভালো লাগছে না।

ঠোঁট উলটাইয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মিলি কহিল—ছাই!

মিলির চুলে হাত রাখিয়া মানব কহিল—সোনা। তোমার জন্য আমার আরো বড়ো দুঃখ সহ্য করতে সাধ হয় মিলি। তোমার বাবাকে কথাটা আজ বলেই ফেলি যা হোক করে। আপত্তি যদি তোলেন, তবে অন্ধকারে গা ঢেকে দুজনেই না-হয় বেরিয়ে পড়বো।

—বাবা বাধা দেবেন না—বাধা দেবার কিছু নেই।

—তাই যদি হয় মিলি—মানব কী করিবে কিছু বুঝিতে পারিল না।

—তাই যদি হয়—মিলি তাহার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া কহিল—তুমি আরো দুটো দিন এখানে থাকো। ছোট খোকার মতো আমার কোলের কাছে চুপচাপ শুয়ে থাকো, আমি তোমাকে দু-দিনে ভালো করে দেবো।

মিনতির সুরে মানব কহিল—কিন্তু কলকাতার ডাক আমাকে অস্থির করে তুলেছে।

—মিলি আবার চুপ করিয়া গেল।

মানব তাহার পায়ের পাতাটি মুঠির মধ্যে তুলিয়া লইয়া কহিল—এই স্যাঁতসেঁতে জায়গাটা আমাকে আর পোষাচ্ছে না। পুকুরে স্নান করে শেষকালে ম্যালেরিয়া ধরুক, তুমি এই চাও?

মিলি বলিল—আর আমাদেরই কি-না গণ্ডারের চামড়া! মশা কিছুতেই হুল ফোটাতে পারে না!

—কে তোমাকে থাকতে বলছে? চলো না আমার সঙ্গে। এই নির্জনতায় তুমি যে হাঁপিয়ে উঠবে।

—এই না তুমি বলতে আমরা এখানে এসে বসবাস করবো।

—কোন দুঃখে ?

—তবে কোথায় ?

—ইউরোপে। কাজ করতে হবে তো!

—কী কাজ ?

—সে পরে ভেবে নেব। ভীমকে একবার বলে রাখো না গাড়িওলাকে বলে আসবে।

—তুমি যেন এখুনি বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচো।

—যাবার একবার নাম করলে আমি আর বসে থাকতে পারি না।

—তুমি আমার কাছে একটা ধাঁধা। কখন কী যে তুমি চাও, কী যে তুমি চাও না, বোঝা দায়।

—তবে এটা ঠিক মিলি, এই গ্রাম্য নির্জনতা আমি চাই না। এ তো শান্তি নয়, স্থবিরতা। এখনো এতো শ্রান্ত হইনি যে পাখা গুটিয়ে বসে থাকবো।

মিলি ঠোঁটের প্রান্তটা একটু কুঁচকাইল। কহিল—ছাড়ো, উঠি, বাবার জন্যে রাতের খাবার তৈরি করতে হবে। আমাকে হয় তো খুঁজছেন।

—হ্যাঁ, আমিও ভীমচন্দ্রের শরণাপন্ন হই।

মানবের এই বেগের ক্ষুধাই মিলিকে সম্প্রতি সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা, সেই প্রখরভাষিণী বিলাসিনী নর্তকী—মানব যাহাকে লইয়া মুগ্ধ দিন-রাত্রি ভরিয়া আপনাকে বিকীর্ণ করিতে চায় মিলিকেও সে হয়তো এই একটি বিশেষ বেশেই সাজাইতে চলিয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনে যে এই দূরবিস্তৃত মাঠের একটি গভীর প্রশান্তি আছে তাহা হয়তো তাহার চোখে পড়ে নাই।

তাই মানবকে মিলির মনে হয় অস্থিরচিত্ত, দুর্বার :

আর মিলিকে মানবের মনে হয় লঘু, ভীরু ও সংশয়ী।

কেনই বা আসা, দুই রাত্রি না পোহাইতেই দৌড়! এই, 'চমৎকার বাড়ি', এই আবার দম বন্ধ হইয়া উঠে! এই, 'মন্থরতম মুহূর্ত', তক্ষুনি আবার ঝড়ের সন্ধ্যায় দুই পাখা বিস্তার করিয়া ছোটা! মানব চায় বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, বেগের আবর্ত, প্রকাশের প্রখরতা। মিলি শিহরিয়া উঠে। প্রাচুর্যে ও প্রগলভতায় কেহ ফের মানবকে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেই তাহার অতল-শয়ন! ইউরোপে গেলে—ইউরোপে একদিন সে যাইবেই—মিলি কোথায় পড়িয়া থাকিবে! কী তাহার আছে! দুইটি মাত্র কালো চোখ ও দুইটি মাত্র ভীরু করতল!

এইখানে আসিয়া বসিয়া-বসিয়া তাহার তরকারি কোটা ও খাটের উপর হামাগুড়ি দিতে-দিতে বিছানা পাতা। কাল সে আবার ময়লা ন্যাকড়া দিয়া কালি-পড়া লণ্ঠন সাফ করিয়াছে। মানব ভাবে মাছের ঝোলে তাহার নূনের পরিমাণ ঠিক হইয়াছে কি না দেখিবার জন্যই কি সে এখানে আসিয়াছিল নাকি? মিলি যেন কোমল লতা, নিকটের আশ্রয়প্রার্থিনী—নিদারুণ সর্বনাশের আনন্দে দগ্ধ হইবার তার প্রাণ নাই। সে বড় বেশি পরিমিত, তাহার শরীরে অধিকমাত্রায় মাটির কমনীয়তা!

তবুও বিদায় নিবার আগে দরজার কাছে নিভৃতে যখন দুই জনে শেষবার দেখা হইল, মনে হইল এত সুন্দর করিয়া কেহ কাহাকেও ইহার আগে কোনোদিন যেন দেখে নাই। দুই জনের মাঝখানে করুণ ও ক্ষীণ একটি বিচ্ছেদের নদী বহিতে শুরু করিয়াছে—সমস্ত পরিচয় অতিক্রম করিয়া একটি অজানা ইশারা!

মানব কহিল—যাই। তোমার এস্রাজ আমি গিয়েই পাঠিয়ে দেবো।

মিলির চোখে বেদনার নম্র সুষমা: আমি দেওঘরে গেলে একবার এসো। ছোটমামা হয় তো কুমিল্লা থেকে শিগগির আসবেন।

—কবে যাবে জানিয়ো।

—তার আগে জানিয়ো তুমি কেমন আছো। গিয়েই চিঠি লিখো কিন্তু। বুঝলে ?

—হ্যাঁ গো।

—কী বুঝলে ?

—গিয়েই যেন দেখি তোমার চিঠি আগে থেকে হাজির !

—সত্যি, না, চিঠি লিখো। আমাকে ভাবিয়ো না। তোমার প্রথম চিঠি পেতে আমি উৎসুক হয়ে থাকবো।

—বানান ভুল ধোরো না যেন। আমি কিন্তু কাঠখোট্টা—

—নিতান্তই। তাই তো যাবার আগে—

মিলির চোখের পাতা লজ্জায় কাঁপিয়া-কাঁপিয়া বুজিয়া আসিল।

মানব কহিল—তুমিই বা কোন যাবার আগে—

—আচ্ছা।

মিলি তাড়াতাড়ি নিচু হইয়া মানবের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে যাইতেই মানব তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া বুকের কাছে সাপটিয়া ধরিল। মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল—তুমি বড্ড বেশি পবিত্র, মিলি। ম্যাডোনার চেয়ে সুন্দর তোমার মুখ।

—এ-মুখ তুমি আরো সুন্দর করো।

এমন সময় হীরালালবাবু বাহিরের বারান্দা হইতে এ-দিকে আসিতে-আসিতে কহিলেন—গাড়োয়ানটা ডাকাডাকি লাগিয়েছে।

তারপর ঘরে ঢুকিয়া : তোমার শরীর কেমন বুঝছ ?

—ভালোই। বিবর্ণমুখে মানব বাহির হইয়া গেল।

গাড়িতে উঠিয়া খোলা দরজা দিয়া বাড়ির সামনেকার প্রাঙ্গণ ও বাগান, তারপর বারান্দা ও জানালা তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিল—মিলির সেই প্রার্থনাকাতর ভর-ভর চক্ষু দুইটি আর দেখা গেল না।

মূর্তিমান বিভীষিকার মতো বাড়িটা দাঁড়াইয়া আছে।

তারপর

১৮

স্টেশনে এতো আগে না আসিলেও চলিত। গাড়োয়ানটার এতো তাড়া দিবার কী ছিলো! সেই দোদুল্যমান মুহূর্তটিতেই বা হীরালালবাবুর আবির্ভাব হয় কেন—ভাগ্যের কোন বিধানানুসারে! মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড রাজ্যপতন হইয়া গেল।

তাহার গায়ে এখনো মিলির গায়ের গন্ধটি লাগিয়া আছে। চোখ দুইটিতে সলজ্জ ও সাগ্রহ একটি প্রতীক্ষা কুয়াশার মতো দুলিতেছিল। তাহার প্রণাম করিবার ভঙ্গিটিতে কী সুন্দর ছন্দ! আকস্মিক ছন্দপতনের মধ্যেও কবিত্ব কম ছিল না।

তাহাকে একটুও আদর করা হইল না। কত কথা অনর্গল বলিবার ছিল! এঞ্জিনটা খালি তখন হইতে ফুঁসিতেছে—ছাড়িবার নাম নাই। নামিয়া পড়িলে কেমন হয়? মিলি হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, এতোক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একলা শুইতে তাহার ভয়-ভয় করিতেছে কি না কে জানে! মাল-পত্র স্টেশন-মাস্টারের জিম্মায় রাখিয়া এই পথটুকু সে অনায়াসে হাঁটিয়াই পার হইতে পারিবে। গাড়ি না পাইলে তো তাহার বহিয়া গেল। বরং এই ফাঁকে রাতই আরো একটু গভীর হইবে। চুপি-চুপি সে মিলির দরজায় গিয়া টোকা মারিবে। মিলি জানে যে রাত করিয়া ফিরিয়া আসার তার অভ্যাস আছে। দরজা খুলিয়া দিতে সে দ্বিধা করিবে না। তারপর—

মানব সর্বাঙ্গে ঘুমের মতো গাঢ় একটি সুখাবেশ অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু সত্যিই নামিয়া পড়িবে কি-না—বা নামিয়া পড়িবার

আগে কুলি একটা ডাকিতে হইবে কি-না ঠিক করিবার আগেই গাড়িতে টান দিয়াছে।

মিলির ঘরে এখনো আলো জ্বলিতেছে। পিসিমা ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন —ঘুমুতে যাস নি এখনো?

তাড়াতাড়ি বালিশের তলা হইতে একটা বই বাহির করিয়া হাঁটুর উপরে উলটা করিয়া পাতিয়া তক্ষুনি ফের সোজা করিয়া ধরিয়া, সে কহিল—বইটা শেষ করে এই যাচ্ছি।

অথচ বিছানার উপরেই দেয়ালে পিঠ দিয়া সে বসিয়াছিল। কোমর অবধি একটা চাদর দিয়া ঢাকা। চুল বাঁধিতে সময় পায় নাই বলিয়া বুকের উপর এলোমেলো হইয়া আছে।

পিসিমা কহিলেন—চুলও বাঁধিসনি দেখছি। ফিতে-কাঁটা নিয়ে আয় শিগগির।

—রক্ষে করো। আমি এই শুলাম। বলিয়া বইটা খাটের এক প্রান্তে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আলোটা হাতের থাবড়ায় ফস করিয়া নিভাইয়া দিল। তাহার পর চাদরটা মাথা অবধি টানিয়া দিয়া সটান। মুখ বার না করিয়াই কহিল—বাইরের দিকের দরজাটা এঁটে দিয়ে তুমিও গিয়ে শুয়ে পড়ো, পিসিমা।

পিসিমা অন্ধকারে সেইখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার এই নীরব উপস্থিতির অর্থ হইতেছে এই যে তিনি ব্যাপারটা বুঝিয়াছেন। মিলি তবুও চাদরটা মুখ হইতে সরাইল না দেখিয়া তিনি দরজাটা টানিয়া দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। এই নিঃশব্দে যাওয়ার অর্থ হইতেছে এই যে মিলির প্রতি সহানুভূতির তাঁহার সীমা নাই।

এতোক্ষণ মোমের আলোয় চোখ চাহিয়া মিলি কী যে ঠিক ভাবিতেছিল বলা কঠিন। এই বাড়িটা সম্বন্ধে কেনই যে তাহার এ অহৈতুক কৌতুহল —এই বাড়িটার চারদিকে দেয়াল নাকি তাহার পায়ে সমস্তক্ষণ

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ; অথচ এই বাড়িতে আসিতে ও আসিয়া থাকিতে গোড়ায় তাহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। সামান্য একটা বাড়ি সম্বন্ধেই সে অকারণে ঘন-ঘন মত বদলায়। এখন তাহার কাছে এই সহরটা স্যাঁতসেঁতে ও মাঠের হাওয়া অত্যন্ত জোলো—এমন-কি তাহার জ্বর হইয়া গেল, অথচ গাঁয়ের পথ ধরিয়া শ্মশানে ও সহরের পথ ধরিয়া স্টেশনে তাহার আনাগোনা লাগিয়াই ছিল। ঘরে যে কেউ নিরুপায় হইয়া অবশেষে তঁরকারি কুটিতে মন দিয়াছে, সে কথা কে বোঝে ?

কিন্তু অন্ধকারে এখন চোখ বুজিতেই ট্রেনের শব্দ আসিয়া মিলির কানে লাগিল। এইমাত্র গাড়ি ছাড়িল বলিয়া এখনো পর্যন্ত মানব কামরার জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া আছে। অন্ধকারে খালি ঝিঁ-ঝিঁর ডাক ; কোনো একটা স্টেশনে আসিয়া থামিলো এদিকে-ওদিকে দুয়েকটা ভাঙা-চোরা শব্দ। গাড়িটা নিঝুম হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ট্রেনটা যে কখনো আবার ছাড়িবে এমন মনে হয় না। যাই হোক, গদির বেঞ্চিতে নরম বিছানায় শুইয়া সে পরম আরামে ঘুমাইতেছে। গার্ডকে বলা আছে, লাকসাম আসিলে যেন জাগাইয়া দেয়।

মিলিকে কাহারো জাগাইতে হইবে না।

রাত্রিটা একেবারে শাদা—এক বিন্দু ঘুম নাই।

লাকসাম হইতে গাড়ি ছাড়িয়াছে। প্রায় শেষ রাত্রি। তন্দ্রার মতো আবেশ আসে, কিন্তু মিলির সেই উৎকণ্ঠ মুখখানির কথা মনে করিয়া চোখ তাহার জ্বালা করিতে থাকে। সে কি না এই কটা দিন তুচ্ছ একটা বাড়ি লইয়া মনে-মনে মাতামাতি করিল। মা একদিন সেখানে ছিলেন এই যদি তাহার মূল্য হয়, মিলিও তেমনি সেখানে আছে। একদিন সেই বাড়ি ছাড়িতে হইয়াছিল যেমন সত্য, তেমনি তো সে আবার নূতন

করিয়া সেখানে গৃহপ্রবেশ করিবে। অনুক্রমে আর বিচ্যুতি ঘটিবে না। এবং সে কি না এই কদিন উদভ্রান্তের মতো ফিরিয়াছে। সেই কথা ভাবিয়া হাসিতে গিয়া মানব টের পাইল চোখে তাহার জল জমিতেছে। মিলিকে সে উপেক্ষা করিয়াছে বুঝি।

কিন্তু ছুঁইতে গেলেই বুঝি মিলির ব্যথা করিয়া উঠিবে। সে-রূঢ়তা তাহার সহিবে না, তাই গাঢ় ও নিবিড় একটি অনুভূতিময় সান্নিধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে, কীট্‌স যেমন সমস্ত রাত জাগিয়া বর্ষা-রাতে ফুল-ফোটা দেখিত, তেমনি এই সান্নিধ্যের উত্তাপে মিলির দেহে সে কামনার ফুল ফুটিতে দেখিবে। দেহেরই লীলায়িত বৃন্তে, আপনারই অনুভবের রঙে, আপনাকে বিকীর্ণ করিবার সৌরভে। নদীর তরঙ্গের মত সে উছলিয়া পড়িবে—আপনারই প্রাচুর্যের দুঃসাহসে।

মানব জোর করিয়া তাহাকে জাগাইতে চায় না। তাহার এই আধ-ঘুম আধ-জাগরণটিতে গোধূলি-আকাশের স্নিগ্ধতা। একটি করিয়া তারা জাগিতেছে।

চাঁদপুর আসিয়া গেল বুঝি।

মিলির যখন ঘুম ভাঙিল তখন এক-গা বেলা।

বাহিরের টাটকা আলোর দিকে চাহিয়া মনে হইল নদীর জল। মনে হইল কচুরি-পানা দুলাইয়া স্টিমার চলিয়াছে।

কিন্তু আজ কাছে থাকিলে নিশ্চয়ই একটা গরুর গাড়ি জোগাড় করিয়া কোন ভোরে দুইজনে বাহির হইয়া পড়িত। রাত্রে পিসিমা দক্ষিণের জানলাটা বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন বটে, স্পষ্ট সে মাঠ দেখিতেছে। তাহাদের গাড়ি এতোক্ষণে সেইখানে গিয়া পৌঁছিয়াছে যাহা এখান হইতে দিগন্ত বলিয়া মনে হয়। কী যে তাহারা কহিতেছে মিলি ভাবিয়া পায় না—কথা না কহিলেই বা কী!

কতো টুকরো জিনিসই সে ফেলিয়া গিয়াছে। টাইম টেবল—টাইম টেবল ছাড়া চলিবেই বা কি করিয়া; রেইন কোট—এটি ভূতের মতো তার স্কন্ধে চাপিয়াই আছে; ও-মা, দাড়িতে সাবান মাখাইবার ব্রাশটা পর্যন্ত। স্টিমারে বসিয়া আর কমানো চলিবে না। কী মজা! স্যাণ্ডেলএর স্ট্র্যাপ একটা খুলিয়া গিয়াছে বলিয়া সেটাকেও ফেলিয়া গেছে। বড়লোক!

গোরাকে গিয়া শুধায়: তোকে কী দিয়ে গেলো?

মিউজিয়মে জিনিস-পত্র রোজ একবার করিয়া তাহার ওলোট-পালোট করা চাই। কাল যে-দুইটা জিনিস পাশাপাশি কাটাইয়াছে আজ তাহাদের স্থান-পরিবর্তন করিতে হইবে।

গোরা বলে: এক জোড়া ডাম্বেল। বুরুস-সাহেবের দীঘির পারে যে নতুন দোকান হয়েছে একটা। হাত মুঠো করে ধরলে আমি ওঁর আঙুল-গুলো টেনে-টেনে কিছুতেই খুলতে পারিনে: কিন্তু শেষে লাগাই এক চিমটি—তিন-রকম চিমটি আছে—রাম, সীতা আর হনুমান। মুঠোর সঙ্গে-সঙ্গে মুখখানাও হাঁ হয়ে যায়—

মিলি চলিয়া যাইতে পা বাড়ায়, গোরা বলে: তোমাকে কী দিল? সাজি করবার জন্যে সিগারেটের ছবি? না—কী দিল বলো না?

—আমাকে আবার কী দেবে? কিছুই না।

—না, কিছুই না। বললেই হলো। ওঁকে আবার কিছুই দেননি।

দুপুরের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করে।

সেই ফার্স্ট-ক্লাশের ডেক, বেতের চেয়ার, হাওয়ায়-ওড়া খবরের কাগজ। নদীর জল ছুরির ফলার মতো ধারালো—দৃষ্টিকে বেঁধে। মিলির নিজেরই চোখ তাতিয়া উঠে, নিজেই চোখ বোজে।

তারপর সন্ধ্যা। এইবার আরেকটু ঘনাইয়া আসিলেই হয়।

মিলি দুই হাতে মিনিট-সেকেণ্ডের ভিড় সরাইতে থাকে।
আর কথা নাই। শেয়ালদা আসিয়া গিয়াছে।
মিলিরই সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ শুরু হয়।
এখন আর তাহাকে পায় কে।
এই! ট্যাক্সি!
জিনিস-পত্র উঠিল কি না উঠিল, খেয়াল নাই—চালাও, ভবানীপুর, জলদি। মুখে তিনটি মাত্র কথা। শব্দ তিনটা মিলি যেন মানবের পাশে বসিয়া শুনিল।
এতোক্ষণে বাড়ি পৌঁছিয়া গেছে। নিতাইকে একশো গণ্ডা হুকুম আর সাতশো গণ্ডা ধমক। তার পড়ার ঘরের নীল পর্দাটা তেমনি ঝুলিতেছে। বারান্দা দিয়া যাইবার সময়—পর্দাটা তখন বাঁয়ে পড়িবে—বাঁ-হাতে সেটা সরাইয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিল। শূন্য চেয়ার আর অগোছাল টেবিল। তারপর দিল পর্দাটা ছাড়িয়া। পর্দাটা হাওয়ায় মৃদু-মৃদু দুলিতেছে।
তারপর স্নান।
তারপর—মিলিকে আর অনুমান করিতে হইবে না—স্পষ্ট সে মোটর-সাইক্লের ঝকঝকানি শুনিতেছে।
কিন্তু এ কী! তাহাদেরই বাড়ির উঠানে নাকি?
না, পিসিমা স্টোভ ধরাইয়াছেন।

১৭

কলিকাতায় পৌঁছিয়া মানব যেন ছাড়া পাইল।

রাস্তায় ট্যাক্সিটা দাঁড়াইতেই মানব চেঁচাইয়া উঠিল: নিতাই, নিতাই।

কাহারো সাড়া-শব্দ নাই। নিচেটা অন্ধকার। অগত্যা নিজেই মোটঘাট নামাইয়া ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া চুকাইয়া দিল।

ভিতরে ঢুকিয়া সামনে পড়িল কালু—খোদ কর্তার পোশাকি চাকর। গড়গড়ার জল বদলাইতে নিচে নামিয়াছে।

—তোদের ডাকলে যে সাড়া দিস না, ব্যাপারখানা কী?

উত্তর না পাইতেই নিতাই-মহাপ্রভুর আবির্ভাব। হন্ত-দন্ত হইয়া কোথায় চলিয়াছে।

—এতোক্ষণ গাঁজায় দম দিচ্ছিলি নাকি ব্যাটা?

—মা'র জন্যে দোকানে সন্দেশ আনতে যাচ্ছি।

—মা? এসেছেন নাকি? কবে?

নিমেষে রাগ জল হইয়া গেল। নহিলে নিতাইর ঐ রকম নির্বিকার ও নিরপেক্ষ উক্তির উত্তরে সে হয়তো তাহার গাল বাড়াইয়া এক চড় মারিয়া বসিত।

—মা এসেছেন নাকি?

সিঁড়িতে জুতার প্রচুর শব্দ করিতে করিতে মানব উপরে উঠিয়া গেল। উপরে উঠিয়াই বাঁ-দিকের বারান্দা ঘেঁষিয়া প্রথমেই মিলির ঘর—তাহার পর তার মায়ের এবং তাহারই গায়ে-গায়ে পর-পর দুইখানি তাহার। ডান-দিকের ঘরগুলি কখন যে কে ব্যবহার করে মানব কোনোদিন

খোঁজ রাখে নাই। কর্তা থাকেন তেতলার ঘরে—নিরিবিলিতে। উপরে উঠিয়াই বাঁয়ের বারান্দায় দেখা গেল একটি য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। মানব থমকিয়া গেল। চেহারা দেখিয়া মনে হয়, নার্স। কাহারো অসুখ করিয়াছে বুঝি।

—মা, মা।

য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। অনুপমা বাহির হইয়া আসিলেন—পাটনায় সাত মাস কাটাইয়া আসিয়া তাঁহার চেহারা—ফিরিবার নাম নাই, আরো কাহিল হইয়া গিয়াছে। কেমন যেন ধসকা চেহারা, হাত-পা হইতে গুঁড়া-গুঁড়া চামড়া উঠিতেছে।

মানব তাঁহাকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইল।

—তোমার অসুখ নাকি মা, বড্ড শুকিয়ে গেছো দেখছি।

—না, ভালোই আছি বেশ। তুমি ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করো।

—করবোখন। আগে স্নান-টান সারি। উনি ভালো আছেন তো? না হয়েছে একরত্তি ঘুম, না খেয়েছি একটুকরো ফল। খিদেয় গেলাম। ঠাকুরটাকে বলো না, শিগগির করে কিছু দিক।

বলিয়া মানব তাহার শুইবার ঘরের উদ্দেশে পা বাড়াইল।

অনুপমা বাধা দিয়া কহিলেন—ওখানে নয়। তোমার ঘর হয়েছে ও-দিকে।

—তার মানে?

অনুপমা শান্ত হইয়া কহিলেন—এ-ঘরে উনি থাকবেন। বলিয়া সেই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি গটগট করিতে-করিতে ঘরে ঢুকিয়া দরজার পর্দা টানিয়া দিল।

মানব চটিয়া উঠিল: কে উনি? ওঁকে ওদিকের ঘরে চালান করলেই হতো।

—হতো না। অনুপমার কণ্ঠস্বর কঠিন, উদ্বেগশূন্য: যাও, এই কালু, বাবুকে তাঁর ঘর দেখিতে দে তো।

মানব ধাঁধায় পড়িল। তাহার ঘরের ঝুলানো পর্দাটার দিকে রুক্ষ চোখে তাকাইয়া সে কহিল—আমার ঘরটার জাত যে মরে গেল, মা। ওঁকে তোমার এমন-কী দরকার পড়লো? ওঁকে আমি না তাড়িয়েছি তো কী! আমার খাট-ফাট সব সরিয়ে ফেলেছ নাকি? আলমারিটাও?

—না, আলমারিটা ওঁর লাগবে।

—ওঁর লাগবে মানে? আবদার যে উপচে পড়ছে দাঁড়াও—পর্দাকে লক্ষ্য করিয়া—দাঁড়াও, দুটি দিন মাত্র।

—কার দুটি দিন বলছ! ভদ্রলোকের মতো কথা বলতে শেখো। উনি ভাসা-ভাসা বাঙলা জানেন। অনুপমা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলিলেন।

—এবার চোস্ত করেই শিখতে হবে।

মানব তাহার বসিবার ঘরের দিকে পা বাড়াইল।

—ও দিকে কোথায় যাচ্ছ। অনুপমা বাধা দিলেন।

—আমার বসবার ঘরে। কেন, সেটাও লোপাট হয়ে গেছে নাকি?

—ও-ঘরটা আমার কাজে লাগবে।

—এতোদিন তো লাগতো না।

—দুহাতে টাকা উড়ানো ছাড়া তুমিই বা এতোদিন আমাদের কোন কাজে লাগতে?

মানব থামিয়া গেল। ম্লান হাসিয়া কহিল—ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না, মা।

অনুপমা কহিলেন—বোঝবার কিছু নেই এতে।

তিনিও ঘরের মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। মানব বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। কালু তামাকের জল বদলাইয়া এক ফাঁকে তেতলায় রাখিয়া আসিয়াছে। এ-দিক পানে চাহিতেই কালু কহিল—আসুন এ-দিকে।

এ-দিকের ঘরগুলির অবস্থান মানবের ঠিক মুখস্থ ছিলো না; একেবারে

কোণে এমনি যে একটা সংকীর্ণ ঘর তাহার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিলো, ইহা সে স্বপ্নেও কোনো দিন ভাবে নাই। দরজাটা ঠেলা মারিয়া খুলিয়া ফেলিয়া কালু বলিল—এই ঘর।

—এই ঘর! মানব যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ভূত দেখিতেছে: বলিস কিরে? আমার সঙ্গে সবাইর ঠাট্টা? বলিয়া সুইচ টানিল, কিন্তু আলো জ্বালিল না। বালবটা কোথায় খারাপ হইয়াছে। এই ঘরে আগে হয়তো চাকররা শুইত—কিম্বা এতোদিন হয়তো চামচিকে আর ইঁদুরেরা এই ঘরে নিয়মিত দৌড়-ঝাঁপ করিয়া বংশানুক্রমে স্বাস্থ্যবর্ধন করিয়া আসিয়াছে।

মানব-রীতিমতো চেঁচামিচি শুরু করিল—এই ঘরে কোনো ভদ্রলোক মাথা গুঁজতে পারে? আমার জিনিস-পত্র সব টাল করে ফেলা হয়েছে। কী-সব ভেঙ্গে-চুরে খান-খান হয়ে গেল সে দিকে কারুর নজর নেই। ডাক নিতাই হারামজাদাকে। বসে-বসে ব্যাটা এর জন্যে মাইনে গুনবে? কালু মানবের এলেকার চাকর নয় বলিয়া কোনো গালাগালই তাহাকে লাগিতে পারে না।

মানব একবার ঘরের ভিতরে ঢোকে, আবার বাহিরে আসিয়া চেঁচামিচি আরম্ভ করে: এমন ঘরে দুদিন থাকলেই যে আমার থাইসিস। পশ্চিম পুব একেবারে বন্ধ। জিনিস দিয়ে জাঁতা। ও-গুলো বুঝি আর অন্য ঘরে রাখা যেতো না? কেন, কেন আমার ঘরে এসে অন্য লোক থাকবে? ঘাড় ধরে বের করে দিতে পারি না?

মানব আবার অনুপমার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

—ঐ ঘরে কী করে থাকা যায়? ঐ ঘর গুছিয়ে রাখা হয়নি কেন? চাকর-বাকর সবাই যেন মাথায় উঠেছে। কাল সারা রাত আমার ঘুম হয়নি—অমন নোংরা চাপা ঘরে কোনো ভদ্রলোকের ঘুম আসে?

অনুপমা বাহির হইয়া আসিলেন। কহিলেন—কী চেঁচামেচি লাগিয়েছ শুনি।

—চেঁচামিচি করবো না? তোমার অতিথিকে ঐ ঘরের খাঁচায় পুরতে পারতে না? কালকেই আমার ঘর ছেড়ে দিতে হবে বলে রাখছি।

মুখ বাঁকাইয়া অনুপমা কহিলেন—কথাটা কে বলছে শুনি?

—আমি বলছি। ওকে পোরবার মতো আর বাড়িতে ঘর ছিলো না নাকি?

—অসভ্যের মতো গলা ফাটিয়ে চীৎকার কোরো না। ঘর পছন্দ না হয়, বাইরে চলে যাও। রাস্তা আছে।

বলিতে-না-বলিতেই অনুপমার তিরোধান! দরজাটা তাহার মুখের উপর সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

কী করিবে মানব ঠিক কিছু বুঝিতে পারিল না। বাইক নিয়া রাস্তায়-রাস্তায় খানিকক্ষণ টহল দেওয়া ছাড়া আর পথ দেখিল না। কিন্তু বারান্দাটা পার হইবার আগে মিলির ঘরের দরজাটায় ঠেলা মারিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল।

ঠেলা মারিতেই ভেজানো দরজাটা খুলিয়া গেল। উঁকি মারিয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই—সমস্ত ঘর জুড়িয়া শুধু মিলির অনুপস্থিতিটুকু বিরাজ করিতেছে। মানব ঘরের মধ্যে চলিয়া আসিল; সুইচ টিপিয়া আলো করিয়া তক্ষুনি আবার নিবাইয়া দিল। মিলির ব্যগ্র দুই বাহুর মতো অন্ধকার সহসা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

এ কয়দিন আর ঝাঁট পড়ে নাই। টেবিলের উপর বই-খাতাগুলি ছড়াইয়া আছে। মানব তাই নিয়া কতোক্ষণ নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। শ্রান্তিতে শরীর তাহার ভাঙিয়া পড়িতেছে। মিলির খাটের উপর শুকনা গদিটা খালি পড়িয়া আছে। মানব তাহারই উপর বসিয়া পড়িল।

মিলি তাহার মাথার এত কাছে আসিয়া বসিয়া আছে, তবু সে তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না!

কী যে ব্যাপার ঘটিয়াছে মানব ভাবিয়া-ভাবিয়া কিছুরই কূল-কিনারা

পাইল না। তেতালায় উঠিয়া সতীশবাবুর শরণাপন্ন হইলে ইহার একটা বিহিত হইতে পারে বটে, কিন্তু নিজের প্রভুত্ব সঙ্কুচিত করিতে হইবে ভাবিয়া তাহার আত্মসম্মানে ঘা লাগিল। ঘরে মেম-সাহেব আনিয়া মা'র মেজাজও সহসা ফিরিঙ্গি হইয়া উঠিল কেন? তাহাকে কি-না বলা—সোজা রাস্তা পরিয়া আছে!

অন্ধকারে মানব চুপ করিয়া শূন্যমনে বসিয়া রহিল।

সহসা কোথা থেকে শিশু একটা ট্যাঁ করিয়া উঠিয়াছে। পাশের ঘরেই। য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটা বিকৃত স্বর-ভঙ্গীতে তাহাকে প্রবোধ দিতেছে। মজা মন্দ নয়। একা নয়, বোঝার উপর শাকের আঁটিটি পর্যন্ত নিয়া আসিয়াছে। কেন যে এই উপদ্রব আসিয়া জুটিল, কি করিয়া এখুনি ইহার প্রতিবিধান করা যায় সম্প্রতি তাহাতে একটুও মন না দিয়া মানব তেমনি বসিয়াই রহিল।

বাহির থেকে নিতাই কহিল—আপনাকে কর্তাবাবু ডাকছেন।

—কর্তাবাবু ডাকছেন! মানব খেঁকাইয়া উঠিল: নদের চাঁদ এতোক্ষণ কোথায় ছিলে? আমার ঘর-দোর গুছিয়ে রাখতে পারিসনি, হারামজাদা? যা ব্যাটা, যাবো না আমি।

—আপনি যে আজ আসবেন জানবো কী করে?

—তাই ঘর-দোর অমনি একহাঁটু করে রাখবি? দাঁড়া—

—এখুনি সব গুছিয়ে ফেলছি আমি। আপনি একবারটি তেতলায় যান।

মানবের কোনো ব্যস্ততা দেখা গেল না। শরীরটা যেন থামিয়া আছে, ম্যাজ-ম্যাজ করিতেছে—স্নান না করিলে কিছুতেই তাহার রাগ পড়িবে না। তেতলায় উঠিলে এখনই সব-কিছুর সমাধান হয়, তবু এ-জায়গাটি ছাড়িয়া উঠিতে তাহার ইচ্ছা করে না।

২০

নিতাই আবার তাড়া দিয়া গেল।

সতীশবাবুর অস্তিত্বের কথা মানব একরকম ভুলিয়াই ছিল; তেতলার থেকে তিনি বড় একটা নামিতেন না, শামুকের খোলার মতো ঐ ঘরটিই তাঁকে আবৃত করিয়া রাখিত। মানবের অবাধ ও উদ্দাম ধাওয়ার মুখে পড়িয়া তাহার সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন ঠোকাঠুকি হয় নাই। মানবের মনি-ব্যাগটা শূন্য হইলে তিনি তাহা আবার ভরিয়া দিয়াছেন। তখনই হাসিয়া এক-বার বলিতেন: ছমাসে আর মুখ দেখিয়ো না। কিন্তু ছমাস পার হইবার আগে নিজেই তাহার ঘরে উঁকি মারিয়া মৃদু হাসিয়া বলিয়াছেন: তোমার মনি-ব্যাগের স্বাস্থ্য ভালো আছে তো? মানব হাসিয়া বলিয়াছে: হাওয়ায় বেড়িয়ে সম্প্রতি কিছু কাহিল হয়ে পড়েছে।

তা ছাড়া কোনো কাজেই সতীশবাবুর দরবারে তাহার ডাক পড়ে নাই। আজই তাহাকে নিয়া তাঁহার কী দরকার পড়িল ভাবিয়া সে দিশা পাইল না।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে-উঠিতে তাহার ভয় করিতে লাগিল। দরজাটা বিস্তৃত করিয়া খোলা—প্রকাণ্ড টেবিলের উপর একরাশ কাগজ-পত্র লইয়া সতীশবাবু ভীষণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। টেবল-ল্যাম্পের তীক্ষ্ণ আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়িল তাঁহার মুখে চিন্তার কুটিল রেখা পড়িয়াছে। অনেক দিনের অনিদ্রায় চোখ দুইটা কাঁচের মতো কঠিন দেখায়।

দরজার কাছে একটা ছায়া পড়িল। সতীশবাবু কাগজের আণ্ডিল থেকে

মুখ তুলিয়া স্মিতহাস্যে কহিলেন—এসো, মানু। তুমি এখনো জামা-কাপড় ছাড়োনি? কী নিয়ে গোলমাল হচ্ছিলো?

মানব কহিল—আমার দু-দুটো ঘর হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। কে-একটা মেয় এসে সেখানে আস্তানা গেড়েছে।

—হু! কাগজ-পত্রে চোখ ডুবাইয়া সতীশবাবু মাত্র এই সংক্ষিপ্ত শব্দ করিলেন।

মানব কহিল—ওকে কেন আমার ঘর দেওয়া হলো? আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে কি না ঐ কোণের আঁস্তাকুড়ে। না আছে জানলা, না বা আলো। গা ছড়ানো যায় না।

—আচ্ছা, সে আমি দেখছি। তুমি ততোক্ষণে স্নান করে নাও। নিচে যাবার দরকার নেই, আমারই বাথরুমে জল আছে। এখন আর কোথাও বেরিয়ো না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

শুধু কথা আছে! মানব সহসা এই সংসারের চোখে এত অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল। স্নান করাটা হয়তো ঠিক হইল না। তবু না করিয়াই বা কী করা যায়! নিতাই কাপড়-তোয়ালে আয়না ব্রাশ লইয়া হাজির। কহিল—এই জুতো এনে রেখেছি। দেখুন এসে আপনার নতুন ঘর-দোরের কেমন ভোল ফিরে গেছে।

—তুই থাকিস ও ঘরে। আমার কাজ নেই।

ঘরে ঢুকিতেই সতীশবাবু কহিলেন—বোসো। তোমার খাবারটা এখেনেই দিয়ে যাবেখন। যা তো নিতাই, ঠাকুরকে বলে আয়।

—না, না, সে পরে হবে। মানব আপত্তি করিল : এখনো আমার খিদে পায়নি। কথাটা আগে সেরে নিন।

—কথাটা আগে সেরে নেব? সতীশবাবু স্মিতহাস্যে কহিলেন—চেয়ারে বেশ টাইট হয়ে বসেছ তো?

—এ-চেয়ার থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে যেতেও আমার আপত্তি

নেই। বলুন। মা তো আমাকে সোজা রাস্তা দেখতেই উপদেশ দিয়েছেন।

—বটে? সতীশবাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল : আমি বলি কি জানো, মান্থ?

—কি? টেবিলের উপর দুই কনুইয়ের ভর রাখিয়া মানব জানিতে চাহিল।

—তোমাকে আমি টাকা দিচ্ছি, তুমি কোথাও দিন কয়েক বেড়িয়ে এসো। কথাটা মানব আয়ত্ত করিতে পারিল না। সতীশবাবুর মুখের দিকে হতভম্বের মতো চাহিয়া থাকিয়া বলিল—বেড়াতে যাবো কী! আমাদের কলেজ খুলতে আর কতো দিন!

—এই পচা ইউনিভার্সিটিতে আর পড়ে না। সোজা বিলেত চলে যাও। ব্যারিস্টার হয়ে এসো। কিম্বা অন্য কোনো টেকনিক্যাল বিদ্যা। রঙের কাজ, ব্লকের কাজ, এঞ্জিনিয়ারিং—যাতে তোমার হাত খোলে। যতো দিন তোমার খুশি।

মানব ব্যঙ্গসূচক হাসি হাসিয়া কহিল—আমাকে তাড়াবার জন্যে হঠাৎ আপনারা সবাই ক্ষেপে উঠলেন কেন?

পীড়িত মুখে সতীশবাবু কহিলেন—তোমাকে তাড়াব কী, মান্থ? সত্যিকারের মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে তোমাকে ইউরোপ পাঠাচ্ছি। তুমি যদি উত্তর-মেরু জয় করবার জন্যেও আকাশে বেরোতে চাও, আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

—কিন্তু বি. এ. পাশ করে যাবো বলেই তো ঠিক ছিলো।

—দুত্তোর বি. এ. পাশ! সতীশবাবু টেবিলে এক কিল মারিলেন : খামোখা দেরি করে লাভ কি! তুমি তো চলতে পারলে থামো না। মুহূর্তের মধ্যে মানব হাঁপাইয়া উঠিল; কহিল—কিন্তু ব্যাপারটা কী স্পষ্ট করে আমাকে বলুন।

গলা খাঁখরাইয়া সতীশবাবু কহিলেন—হ্যাঁ, স্পষ্ট করেই বলছি। তুমি এর মাঝে খেয়ে নিলে পারতে।

—সে হবেখন। আপনি বলুন।

একটুখানি চুপচাপ। মাঝে-মাঝে নিচে হইতে সেই শিশুর তারস্বর কানে আসিতেছে।

সতীশবাবু শুরু করিলেন : ঐ আওয়াজটা কানে আসছে, মানু ?

—কিসের ?

—কে যেন কাঁদছে না ?

—সেই ফিরিঙ্গি-মেয়েটার বাচ্চা হয়তো।

সতীশবাবুর গোঁফ-জোড়া ঈষৎ স্ফুরিত হইল। চেয়ারে হেলান দিয়া তিনি কহিলেন—খবরটা এখনো তাহলে পাওনি ? ও তোমারি ভাই। অর্থাৎ—

মানব বসিয়া পড়িল। ষড়যন্ত্রের সমস্ত জটিলতা এখন তাহার কাছে পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে।

—অর্থাৎ—সতীশবাবু প্রসন্নমুখে কহিতে লাগিলেন—বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্র-সন্তান লাভ করেছি। এর পরিণাম কী ভাবতে পারো ?

মানবের স্বর ফুটিতেছিল না, কঠিন দুইটা হাতে তাহার গলাটা কে নির্মম জোরে চাপিয়া ধরিয়াছে। স্বর যাহা ফুটিল, শুনাইল ঠিক কান্নার মতো : আমার পক্ষে পরিণাম কী, তাই ভাবতে বলছেন ? মা তো সে-কথা আগেই বলে দিয়েছেন—রাস্তা।

—নিশ্চয়ই নয়। সতীশবাবু মানবের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—তোমাকে আমি বঞ্চিত করবো এতো বড়ো নিষ্ঠুর আমি কখনোই হতে পারবো না। এই দেখ, আমি কী উইল করে রেখেছি।

সতীশবাবু ড্রয়ার টানিয়া কি-একটা কাগজ বাহির করিলেন।

শুকনো গলায় মানব কহিল—শুনে আমার দরকার নেই। দয়া করে ওটা ছিঁড়ে ফেলুন।

সতীশবাবু কহিলেন—একটা মোটা টাকাই তোমার জন্যে রেখেছি। ইচ্ছে করলে তুমি অনায়াসে বিলেত চলে যেতে পারো।

—ধন্যবাদ।

মানব চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সতীশবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—উঠছ কি এখুনি?

—এ বাড়িতে থাকবার আর আমার কী দরকার থাকতে পারে?

—সে কী কথা। সতীশবাবুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ-বাড়ি ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছ নাকি? কোথায়?

—দেখি আপনার কথামতো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হতে পারি কি না।

—না, না, ছেলেমানবি কোরে না বোসো। বলিয়া সতীশবাবু তাহাকে হাতে ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। তাহার পাশে আরেকখানা চেয়ারে বসিয়া কহিলেন—অভিমান করবার কিছুই নেই। আমি তোমাকে বঞ্চিত করলে এই অভিমান হয়তো সাজত। ভেতরে ভেতরে যে কোনো পরিবর্তন হয়েছে এ-কথা আমি বাইরে থেকে বুঝতেই দেব না।

—তাই তো কোণের ঘরে আমার জায়গা হয়েছে; মা সটান আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

প্রবোধ দিবার সুরে সতীশবাবু কহিলেন—তাতে কি। তুমি অন্য কোথাও রুমস নিয়ে থাক, কিম্বা বি, এ, পাশের মোহ যদি কাটিয়ে উঠতে পারো তো টমাস কুক কিম্বা আমেরিকান একসপ্রেসএ গিয়ে বুক করে এসো।

—সবই সম্ভব হতো যদি আমার কোনো অধিকার আছে বলে অনুভব করতাম। ফাঁকা স্নেহের উপর আমার আর বিশ্বাস নেই।

—বলো কি, মানু? এতোগুলি বৎসর ধরে কি তুমি এই শিখলে?

—আর এতোগুলি বৎসর পরে ছোট একটা শিশুর স্থান করে দিতে আমাকেই পথে বেরুতে হবে—এ-ই কি আমি ভেবেছিলাম কোনোদিন?

—কিন্তু তুমি তো জানো—আইনে তুমি আমার উত্তরাধিকারী নও। তবুও তোমাকে যে আমি অর্থের অভাব কোনোদিন বোধ করতে দেব না বলে প্রতিজ্ঞা করছি—

—তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

মানব আবার উঠিল।

—তুমি যাচ্ছ কোথায়?

মানব বিমর্ষমুখে হাসি আনিয়া কহিল—যেখান থেকে এ-বাড়িতে এসেছিলাম।

খুব বড়ো রকম ব্যর্থতা আসিয়া মানুষের জীবনকে যখন গ্রাস করে, তখন সে হাসিমুখে মনে-মনে বলে: এ যে ঘটবে তা আমি বহু আগে থেকেই জানতাম—মানবের মুখে সেই অসহায় হাসি।

সতীশবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন: না, না, আমার এ-ঘর তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আমিই না-হয় কোণের ঘরে গিয়ে থাকবো। তুমি যাবে কী? ছি! যাবার জায়গা কোথায়?

ম্লান হাসিয়া মানব কহিল—আমার বাবাও একদিন এমনি নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। সেই সুর আমার রক্তে বাজছে।

—তা বাজুক। তুমি বোসো। কালু! ঠাকুরকে শিগগির বলো গে—দাদা-বাবুর খাবার এখানে পাঠিয়ে দেবে।

—আমার মা-ও কোথায় কোন দিকে চলে গেছেন কেউ বলতে পারে না।

সতীশবাবু হঠাৎ কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন: তোমার মা চলে যাবার দিনে তোমাকে আমার হাতে দিয়ে বলে যায় তোমাকে যেন মানুষ করে তুলি। তোমার মা'র সেই কথা আমি চিরদিন মনে রেখেছি।

—বহু ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকেও মা'র সঙ্গে পথে বার করে দিলেন না কেন?

—তোমার মা-ই তোমাকে নিতে চাইলো না।

—এ-সংসারে আমার যদি জায়গা হলো, মারও কি হতো না?

—তোমার মা জোর করেই চলে গেল। কিন্তু সে-কথা থাক।

সতীশবাবু অন্যমনস্কের মতো পাইচারি করিতে লাগিলেন।

—আমিও তেমনি জোর করেই চলে যাই।

—কিন্তু আজই যেতে হবে এমন কোনো প্রতিজ্ঞা আছে? আজ রাতটা জিরোও, কাল ভেবে ঠিক করা যাবে—দেখি কী করতে পারি।

—ভেবে ঠিক করবার কিছুই আর নেই এতে।

মানব দরজার দিকে মুখ করিয়া ঘুরিয়া গেল।

সতীশবাবু বাধা দিয়া কহিলেন—এ তুমি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছ।

—এতে আমার-আপনার কোনোই হাত নেই। এ একদিন হতোই। এ না হয়ে যায় না। সত্যিকারের বাঁচবার পক্ষে এই ক্ষতির মূল্য অনেকখানি।

সিঁড়িতে কাহার জুতার শব্দ হইতেছে।

সশরীরে অনুপমাই হাজির হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সতীশবাবুর মুখ চুন হইয়া গেল।

অনুপমা মাতৃত্বের স্বাদ পাইয়া যেন বাঘিনী হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি যে বেশ শুকাইয়াছেন তাহা তাঁহার গলাটা দেখিলেই ধরা পড়ে। তিনি গলাটা কিঞ্চিৎ ঝুলাইয়া কহিলেন—কী এমন ঘর খারাপ হয়েছে শুনি?

—না, না—সতীশবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন—মানু আজ আমার বিছানায় শোবে। কাল একটা বন্দোবস্ত করা যাবে যা-হোক।

—আবার কী বন্দোবস্ত!

—হ্যাঁ। সে একটা হবে ঠিক। এখনো ওর খাওয়া হয়নি। ঠাকুর খাবার দিয়ে যাচ্ছে না কেন? যতো কুঁড়ের ধাড়ি।

—কেন, উনি নিচে নেমে খেয়ে আসতে পারেন না,না ওঁর সম্মানে বাধে ?
মানব হাসিয়া কহিল—খেতেই আমার সম্মানে বাধছে, মা।
অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া গলার স্বরটাকে ঈষৎ চাপিয়া অনুপমা কহিলেন—সে হিসেবে এতো দিনে তো তবে কম সম্মান খোয়ানো হয়নি দেখছি। তার পর মুখ ঘুরাইয়া স্পষ্ট স্বরে কহিলেন—সোজা কথা বাপু, তোমার পিছনে আর রাশি-রাশি টাকা উড়োনো চলবে না।
মানব নির্লিপ্তের মতো কহিল—সোজা কথাটা আমি আরো সোজা করে দিয়ে যাচ্ছি। তোমার ভাবনা নেই।
মানবকে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইতে দেখিয়া অনুপমা কহিলেন—কিন্তু চারটি না খেয়ে এখুনিই বেরিয়ে যেতে হবে এমন কথা তো তোমাকে কেউ বলেনি।
—সোজা করে এমন-কথা কেউ বলবার আগেই তো চলে যাওয়া উচিত।
সতীশবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—তোমার স্বভাবের এ-দোষ আমি চিরদিনই লক্ষ্য করছি মানু, একবার যা তোমার মাথায় আসে, কিছুতেই তুমি তা ছাড়তে পারো না।
মানব তবুও বশ না মানিয়া সোজা নামিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া অনুপমা মুখভঙ্গি করিয়া কহিলেন—তুমিই তো নাই দিয়ে-দিয়ে মেজাজখানা ওঁর এমনি নবাবী করে তুলেছো।
মানব কয়েক ধাপ নামিয়া আসিয়াছে।
সতীশবাবু প্রায় ছুটিয়া আসিয়া মাঝপথে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার একখানি হাত মুঠার মাঝে তুলিয়া লইয়া কহিলেন—তোমার গোঁ যখন ছাড়বে না, তখন কী আর আমি করতে পারি ? কোথায় যাচ্ছ জানি না, তবু কিছু তোমাকে আমি দিয়ে যাচ্ছি। বলিয়া তাহার বুক-পকেটে এক তাড়া নোটই গুঁজিয়া দিলেন হয়তো : ছেলেমানষি করো না। এ তোমাকে রাখতেই হবে। তা ছাড়া—সতীশবাবু অনুপমাকে

একটু লক্ষ্য করিয়া গলা নামাইয়া কহিলেন—বিলেত যাবার প্রস্তাব কিন্তু ওপ্‌ন্ রইলো। বুদ্ধিমানের মতো তাই ভেসে পড়ো। টাকার দরকার হলে আমার কাছে আসতে আপত্তি কোরো না। সতীশবাবু মানবের সঙ্গে-সঙ্গে আরো দুই ধাপ নিচে নামিলেন : খুব একটা অসুবিধেয় পড়ো এ আমি চাইনে। যাও, দিন কয়েক কোথাও ঘুরে এসো। আবার এসো একদিন—

মানব ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সতীশবাবুকে নিঃশব্দে প্রণাম করিয়াই তরতর করিয়া নামিয়া গেল। সতীশবাবু কাঠের রেলিঙ ধরিয়া টাল সামলাইলেন। তাঁহার সঙ্গে আরো দুইটা জরুরি কথা কহিবার জন্য অনুপমা রহিয়া গেলেন।

দোতলার বারান্দায় পড়িয়াই প্রথমে মিলির ঘর। এই ঘরে গিয়া দাঁড়াতেই মিলি অন্ধকারের গভীর সান্ত্বনার মতো চারদিক হইতে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

সে জীবনে এতো বেশি লাভ করিয়াছে যে এই সামান্য ক্ষতিতে তাহার কী এমন আসে যায়! মেঘনার পারে সেই কলা-গাছের বেড়া-দেওয়া পাতার কুঁড়ে-ঘরটি তাহার চোখে আঁকা আছে। সেই ধূ-ধূ মাঠের সমুদ্রে পাল-তোলা জাহাজের মতো নোয়াখালির সেই বাড়িটা—যে-বাড়িতে আগে মা থাকিতেন, যে-বাড়িতে এখন মিলি আছে।

ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিতেই পাশের ঘরের দরজার কাছে সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটির সঙ্গে দেখা। দুই বাহুর মধ্যে এক প্যাকেট ফ্ল্যানেলের তলায় হৃষ্টপুষ্ট একটি শিশু—সোডার বোতলের মুখের মতো বোজানো মুঠি তুলিয়া আলো দেখিয়া খেলা করিতেছে। এই মাত্র কাঁদিতেছিল, নার্সের বাহুর আশ্রয় পাইয়া খুশির তাহার শেষ নাই। ময়দার পাকানো ড্যালার মতো ফুলো-ফুলো গাল, গালের চাপে

নাকটা কোথায় ডুবিয়া আছে, আঙুলের ছোট-ছোট নখগুলি নতুন আলপিনের মাথার মতো ঝকঝক করিতেছে।

সিঁড়িতে আবার কাহার জুতার শব্দ।

ফিরিঙ্গি মেয়েটির দিকে বন্ধুর মতো চাহিয়া মানব কহিল—গুড-বাই। মেয়েটি কিছু উত্তর না-দিয়া বুকের ছেলেটাকে নিচু হইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

ছেলেটা যেন পিঠালির পুতুল। ডুমো-ডুমো গাল দুইটা টিপিয়া ছেলেটাকে একটু আদর করিবার জন্য সে হাত বাড়াইল, অমনি হাত তুলিয়া হাঁ-হাঁ করিতে-করিতে অনুপমা ছুটিয়া আসিলেন। মুখে তাঁহার হিন্দি-মেশানো বাঙালি বুলি: কেন তুমি ঠাণ্ডায় ওকে নিয়ে এসেছ? শিগগির নিয়ে যাও ভেতরে।

মানব স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনুপমা ছেলেকে নার্সের কোল হইতে তাড়াতাড়ি ছিনাইয়া লইয়া মানবের নাগালের বাহিরে ঘরের মধ্যে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। চোখে তাঁহার সেই বাঘিনীর দৃষ্টি। মানব যেন হাত বাড়াইয়া আরেকটু হইলেই শিশুটার গলা টিপিয়া ধরিয়া শেষ করিয়া দিয়াছিল! ঢলানি মেয়ে আলাপ জমাইতে ঢং করিয়া একেবারে ছেলে কোলে করিয়া আসিয়াছে। ভাগ্যিস সে ঠিক সময়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। আর এক মিনিট পরে হইলেই—ভাবিতে অনুপমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। মানব সামান্য একটু হাসিয়া সিঁড়ি দিয়া আস্তে-আস্তে নামিতে লাগিল। অনুপমা কী করিয়া এমন কুৎসিত ভাবে বদলাইয়া গেলেন মানব ভাবিয়া থৈ পায় না। নারী-চরিত্রের এই উৎকট স্বার্থপরতার চেহারা সে ইহার আগে কোনোদিন দেখে নাই, বোধকরি ভাবিতেও পারে না। ইহারই পাশে অপরাজিতা ফুলের মতো মিলির মুখখানি মনে করিয়া সে নিজেকে একটু পবিত্র বোধ করিল।

অনুপমা তখনো কী-সব অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। গলানো সিসে। মানব নিচে নামিয়া আসিল। নিচের তলায় অনেক সব অনাহুত অতিথি শিকড় গাড়িয়া বসিয়া দিনে রাত্রে রস শোষণ করিতেছে। তাহাদের বেশির ভাগই অনুপমার বাপের বাড়ির সম্পর্কিত। কোনোদিন তাহাদের দিকে মানব মুখ তুলিয়া তাকায় নাই; আজ যাইবার আগে তাহাদের দেখিতে ইচ্ছা করিল। শিগগিরই যে তাহাদেরো উপর গৃহত্যাগের নোটিশ জারি হইবে এ-খবর হয়তো তাহারা এখনো পায় নাই। হয়তো তাহা নয়; তাহারা তো আর মানবের মতো অংশের টুকরা লইয়া কামড়া-কামড়ি করিতে আসিত না। তবু কোথায় যেন মানবের সঙ্গে তাহাদের মিল ধরা পড়িয়াছে। সে-ও তো নিচেই নামিয়া আসিল।

একটা ঘরে সে ঢুকিয়া পড়িল। দড়ির একটা খাটিয়ার উপর কম্বল পাড়িয়া হরিহর একপেট খাইয়া চিৎ হইয়া পরম আরামে পান চিবাইতেছে আর পা দুলাইতেছে। মানবকে ঢুকিতে দেখিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। মানব একটা কিছু হুকুম করিলেই সে পরম আপ্যায়িত হইবে এমনি ভঙ্গিতে সকাতরে সে কহিল—আমাকে কিছু বলবেন?

মানব ফিরিয়া যাইতে-যাইতে কহিল—না, তোমরা কী করছ এমনি দেখতে এসেছিলাম।

ভাগ্যিস হরিহর এখন তামাক সাজাইয়া বসে নাই।

মানবের স্পষ্ট মনে পড়ে এই হরিহরকে একদিন সে মোটর-বাইকের কাদা ধুইতে বলিয়াছিল—হরিহর দুই-পাটি দাঁত বাহির করিয়া তখুনিই কোমরে কাপড় কাছিয়া বালতি করিয়া জল তুলিয়া আনিয়াছিল। আজ হরিহরের বিছানা ভাগ করিয়া অনায়াসে সে তাহার পাশে বসিতে পারিত।

কিন্তু সহানুভূতি কুড়াইবার এই উঞ্ছবৃত্তি তাহাকে শোভা পায় না।

নিচে মোটর-বাইকটার সঙ্গে তাহার দেখা হইল—তাহার 'ট্রায়ম্‌ফ্'।

হ্যাণ্ডলটা ধরিয়া বন্ধুর হাতের মতো এক সবল ঝাঁকানি দিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

গ্যারেজটা তালা-দেওয়া। কাল সকালে আসিয়া মির্জা দরজা খুলিবে। সেই গাড়ি করিয়া ফিরিঙ্গি-মেয়েটা হয়তো ছেলে কোলে নিয়া রোজ হাওয়া খাইয়া আসিতেছে।

পিছন থেকে নিতাই ডাক দিল : বাবু চলে যাচ্ছেন নাকি? ঠাকুর যে আপনার খাবার নিয়ে ঘুরছে। এখন বেরুলে সব জুড়িয়ে যাবে যে।

মানব ডাক শুনিয়া ফিরিল। পকেট হইতে খুচরা একটা টাকা বাহির করিয়া নিতাইর দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল—এই নে।

২১

এখনো নবাবি তাহার ষোল আনা। ফুটপাতে খানিকক্ষণ দাঁড়াতেই একটা ট্যাক্সি মিলিয়া গেল। বুক-পকেটটা ফাঁক করিয়া তাহার স্ফীতির একটা পরিমাপ করিয়া সে ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিল।

কোথায় যাইবে জানিবার জন্য ড্রাইভার ঘাড় ফিরাইল।

সিটটাতে নিজেকে আরো ছড়াইয়া দিয়া মানব কহিল—জানি না।

এমন যাত্রীকে অবশেষে কোথায় লইয়া যাইতে হয় ড্রাইভার জানিত। মনে-মনে তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও মানব কোনো জায়গার হদিস পাইল না। সে-জন্য তাহার ব্যস্ততা নাই। যেখানে হয়, সেখানেই সে থাকিবে। যদি পুলিশ আপত্তি না করে সারা-রাত্রি ট্যাক্সিতেই, যদি আপত্তি করে, সুখকম্বলশয়নে। ফুটপাতে, নর্দমায়—যেখানে খুশি। এই অনিশ্চিততার সঙ্গে নিজেকে সে এক মুহূর্তেই চমৎকার খাপ খাওয়াইয়াছে।

শ্রান্তিতেই গা ছাড়িয়া দিয়াছে—মূর্চ্ছিত চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটার মতো হাওয়া আসিয়া বিঁধিতেছে। ধূ-ধূ মাঠের উপরে সেই বাড়ি, মেঘনার নীলচে জল, মিলির মুখ—সব চোখের সমুখ দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

অনেক পথ ঘুরিয়া ট্যাক্সিটা যেখানে থামিল তাহারি গায়ে ইম্পিরিয়্যাল রেস্টোর‍্যাণ্ট। হোটেলটা দেখিয়া মানবের কি-একটা কথা চট করিয়া মনে পড়িয়া গেল। ক্ষুধাও তাহার পাইয়াছে—কিছু খাইয়া লইতে-লইতে বরং কিছু একটা ঠিক করা যাইবে। ট্যাক্সিটাকে ভাড়া চুকাইয়া বিদায় করিয়া দিল।

বয়কে 'এক পেগ জনি-ওয়াকার অউর এক প্লেট ফাউল-কাটলেট' আনিতে বলিয়া মানব ঘাড়ের ঘাম মুছিল। এই ঠাণ্ডায়ো গায়ে ঘাম দিয়াছে। নিরুৎসাহ হইবার কী আছে? এখুনি চাঙ্গা হইয়া উঠিল বলিয়া। বয় মদের সঙ্গে সোডা মিশাইল। সেই রঙিন মদের দিকে চাহিয়া মানবের ঠোঁটের প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল। তার চোখের সামনে মিলির হাসিটি যেন টলটল করিতেছে। জীবনে এই দ্রব্য সে কোনো দিন ছোঁয় নাই: ইহারই জন্য বাবা মাকে পথের ধারে ফেলিয়া গিয়াছেন—সেই স্মৃতি সর্বদা তাহার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিত। আজো ভরতি গ্লাশটার দিকে চাহিয়া তাহার ভয় করিতে লাগিল—ইহাতে চুমুক দিলেই যেন মিলি মা'র মতো অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি গ্লাশটাকে সে দূরে সরাইয়া রাখিল। কাটলেট সাবাড় করিয়া হোটেলের বাহিরে আসিয়া দেখিল রাস্তার লোক-চলাচল কমিয়া আসিয়াছে। সাড়ে-নটার 'শো' এই ভাঙিবে।

চৌরঙ্গির দিকে সে হাঁটিতে শুরু করিল। কী তাহার দুঃখ যাহা ভুলিবার জন্য অবশেষে সে মদের শরণ নিতে গিয়াছিল! পৃথিবীতে সেই তো পূর্ণতম—সে ভালোবাসিয়াছে ও ভালোবাসা পাইয়াছে। মদের উগ্রতায় মিলির স্নিগ্ধ স্মৃতিটিকে সে বিবর্ণ করিয়া তোলে নাই—ঈশ্বরকে প্রণাম! তিনি যে ঘরের বদলে পথের সাথী দিলেন মানব ইহার বদলে স্বয়ং ঈশ্বরকেও চায় না।

আমহার্স্ট স্ট্রীটে বিজনদের মেসএ যাইবার জন্য সে একটা বাস লইল। মেসএর দরজা বন্ধ। অনেক ধাক্কাধাক্কির পরেও কেহ দরজা খোলে না। ডাকাডাকিতেও সাড়া নাই। বাকি রাত্রিটা কোথায় কাটানো যায় ইহাই ভাবিয়া মানব হাঁপাইয়া উঠিল। এমন সময় মেসএর দরজায় সশরীরে বিজনই আসিয়া হাজির—বন্ধু-বান্ধব লইয়া পাস-এ থিয়েটার দেখিয়া ফিরিতেছে।

মানবের চেহারা ও পোশাক দেখিয়া বিজন অবাক হইয়া গেলো: তুমি এতো রাত্তে—এইখানে?

বিজনের হাত ধরিয়া মানব কহিল—তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকার আছে। না পেয়ে আরেকটু হলে আমি তো চলে যাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেলো।

তাহার সঙ্গে মানবের কী দরকার, বিজন সাত-পাঁচ কিছু ভাবিয়া পাইল না। মানব অন্যের কাছে সাহায্য-প্রার্থী, এই অপমান সে সহিল কী করিয়া? ভিড় হইতে একটু সরাইয়া নিয়া বিজন কহিল—কী দরকার?

—বিশেষ কিছু নয়, আজ রাত্রে তোমার এখানে একটু শুতে পাবো?

—স্বচ্ছন্দে। কিন্তু বাড়ি না গিয়ে আমার মেসএ—নোংরা বিছানায়!

—বাড়িতে আর জায়গা নেই।

কথা শুনিয়া বিজন বিস্ময়ে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিতেই মানব হাসিয়া উঠিল। কহিল—একটি শিশু এসে আমাকে স্থানচ্যুত করেছে। বুঝতে পারছ না হাঁদারাম? মিসেস অনুপমা চাটুজ্জে কায়ক্লেশে একটি পুত্র প্রসব করেছেন। অতএব—

বিজন তাহার হাতটা আঁকড়িয়া ধরিয়া কহিল—বলো কি?

মানব স্মিতহাস্যে কহিল—এর চেয়ে বেশি নির্বিকার হয়ে কী করে বলা যায়? আমার চেহারা দেখে কি সত্যিই মনে হয় যে আমার কিছু একটা হয়েছে? জীবনে অনেক যে বেশি লাভ করবে তাকেই অনেক বেশি ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

ইহার মধ্যে অন্যান্য বন্ধুরা কৌশলে মেসএর দরজা খোলাইয়াছে। বাড়িটার ঐ পাশ দিয়া গিয়া জানলাতে হাত বাড়াইয়া অনুকুল-বাবুর মশারির দড়িটা বারকতক নাড়িলেই এই অসাধ্য-সাধন ঘটে। তিনি তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠেন। জানলা বন্ধ করিলেও নিস্তার নাই। রাস্তায় ঢিল আছে। মেসএর রামেন্দু থিয়েটারের টিকিট-চেক করে

বলিয়া অনায়াসেই অনেককে ঢুকাইয়া দিতে পারে—সেই খাতিরেই অনুকূলবাবু এই অত্যাচার সহ্য করেন।

রামেন্দু ডাকিল : আসুন, বিজনবাবু। খুলেছে।

বিজন কহিল—থাক খোলা। আমরা এইখানেই আছি। আমি বন্ধ করবো। তারপর মানবের দিকে চাহিয়া : তারপর কী হবে?

মানব সহজ স্বরে কহিল—কী আবার হবে! একটু অসুবিধেয় পড়বো। তেমন অসুবিধে পৃথিবীতে কার নেই? কিন্তু সেই কথা আমি ভাবছি না।

—তবে কী?

—আমার বোধকরি জ্বর এসে গেলো।

—তাই নাকি? মানবের কপালে হাত রাখিয়া : সত্যিই তো। চলে এসো ভেতরে।

—তোমার বিছানায় জায়গা হবে তো?

—আগে হতো না বটে, আজ হবে। বাইরে আর দাঁড়ায় না।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া দুইজনে উপরের ঘরে উঠিয়া আসিল। চার-কোণে চারটে খাট পাতা—চারজনের একটা করিয়া কেরাসিন-কাঠের টেবিল। ঘরটা জাঁতিয়া আছে। দুই দিকে লম্বা দুইটা দড়ি খাটানো—তাহাতে কাপড়-জামা গাঁদি করা। চৌকি চারটার মধ্যে গুটি-গুটি হাঁটিবার মতো একটুখানি জায়গা—দরজার কাছে সামান্য যে একটু-খানি জায়গা আছে তাহাতে খবরের কাগজ পাতিয়া থিয়েটার-ফেরত লোকগুলি খাইতে বসিয়া গেছে। উপরের ঘরে তাহাদের জন্য ভাত-চাপা ছিলো।

রামেন্দু বলিল—বসে পড়ুন, বিজনবাবু।

এঁটো-কাঁটার পাশ কাটাইয়া দুইজনে কোনোরকমে ভিতরে ঢুকিল। সিটটা দেখাইয়া দিয়া বিজন কহিল—শুয়ে পড়ো। আর কথা নেই। শুতে তোমার কষ্ট হবে—এমন কথা আজ আর নাই বললাম।

মানব তখুনি শুইয়া পড়িল। কহিল—একটা কম্বল-টম্বল থাকে, গায়ে চাপিয়ে দাও শিগগির।

তিন জনের গায়ে দিবার যাহা কিছু ছিলো মানবের গায়ের উপর স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। কাঁপুনিটা কিছু থামিয়াছে।

তক্তপোশের উপর একপাশে বসিয়া স্বগতোক্তির মতো বিজন কহিল—কী হবে?

মানব চোখ চাহিল: কিসের কি হবে? আমার অসুখের? এর আগে বিছানায় শুয়ে কোনোদিন রোগ ভোগ করেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তার জন্যে তোমার চিন্তা করতে হবে না।

—সে-জন্যে চিন্তা করছি নাকি?

—তবে কী জন্যে? এর পর আমার কী হবে তাই ভাবছ? তার চেয়ে খেয়ে নিলে কাজ দেবে।

বিজন কহিল—তুমি কি ও-বাড়ি আর ফিরে যাবে না?

ম্লান হাসিয়া মানব কহিল—তোমার কী মনে হয়?

—তবে কী করবে?

—তবু তো এবার কিছু একটা করবার কথা মনে হচ্ছে। এতোদিন সবই যেন তৈরি ছিলো—এবার আমার তৈরি করবার পালা। কিন্তু এখন আর নয়, আরেক সময় সব তোমাকে বলবো।

জ্বরের ঘোরে চোখ বুজিয়া মানব দেখিতে পাইল সে যেন মেঘনার উপরে নৌকা করিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ মেঘনা আরব্যসাগর ও নৌকাটা প্রকাণ্ড একটা জাহাজ হইয়া উঠিল। নৌকায় মিলি এতোক্ষণ তার পাশে ছিলো, জাহাজের ভিড়ে তাহাকে আর এখন খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সে তলাইয়া গেল নাকি? মানব কি তবে মিলিকে ফেলিয়া একলাই চলিয়াছে?

২২

মানব ভারি হাতেই পড়িল। সকাল বেলার দিকে ছাড়িয়া এগারোটা বাজিতেই জ্বর ফের উঠিতে থাকে। আজ এগারোদিন।

কলাই-করা বাটিতে ঠাকুর কতকগুলি চাকা-চাকা বার্লি দিয়া গিয়াছে। একচুমুকে পরম তৃপ্তিতে মানব তাহা খাইয়া ফেলিল।

বিজন কহিল—কিসের তোমার আপত্তি? একটা খবর পাঠাই?

—না, না—মানব ব্যস্ত হইয়া উঠিল: শুধু-শুধু তাকে ব্যস্ত করা। ভাবনা ছাড়া কিছুই সে করতে পারবে না, আর করতে পারবে না ভেবে ভাবনাও তার বাড়তে থাকবে। তাছাড়া এখন হয়তো সে দেওঘরে। কিন্তু আমার একখানাও চিঠি না পেয়ে সে কী ভাবছে!

—আমি তার কথা বলছি নে। বিজন কহিল—সতীশবাবুকে খবর দিতে বলছি।

—কোনো দরকার নেই। কিছুরই তো অভাব দেখছি না। এমন সেবা—টাকাও এখন সব শেষ হয়নি।

—কিন্তু অসুখটা আর কয়েক দিন চললে তো আর এ দিয়ে চলবে না।

—যার কিছুই নেই অসুখ হলে তার যা ব্যবস্থা, আমারো তাই হবে। না চললে কোনো হাসপাতালে দিয়ে এসো।

—সে-কথা কে বলছে? কিন্তু যিনি বিপদে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁকে খবর দিতে দোষ কি?

—তুমি যদি কোনো বড়লোকের বাড়ি গিয়ে হাত পাতো, সে যত্তোটা

দোষ, এ তাই। ভিক্ষা আর আমি করতে পারবো না। মরে গেলেও না।
—এ তোমার বাড়াবাড়ি।
—সব-তাতেই আমার একটা বাড়াবাড়ি চাই। আতিশয্য না হলে আমি বাঁচতে পারি না।
—কিন্তু একটু যদি চালাক হতে তাহলে এই দুর্দশায় পড়তে না।
—অর্থাৎ না উড়িয়ে যদি কিছু হাতাতাম। সে-সঙ্কীর্ণতা আমার ছিলো না। নিজের বিজ্ঞাপন দিতে আজো আমার ভালো লাগে, বিজু।
—কিন্তু এই যুগে আতিশয্য বা আদর্শ—যাই বলো– বিড়ম্বনা। ভাবের চেয়ে বুদ্ধি বড়ো। ভালো হয়ে উঠে টোল-খাওয়া বুদ্ধিটা পিটিয়ে সোজা করে নাও। এখনো সময় আছে।
—যথা?
—বুড়োকে জপিয়ে মোটা একটা টাকা নিজের অ্যাকাউণ্টে ট্রান্সফার করে সোজা বিলেত চলে যাও। বুড়ো যখন রাজীই, তখন তুমি পেছিয়ে থাকছ কেন?
—যেতে হলে আমি নিজেই পথ করতে পারবো। এই পথ করবার স্বাধীনতা পেয়েছি এইটেই আমার সব চেয়ে বড়ো লাভ।
—এইটেই তোমার রুগ্ন মনের চরম বিকার। বিয়েতে পণ, আর বিলেত যাবার সুবিধে পেলে বিলেত—প্রত্যেক ইয়ং-ম্যানএর এই কাম্য হওয়া উচিত—যদি সে মানুষ হতে চায়। তারপর বিলেত থেকে একবার ঘুরে আসতে পারলে কনেরাও পিলপিল করে আসতে থাকবে—নইলে তোমার মিলিও দেখবে কোন দিন মিলিয়ে গেছেন।
মানব ম্লান একটু হাসিল। মি আর লি—এই দুইটি পাখায় ভর করিয়া একটি অনুভূতি সমস্ত আকাশ দেখিতে-দেখিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিজন মিলিকে দেখে নাই, তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই—তাই সে তাহাকে সমস্ত নারীজাতির সঙ্গে এক পঙক্তিতে মিলাইয়া অনুদার

মন্তব্য করিল। সে তো জানে না—মানব যাহাকে ভালোবাসিয়াছে সে আলাদা, সে একান্ত বিশেষ, সে একাকী। সে মানবের নিজের সৃষ্টি—কবির কবিতার মতো!

দুই সপ্তাহ পরে জ্বরটা ছাড়িয়া গেলো।

পরদিন কোনোরকমে সে রাস্তার দিকের বারান্দায় আসিয়া হাজির হইল। বিজন তাড়াতাড়ি একটা লোহার চেয়ার আগাইয়া দিল। কহিল—কি পথ্য করবে জেনে আসতে যাচ্ছি।

—এ আবার জানতে যাবে কি? দু-মুঠো ভাত খাবো।

—তাই বইকি। তারপর আবার চিৎ হয়ে পড়ো।

মানবের সঙ্গে নূতন করিয়া আজ পৃথিবীর পরিচয় ঘটিল। সে এতোদিন সকলের থেকে দূরে সরিয়া ছিলো, আজ জনতার মাঝে তাহার স্থান—নিপীড়িতের সঙ্গে তার বন্ধুতা, দুঃখের সে পতাকাবাহী। নিজের চারদিকে সে যেন একটা অবাধ বিস্তার অনুভব করিতেছে—নিজেকে প্রসারিত করিবার প্রেরণা। এমন দিন তাহার জীবনে যে আসিবে ইহা সে জানিত; তাই আঘাতও যেমন অপ্রত্যাশিত নয়, রোমাঞ্চও তেমনি ক্ষণস্থায়ী। তব তাহার মিলি আছে, অন্যের যাহা নাই—জীবনে এইটুকু তার আভিজাত্য।

মেঘনার পারে কলাগাছের বেড়া-ঘেরা সেই ঘর তাহার দিকে নির্নিমেষ চোখে চাহিয়া থাকে। সে চাষ করিবে আর মিলি নিড়াইবে মাটি।

বিজন ফিরিয়া আসিয়া কহিল—পথ্যগুলো আজকে একটু প্রমোশান পেয়েছে। পাঁউরুটির শাঁস আর দুধ—

—যথেষ্ট। সবাই মিলে অত্যাচারী হয়ে উঠলে আমি পারবো কী করে? কই আমায় এক দিনে চাঙ্গা করে দেবে—আমি হাওয়া বদলাতে দেওঘর যাবো—তা না, আমাকে খালি বিছানায় শুইয়ে রাখবার ষড়যন্ত্র!

—দেওঘর যাবে না কি ? গিয়ে তাকে বলবে—দাও ঘর !

বিজন হাসিয়া উঠিল। তারপর টিপ্পনি কাটিয়া কহিল—প্রবল জ্বরের সময় পুরুষের প্রবল হাতের সেবা পেলে চলে যায়, কিন্তু কনভ্যালাসেণ্ট অবস্থায় কোমল হস্তের পরশ চাই ! এই তো দিব্যি তুমি চালাক হয়ে উঠছ।

—উঠছি না কি ?

—তবে বেশি চালাক হতে গিয়ে যেন বিয়ে করে বোসো না।

না, মিলির কথামতো উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ সে দীর্ঘতর করিয়া তুলিবে। মিলির জন্য নূতন করিয়া সে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করিবে। আগে সে ছিলো নিতান্ত পরাধীন, এই দৈন্যের মহিমায় এখন সে বেশি উজ্জ্বল !

মানব কহিল—কিন্তু টাকা-পয়সা সব ফুরিয়ে গেলো, বিজু।

মানবের মুখে কথাটা কেমন অদ্ভুত শোনায়।

—সতীশবাবুর কাছ থেকে ভরতি করে আনলেই হয়।

সেই কথা কানে না তুলিয়া মানব বলিল—দেওঘরে নিশ্চয়ই এখন শীত পড়ে গেছে। কিছু জামা-কাপড়ও কিনতে হবে। শেষকালে থার্ড-ক্লাশের ভাড়া কুলুলে হয়। কতো ভাড়া জানো ? এতদিন তো তোমার জিনিস-পত্র দিয়ে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দিলাম। কিন্তু নিজে তো একটা পথ দেখতে হবে।

—এখন দয়া করে বিছানায় শুয়ে-শুয়েই পথ দেখ।

মানব বিছানায় আসিয়া শুইল।

পথ বাহিয়া অগণিত মানুষের মিছিল চলিয়াছে। তাহাদের পায়ের সঙ্গে মানবও মনে-মনে পা মিলাইয়া চলিতে লাগিল।

২৩

দিল্লি-এক্স্‌প্রেস্‌এ দেওঘর সে যাইতেছে বটে, কিন্তু মানবের কেবলই মনে হইতেছে, সে—কি না সেই নাম—নোয়াখালি চলিয়াছে। সেখানকার জীবনের প্রশান্ত নিস্তব্ধতার সঙ্গে মিলির কোথায় একটি মিল আছে—ছবিতে বিশেষ একটি রঙের সঙ্গে বিশেষ একটি রঙের অপূর্ব মিলের মতো। সেইখানেই সে থাকিবে—পশ্চিমে ধানের ক্ষেত, দক্ষিণে নরম চর, পুবে সহরের দিকে রাস্তার একটি ক্ষীণ সূচনা। সেইখানে সে ঠিক যে কী করিবে এখুনি তাহা ভাবিয়া পায় না—ভাবিবার দরকারো নাই। নিজের ভিটে ছাড়িয়া সে কোথায় কোন পরের বাড়িতে গিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল; সেই বাড়িতেও তাহার স্থান হইল না—তাহারই নিজের বাড়ি আবার চারদিকের সবগুলি জানালা মেলিয়া দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটায় সে এখন অত্যন্ত মজা পাইতেছে।

চলিয়াছে থার্ড-ক্লাশে। সঙ্গে সতরঞ্চি ও কম্বলে জড়ানো দুইটা বালিশ ও একটা টাইম-টেবল। চলিবার সময় সঙ্গে টাইম-টেবল রাখাটা তার একটা ফ্যাশান ছিলো—লিলুয়া যাইতে হইলেও তাহা হাতছাড়া হইত না। পুরানো দিনের সেই অভ্যাসটি এখনো রহিয়া গেছে।

দেওঘরে এই সে প্রথম চলিয়াছে। কোথায় গিয়া উঠিবে ঠিক নাই। মিলিদের বাড়ি খুঁজিয়া না পাইলে ধর্মশালায় রাতটা কোনোরকমে কাটানো যাইবে হয়তো। 'রোহিণী'র দিকে সোজা দক্ষিণে যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে তাহারই গায়ে তাহার ছোট-কাকার বাড়ি—মিলি তাহাকে এই কথাটুকু শুধু বলিয়া দিয়াছিল। এই সম্পর্কে ভাঙা-ভাঙা

আরো দুয়েকটা কী কথা বলিয়াছিল মানব তাহাতে কান দেয় নাই। কিন্তু তাহার ছোট-কাকা কী করেন, কী বা তাঁহার নাম, 'রোহিণী'ই বা কোথায় কে খবর রাখে।

বৈদ্যনাথধামে গাড়ি পৌছিল প্রায় সন্ধ্যায়।

হয়তো মিলি সঙ্গীর অভাবে একা-একা স্টেশনেই বেড়াইতে আসিয়াছে। নূতন কোন কোন যাত্রী আসিল বা পরিচিত কেহ আসিল কি না স্টেশনে আসিয়া তাহার খোঁজ নিতে মিলির ভালো লাগা উচিত। তাহা ছাড়া তাহার যে-কোনো দিনই আসিবার কথা ছিল।

ব্যাপারটা খুব সহজ হইল না। স্টেশনেরই কাছে ধর্মশালা একটা আছে বটে, কিন্তু তাহার ভিতরের চেহারা দেখিয়া মানবের সমস্ত কবিত্ব শুকাইয়া গেল। কিন্তু তাহা ছাড়া গতিই বা কোথায়? ফিরতি ট্রেন? তারপর?

উপরের তলাটা বোঝাই—নিচের তলায় রাস্তার উল্টা দিকে একখানা ঘর জুটিল। এই সব খেলো বিলাসিতা লইয়া মানবের আর স্পৃহা নাই; মিলির দেখা পাইলেই সে বাঁচে। ঘরটা খোলা রাখিয়াই সে বাহির হইয়া যাইতেছিল; দারোয়ান বলিল—একটা তালা লাগিয়ে যান।

মানব কহিল—একখানা কম্বল মাত্র আছে। কেউ নেবে না।

—না, না, ঘরটাও বেহাত হয়ে যেতে পারে। এ সময় ভারি ভিড়।

—আচ্ছা, একটা কিনে নিয়ে আসছি। ততোক্ষণ তুমি একটু চোখ রাখো—

রাস্তায় পড়িয়াই একজন ভদ্রলোককে মানব জিজ্ঞাসা করিল—'রোহিণী' কোথায় বলতে পারেন?

প্রশ্ন শুনিয়া ভদ্রলোক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন—রোহিণী? সে তো বঙ্কিমবাবুর বইয়ে।

যাহাকে জিজ্ঞাসা করে কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। যিনি

মন্দিরের চূড়ার দিকে হাত দেখান, তাঁহারই সঙ্গী হাত দেখান উল্টা দিকে। দেখিতে দেখিতে রাত হইয়া আসিবে। মনে পড়িল কাল কলিকাতায় সে চাঁদ দেখিয়াছে। কথাটা মনে করিয়া সে একটু খুশি হইল। আরো খানিকটা খোঁজা যাইবে। জ্যোৎস্না পাইয়া সবাই হয়তো এখুনি ঘর নিবে না। চাই কি, চোখের সামনে পথেরই উপর তাহার সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে।

আবোল-তাবোল হাঁটিতে লাগিল। বাঁ-দিকের রাস্তাটায় শাদা পাথরের কুচো ছড়ানো আছে—অতএব ঐপথে রোহিণী, কিম্বা ঐ উঁচু বাঁধটার পারে নির্জন মাঠের মধ্যে ঐ যে একখানি বাড়ি দেখা যায় কে জানে তাহারই এক কোঠায় মিলি এখন হাতির দাঁতের চিরুনি দিয়া চুল আঁচড়াইতেছে না।

সোজা চলিতে-চলিতে মানব হঠাৎ থামিয়া পড়িল। তিন দিকে তিনটা রাস্তা। কোনটা সুন্দর বা মিলির পক্ষে বেড়াইবার উপযুক্ত মনে মনে তাহাই সে বাছিতে লাগিল। হঠাৎ চোখে পড়িল রাস্তার ধারে একটা পোস্টে লেখা আছে—টু রোহিণী।

বাঁয়ের রাস্তা।

রাস্তা যেমন ফুরায় না—বাড়িও তেমনি মাত্র একখানা নয়। কোনো বাড়িই মানবের মনের মতো হয় না। এইবার সোজা সে রাস্তাটায় টহল দিয়া আসুক, ফিরিবার সময় একটা-একটা করিয়া বাড়িগুলিতে ঢুকিয়া-ঢুকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিবে—হ্যাঁ, কী-ই বা জিজ্ঞাসা করিবে? গৃহস্বামীর নাম পর্যন্ত জানে না। জিজ্ঞাসা করিবে মিলির ছোট-কাকা এখানে থাকেন? রোগা শরীরে মার সে সহ্য করিতে পারিবে না।

নিজের মনে হাসিয়া সে আস্তে আস্তে হাঁটিতে লাগিল। এখানে দস্তুর-মতো শীত। কম্বলটা গায়ে দিয়া বাহির হইলেই হইত। সন্ন্যাসী সাজিবার আর বাকি কী! যাই হোক, ফিরিবার পথে স্বয়ং মিলিরই সঙ্গে

দেখা হইবে—ততোক্ষণে তাহার বেড়ানো শেষ হইয়া গেছে। তাই সামনে আগাইবার সময় বারে বারে সে পিছনে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল সত্যসত্যই মিলি কোনো বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল কি না।

এটা কার বাড়ি? মানব থামিয়া পড়িল। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? কী-ই বা দরকার—সামনে গিয়া সোজা মিলি বলিয়া ডাকিলেই—ব্যস্। তাহার পর হাত ধরাধরি করিয়া—রাস্তাটা তো নির্জনই আছে—দুইজনে দক্ষিণে আরো খানিকটা বেড়াইয়া আসিবে—কিম্বা ঐ যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া পাহাড় একটা গুম হইয়া পড়িয়া আছে—সেখানে। আজই অবশ্য তাহার দুঃখের কথা বলা হইবে না। তাহার দুঃখের কথা। মানব নিজের মনেই হাসিল।

সে স্পষ্ট মিলির গলা শুনিল—কি-একটা কথায় সে আর কাহার সঙ্গে একত্রে হাসিয়া উঠিল। হ্যাঁ, ঐ বাড়িটাতেই। কিন্তু কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহস্বামীর নামটা জানিতে পারিলেই সে আর কিছু চায় না। যাক, একটা লোক হাতে একটা টর্চ লইয়া সাইকেলে করিয়া এই দিকে আসিতেছে। লোকটা কাছে আসিয়া পড়িতেই মানব জিজ্ঞাসা করিল—ওটা কার বাড়ি বলতে পারেন? এই যে সামনে বড়ো বাড়িটা।

—ডাক-বাংলো! হ্যাঁ, এইবার মানবের মনে পড়িতেছে! মিলি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছিল ডাক-বাংলোর পাশেই তাহার ছোট-কাকার বাসা। তবে—ঐ বাড়িটা। মানব বিশেষ খুশি হইতে পারিল না। ছোট একতলা বাড়ি—সামনে বাগান নাই একটুও, ছাতে বাঁশ খাটাইয়া দড়িতে কখন কাপড় শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে—রাত্রেও ঘরে নিবার নাম নাই। চারদিকে কেমন যেন অপরিচ্ছন্নতা। মিলিকে এই বাড়িতে মানাইবে না।

তবুও সে সেই দিকেই পা চালাইল। বারান্দায় একটা চেয়ারে বসিয়া ওয়াল-ল্যাম্পের আলোতে একজন ভদ্রলোক মুখ ঢাকিয়া খবরের কাগজ

পড়িতেছেন। মানব সিঁড়ির কাছে আসিতেই ভদ্রলোক জুতার শব্দে মুখ তুলিয়া কহিলেন—কে ?

মানব থমকিয়া গেল। মুখ দিয়া বাহির হইল—আমি।

চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া ভদ্রলোক কহিলেন—কী চান ?

এক পা সিঁড়িতে এক পা মাটিতে—মানব বলিল—মিলি এখানে আছে ?

—মিলি ? কে মিলি ? ভালো নাম কী ?

ভদ্রলোক তাহার মুখে উত্তর না পাইয়া আবার কহিলেন—ভালো নাম জানেন না ? কয় বছরের খুকি ?

—ঠিক খুকি কি ?

—আপনিই বলতে পারবেন। মেয়ে কার ? কোথায় আছে ?

—মেয়ে নোয়াখালির হীরালালবাবুর। এখানে আছে কি না—তাই তো জিগগেস করছি।

—এমনি জিগগেস করতে করতে কদ্দুর যাবেন ?

মানবও ঠেস দিয়া উত্তর দিল: এখেনে ওর দেখা পেয়ে গেলে আর যাবো কেন ? এখেনেই থেকে যাবো।

—বটে ? ভদ্রলোক চেয়ারে নড়িয়া বসিলেন : আপনি আছেন কোথায় ?

—ধরুন না, আপাততো এখেনে এসেই উঠছি।

—আপনার নাম ?

—তাতে আপনার কোনো ইণ্টারেস্ট নেই। মিলি যদি এখানে থাকে ও এখন বাড়িতে থাকে, দয়া করে তাকে একটিবার ডেকে দিন।

মানবের আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করিয়া একটু শ্লেষের সুরে ভদ্রলোক কহিলেন—আপনার সঙ্গে মিলি না ফিলির কোনো আত্মীয়তা আছে ?

—আছে বৈ কি।

—কী আত্মীয়তা ?

—সে-কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। বললেই বা আপনি বুঝবেন কেন ?

—ও একই কথা। ভদ্রলোক কহিলেন—কদ্দিনের আলাপ ?

—অতো কথা জানবার আপনার কী দরকার ? মানব এইবার দস্তুরমতো চটিতেছে : মিলি যদি এইখেনে থাকে তো ডেকে দিন। আমার কাজ আছে। আপনার সঙ্গে অনর্থক বকবার সময় নেই।

—নেই নাকি ? সরি, আমি তা জানতাম না। নমস্কার। ভদ্রলোক হাত তুলিলেন।

—মিলি তবে এইখেনে নেই ?

—আমি তা বলেছি ? আপনার সময় না থাকলে কী করা যেতে পারে বলুন। সময় যদি থাকে তো রাস্তায় পাইচারি করতে থাকুন, দেখা হয়ে যেতে পারে। এখনো বেড়িয়ে সে ফেরেনি।

—তাহলে এই বাড়িতেই সে আছে ? কবে এসেছে ? কোথায় গেছে বেড়াতে ?

—অতো কথা জানবার আপনার কী দরকার ? আপনার সঙ্গে অনর্থক বকবার আমার সময় নেই। বলিয়া ভদ্রলোক কাগজ তুলিয়া ফের মুখ ঢাকিলেন।

২৪

ত্রিকূট হইতে মিলিরা সন্ধ্যার খানিক পরেই বাড়ি ফিরিয়াছে। বাড়ি আসিয়াই হাত-পা ছড়াইয়া সটান বিছানায়। কাকিমা আবার চা খাইতে ডাকিতেছেন—মিলির এ তৃতীয় কাপ।

সুবিনয় ঘরে ঢুকিয়া কহিল—আমার বোধ করি সপ্তিতিতম।

মিলি আড়মোড়া ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল। আড়মোড়া ভাঙিতে-ভাঙিতে: আমার যা ব্যথা করছে, কাকিমা। জ্বরে না পড়ি। পা দুটোয় তো ফ্ল্যানেল জড়াতে হবে। হাতের তালু দুটো ছড়ে গিয়ে কিছু আর নেই। ঈষৎ কান্নার সুরে: আমার কী হবে?

কাকিমা গম্ভীর হইয়া কহিলেন—কী আবার! ঘুম।

চায়ে চুমুক দিয়া সুবিনয় কহিল—আমাদের সঙ্গে বাঁধা সিঁড়ি ধরে সোজা নেমে এলেই পারতেন। মিছিমিছি ঘুর-পথে বাহাদুরি করতে গিয়ে কী লাভ হলো?

—যে-পথই নিজে বেছে নিই না কেন, অন্যের চোখে তো তা ঘুর-পথ বলেই মনে হবে।

—কিন্তু লাভ হলো কী? জখম হয়ে আইডিন লাগানো।

—অন্যের চোখে তো জখমটাই বড়ো বলে মনে হবে। কিন্তু বিপদের মুখে একা যাওয়াটা তো আর দেখবেন না।

সুবিনয় হাসিয়া কহিল—মেয়েরা একা যখন এমনি একটা কিছু অসমসাহসিক কাজ করবার জন্য এগোয় তখন শেষও হয় এমনি প্রহসনে।

কাকিমা বাধা দিয়া কহিলেন—খবরদার, আর তর্ক নয়। শুনে-শুনে কান দুটো আমার ঝালাপালা হয়ে গেলো।

সুবিনয় কহিল—আর মাত্র দু-চুমুক, দিদি। চা ফুরিয়ে গেলে তর্কও জুড়িয়ে যাবে। মেয়েদের সঙ্গে তর্ক আবার কতোক্ষণ করতে হয়?

মিলি ভুরু কুঁচকাইয়া কহিল—মেয়েদের নিন্দে করাটা বুঝি আজ-কালকার ছেলেদের ফ্যাশান?

—এবং—সুবিনয় বিনীত হইয়াই কহিল—নিন্দেটাও আজকালকার মেয়েদেরই। এবং নিন্দে শুনে দুঃখিত হওয়াটাও মেয়েলি।

মিলির কাকিমা অর্থাৎ সুবিনয়ের দিদি সুরমা কহিলেন—আমি কিন্তু চা আর করে দিতে পারবো না। তোর দু-চুমুক—

—এই শেষ হলো। কিন্তু উনি যখন সত্যিই অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন তখন আমারো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা উচিত। অর্থাৎ—

—অর্থাৎ তোরও পিঠটা ছড়ে গেছে।

—কী করে বুঝলে বলো তো? আশ্চর্য।

—গেছে তো? দিদি হাসিয়া উঠিলেন।

মিলিও হাসিল।

—তবে ভালো করেই হাসুন। বলিয়া সুবিনয় গা থেকে র‍্যাপারটা খুলিয়া ফেলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সিল্কের জামাটা মেরুদণ্ডের কাছে সোজা ছিঁড়িয়া দুই দিকে আলাদা হইয়া গেছে।

ঠিক এমনি সময় এদিকে ছোটকাকার পায়ের শব্দ আসিতেছে। সুবিনয় র‍্যাপারটা তাড়াতাড়ি গায়ে টানিয়া কহিল—আমি পালাই। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলেই জামাইবাবুর গোঁফজোড়া ঘনিয়ে ওঠে।

সুরমা হাসিতেই সুবিনয় কহিল—গৌরবে 'মেয়েদের'।

ছোটকাকা ভেতরে আসিয়াই মিলিকে কহিলেন—তোকে কে যেন ডাকতে এসেছিল—

মিলি লাফাইয়া উঠিল : বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ? ভেতরে আসতে বলো।
—ভেতরে আসতে বলবো কী! ছোটকাকা একটা চোখকে ঈষৎ ট্যারা করিয়া কহিলেন : তার পর রুক্ষস্বরে : তাকে আমি ভাগিয়ে দিয়েছি।
সুরমা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন—ভদ্রলোককে তুমি ভাগিয়ে দিলে? বলো কী?
—ভদ্রলোক না আর কিছু! একমাথা চুল, গায়ে করে রাস্তার সমস্ত ধুলো তুলে এনেছে। জেলের ছাড়া-পাওয়া কয়েদীর মতো চেহারা। নাম জিগগেস করলুম, নাম বলবেন না ; মিলির সঙ্গে কোথায় তার পরিচয় কোনো-কিছুর হিসেব নেই। আর কী সব ত্যাড়া কথা! মুখের ওপর যেন জোরে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলো : মিলি এখানে আছে? আমি বলে সিম্প্লি চলে যেতে বললাম, অন্য লোক হলে ঘাড় ধরে বিদেয় করতো।
—ইঃ? সুরমা ঘাড় বাঁকাইয়া কহিলেন—ঘাড় ধরতেন! উল্টে তোমাকেই মারতো ঘুসি।
—এই রোগা জিরজিরে চেহারা। নরেশবাবু আঙুলটা বার কয়েক নাড়িলেন : কতোদিন যেন খেতে পায়নি। গা থেকে খোট্টাই একটা গন্ধ বেরুচ্ছে।
মিলি এতোক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল। এইবার নিশ্বাস ফেলিয়া সে বাঁচিল। এমন বর্ণনার সঙ্গে সে কাহাকেও মিলাইতে পারিল না—আর কেই বা আছে। রোগা জিরজিরে—সারা গায়ে ধূলা—মানব যে আসিয়া ফিরিয়া যায় নাই ইহাতেই সে বাঁচিয়াছে।
সুরমা কহিলেন—চিনিস নাকি এমন কাউকে?
আরেকবার নিজের মনের মধ্যে দৃষ্টি ডুবাইয়া মিলি কহিল—কক্‌খনো না।
নরেশবাবু বলিলেন—যার-তার সঙ্গেই বন্ধুতা পাতিয়ে বসিস নাকি?
—বা, কার আবার বন্ধু হলাম?
সুবিনয় টিপ্পনি না কাটিয়া পারিল না : কলেজের বাসএ যেতে দেখে

থাকবে। এইখেনে একটু য়্যাডভেঞ্চার করতে এসেছিল। আপনার শরীরে কুলুবে না বুঝলে আমাকেও তো ডাকতে পারতেন।

সুবিনয়ের কথায় বিরক্ত হইলেও মিলিকে সায় দিতে হইল : কে না কে, কোত্থেকে এসেছে। অমন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে যাবো কেন?

—কোন দুঃখে? সুবিনয়ই কথা কহিল—আমার সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দিলে পারতেন।

সুরমা কহিলেন—তা হলে আমরা একটা ডুয়েল দেখতে পেতাম।

—যাও, যাও। বাজে বোকো না। নরেশবাবু সুবিনয়ের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাহিলেন : তোমার দুমকায় যাওয়া কী হলো? ছুটি আর কদ্দিন?

—এই রে। মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে সুবিনয় কহিল—কোর্ট খুলতে এখনো দু-চার দিন বাকি আছে। দুমকা কাল যাবো ভাবছি।

—ভাবছি নয়। কালই চলে যাও।

সুরমা হাসিয়া কহিলেন—তুমি হাকিমকে হুকুম করছ কী?

—না, না, এখনো হুজুর হতে পারিনি দিদি, মাত্র ট্রেজারিতে বসে দুটো দস্তখৎ করে খালাস।

নরেশবাবু কহিলেন—রাত্রে দুমকার বাস পাওয়া যায়?

—ওকে আজই তাড়াচ্ছ কী! সুরমা কহিলেন—দেখছ না ও যাচ্ছে শুনে আরেকজন আগেই অদৃশ্য হয়েছে।

—কী বলো যা তা। মিলি কোথায় গেলো? মিলি!

বারান্দা হইতে জবাব আসিল : এই যে।

রাস্তায় কাহাকেও দেখা গেলো না। কে আসিয়াছিল? কে আসিতে পারে? কলিকাতায় গিয়ে অবধি একখানিও চিঠি লেখে নাই। একখানি চিঠি পাইবার আশায় মনে-মনে সে অবহেলিতা পল্লী-স্ত্রীর মতো মরিয়া মরিতেছিল। রাজধানীর বিপুল অরণ্য-মর্মরের মাঝে তাহার ঐ ক্ষীণ নিশ্বাসটি আর শোনা যায় নাই।

অণিমাদের সেই সতর্ক-বাণীই তাহাকে বারে-বারে শাসাইতেছিল।

কিন্তু তাহাকে মিলি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে! তাহার নাম মিলি—এ আর কে জানে, কার কাছ থেকে শুনিয়াছে—

রোগা জিরজিরে চেহারা। এক গা ধুলো। চেহারা ঠিক জেলফেরত কয়েদীর মতো।

হয়তো নিজে না আসিয়া তাহার খোঁজ নিতে আর-কাহাকেও পাঠাইয়া দিয়া থাকিবে। অসীম দয়া। বেশ হইয়াছে, ফিরিয়া গিয়াছে। নিজে যখন আসিতেই পারিল না, তখন দূত পাঠাইবার কী হইয়াছিল!

দেওঘরে আসিয়াও মিলির শান্তি নাই। যে তাহাকে ভুলিয়াছে, সেও তাহাকে স্বচ্ছন্দে ভুলিয়া যাইতে দিবে—তাহারই চিঠি লিখিবার এমন কী দায় পড়িয়াছে! তাহাকে যদি সে না চায়, তাহারই বা গলায় ভাতের গ্রাস ঠেকিয়া থাকিবে নাকি? এই মনে করিয়াই সে শোভা-দিকে তাহাদের হসটেলে একটা সিট রাখিতে লিখিয়া দিয়াছে। এতোদিন অনর্থক সময় কাটাইয়াছে ভাবিয়া অতি দুঃখে সে দেওঘরে আসিয়াই তাহার পাঠ্যপুস্তক খুলিয়া বসিয়াছিল।

কিন্তু উৎপাত জুটিল সুবিনয়। ব্যাগি প্যাণ্টালুন আর ফেল্ট হ্যাটের জ্বালায় অস্থির। জামাটা কখনই অতোখানি ছিঁড়ে নাই, বাকিটা সে হাত দিয়া ছিঁড়িয়াছে। সস্তা একটু বাহাদুরি করিতে মাত্র। তাহার বড়োলোকির মাঝে কোথায় একটা উৎকট নির্লজ্জতা আছে, ঐশ্বর্য নাই। সুবিনয়কে সে দু-চক্ষে দেখিতে পারে না। কাকিমার ভাই ও নেহাত বি. সি. এসএ ফার্স্ট হইয়া নূতন ডেপুটি হইয়াছে বলিয়া যা-একটু সমিহ করিতে হয়।

কে যে আসিয়াছিল শুইয়া-শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। ঘুমের মধ্যে তাহার কোনো কূল-কিনারা পাওয়া গেল না।

কাকিমা ভোরে উঠিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিল: কালী-মন্দির দেখে আসি চলো।

এতো সকালেই কাকিমার ভক্তি উথলিয়া উঠিতে দেখিয়া মিলি বিশেষ ভরসা পাইল না। তবু চোখে-মুখে জল দিয়া শাড়িটা তাড়াতাড়ি বদলাইয়া লইল।

যা কথা—সঙ্গে সেই সুবিনয় জুটিয়াছে।

নরেশবাবু মশারি থেকে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—তোমরা একেবারে ধন্ম দেখালে। খুঁটি-ছাড়া পেয়ে খুব ল্যাজ তুলেছ দেখছি।

সবাই ভয়ে নিঃশব্দে একটু হাসিয়া গুটি-গুটি বাহির হইয়া গেল।

সুবিনয় কহিল—তোমরা স্বাধীন হতে গিয়ে একেবারে টেক্কা দিলে যা-হোক। এমন জ্বলজ্যান্ত বাবা বৈদ্যনাথ থাকতে কোথাকার কে না-কোন কালী দেখতে ছুটেছ।

সুরমা মিলির কনুইয়ে একটা ঠেলা দিয়া কহিলেন—লেগে যাবি নাকি তর্ক করতে?

সুবিনয় হাসিয়া কহিল—এক পেয়ালা চা-ও উদরস্থ হয়নি যে।

একটিও কথা না কহিয়া মিলি হাঁটিতে থাকে। ছড়ি দিয়া সুবিনয় অগত্যা ধানের শীষগুলিকে মারিতে-মারিতে অগ্রসর হয়।

ফিরিবার সময় মিলি সবাইর আগে-আগে। পিঠের আঁচলটা নৌকার পালের মতো ফুলিয়া উঠিয়াছে।

সুরমা ডাকিলেন—আস্তে মিলি।

সুবিনয় টিপ্পনি কাটিবেই: গিয়েই একেবারে গরম জল চাপিয়ে দিন।

রাস্তার উপর মিলি যেন কাহাকে দেখিয়াছে। সেও তাহাকে দেখিবার জন্য থামিয়া আছে। না, মানব নয়। পিছনটা দেখিয়া তাহাই মনে হইতেছিল বটে।

কিন্তু লোকটা যে তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

মানবই তো। এ কী চেহারা!

কাকিমা ও তাহার উপযুক্ত ভ্রাতা তখনো কিছু পিছে।

মিলি আঁক করিয়া হটিয়া গেল: এ তোমার কী চেহারা হয়ে গেছে?

অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ স্বরে মানব কহিল—খুব অসুখ করেছিল।

মানবের দিকে ভালো করিয়া তাকানো যায় না: কিন্তু এ কী পোশাক?

মানবের ঠোঁটে একটুখানি শুকনো হাসি ভাসিয়া উঠিল: সে প্রকাণ্ড ইতিহাস। তুমি আমার সঙ্গে এই দিকে একটু আসবে?

মিলি যেন অপ্রস্তুত হইয়াছে এমনি করিয়া কহিল—কিন্তু আমার সঙ্গে যে কাকিমা আছেন। শুধু কাকিমা নয়—মানব চাহিয়া দেখিল—আরেকজন।

মিলির কথা তখনো শেষ হয় নাই: তুমি আছো কোথায়? এখেনে ভালো হোটেল আছে তো?

—জানি না। আছি ধর্মশালায়।

—ধর্মশালায় কেন?

—সেই কথাই তো বলবো। চলো না একটু।

—তুমিই বুঝি কাল আমাকে খুঁজতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। রাত্রে তুমি কতোক্ষণ পর্যন্ত বেড়াও?

—না, কাল তো আমি বাড়িতেই ছিলাম। কাকা ভীষণ কড়া—আচ্ছা, তুমি এক কাজ করো। কাল দুপুরে এসো, এই একটায়—ঐ জসিডির রাস্তার মোড়ে। চেন তো? কালকেই সব কথা হবে। কাকিমারা এসে পড়লেন। এখন বেশ ভালো আছো তো?

'কাকিমারা এসে পড়লেন'—ইঙ্গিতটা মানব বুঝিয়াছে। তবু কাল-ও একবার সে আসিবে।

মানব মাঠ দিয়া নামিয়া গেল।

সুবিনয় টিপ্পনি কাটিবেই: আপনার বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায়ই দেখা হয়ে গেলো যা হোক। বন্ধুর অধ্যবসায় আছে।

মিলি তাহার কথায় জ্বলিয়া উঠিল: আমার আবার বন্ধু কে। নন্দন-পাহাড়ের রাস্তা জানতে চাইলে, দেখিয়ে দিলাম।

সুবিনয় হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, ঐ মাঠ দিয়েও যাওয়া যায় বটে।

২৫

মিলি পা টিপিয়া-টিপিয়া নরেশবাবুর ঘর পার হইল। রাস্তায় নামিয়া কোনো দিকে আর দৃকপাত নাই।

কাকিমাকে সে বলিয়া আসিয়াছে বটে যে বীণাপাণিদের বাড়ি সে বেড়াইতে চলিল। বীণা তাহার কলেজের চেনা—এই পাড়াতেই থাকে, দুই পা আগে। এও সে বলিয়াছিল যে বীণাদের সঙ্গে সে তপোবন দেখিয়া আসিবে, ফিরিতে রাত হইলে যেন চাকরদের হাতে লণ্ঠন দিয়া এখানে-সেখানে খুঁজিতে না পাঠায়। কাকিমা বলিলেন : না, না; চারটের আগেই ফিরে আসিস যেন। বিকেলে উনি সবাইকে নিয়ে রিখিয়া বেড়াতে যাবেন বলেছেন, তখন তোকে না পেলে চটে-মটে কাঁই হয়ে যাবেন। দেখিস।

এখন না-জানি কটা? সুবিনয় যে হুইসট খেলিতে আসিয়া-ফিরিয়া যাইবে ইহাতে সে ভারি আরাম পাইল।

কাল তাহার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা বলা পর্যন্ত হয় নাই। ধর্ম-শালায় আসিয়া উঠিয়াছে। চুলগুলি না-হয় অসুখের জন্যে ছোট করিয়া ছাঁটা, কিন্তু তাই বলিয়া জামা-কাপড়ে অসম্ভব ময়লা লাগিয়া থাকিবে! এই বোধহয় একরকম ফ্যাশান। কে জানে?

রোহিণীর রাস্তা যেখানে ট্রেনের লাইন কাটিয়া গিয়াছে—তারই ধারে মানব মিলির প্রতীক্ষা করিতেছিল। মানব লাইনের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—মিলি আসিতেছে পিছনে। কাছাকাছি আসি-তেই পদক্ষেপগুলি মিলি ছোট ও মন্থর করিয়া ফেলিল। একেবারে

মানবের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—কালকে আমার ওপর চটোনি তো ?

সেই মিলি! আজো কিনা তাহার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়ায়।

মানবের যেন কিছুই হয় নাই, সেই আগের মতোই হাসিয়া বলে: চটেছি আজকে। কতোক্ষণ আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ জানো?

—কিন্তু কী করে আসি বলো? যে কড়া পাহারা। আমাকে আবার চারটের আগেই ফিরতে হবে। এখন কটা? আন্দাজ?

—দুটো হবে।

—কী রোদ! কোথাও যাই চলো।

মানব কহিল—চলো দারোয়া নদীর কাছে। জসিডি যাবার ব্রিজ-এর ওপর।

—উৎকট কবিত্ব। ধুলো উড়িয়ে মোটর ছুটেছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার চেয়ে একটা ট্যাক্সি নাও। মন্দিরের দিকে খানিকটা এগোলেই মিলে যাবেখন। চলো, রিখিয়া ঘুরে আসি।

—কিন্তু পয়সা কই ?

অবাক হইয়া মিলি মানবের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মানব হাসিয়া কহিল—ফিরে যাবার মাত্র ট্রেন-ভাড়া আছে। বিশ্বাস করবার কথা নয়, কিন্তু পয়সা কোত্থেকে পাবো বলো।

—জানি না। ট্যাক্সি একটা যোগাড় করো শিগগির।

—তাহলে পা চালিয়ে একটু হাঁটো। ঐ চূড়ো দেখা যাচ্ছে মন্দিরের অতোদূর অবিশ্যি হাঁটতে হবে না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখছ ?

মিলি নিঃশব্দে হাঁটিতে লাগিল।

মানব কহিল—কথা কইছ না কেন ?

—একটা খবর পর্যন্ত দিলে না! অসুখ করলো বলেই তো বেশি করে

খবর দেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু এ তোমার কী দুর্দশা হয়েছে?

—বলছি।

কতোদূর আসিতেই খালি একটা ট্যাক্সি মিলিল।

মিলি পা-দানিতে পা রাখিয়া কুঁজো হইয়া গাড়িতে উঠিতে-উঠিতে কহিল—রিখিয়া চলো। চারটের আগেই রোহিণীর রাস্তায় নামিয়ে দেবে আমাদের।

অর্থাৎ মিলিই ভাড়া দিবে। সে-ই কর্ত্রী।

আঁকা-বাঁকা রাস্তা—খানিকটা সমতল হইয়াই উৎরাই; তারপর রাস্তা আবার খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। ধূ-ধূ করে মাঠ—ঘাসের রঙ প্রায় হলদে, মাটির রঙ প্রায় লাল। গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে ত্রিকুটও সমানে চলিয়াছে।

মানবের হাঁটুর উপর আলগোছে বাঁ-হাতখানি তুলিয়া দিয়া মিলি কহিল—তারপর?

সেই হাতের উপর হাত রাখিয়া মানব শুকনো গলায় কহিল—তারপর যা হবার তাই হয়েছে—হুবহু। তোমাকে একদিন বলে-ছিলাম না যে আমি পৃথিবীতে কিছু একটা করতে এসেছি, প্রাণ ভরে অহংকার করবার মতো? মনে আছে?

মিলি কিছু বুঝিতে পারিল না।

—এতোদিন পরে সেই সুযোগ বুঝি এলো। আমার দুই হাতে আজ অজস্র স্বাধীনতা।

মিলি সামান্য একটু সরিয়া বসিয়া কহিল—ঘটা না করে যদি বলো তো বুঝতে পারি।

হাতের উপর চাপ দিয়া মানব কহিল—না, ফেনিয়ে বলবার কথাও তেমন নয়। জলের মতো সোজা। তোমার মাসিমা এতোদিন বাদে অকারণে—ঠিক অকারণে নয়—পুত্রবতী হয়েছেন। এবং কাজে কাজেই—

মিলির মুখ হইতে খসিয়া পড়িল: কাজে কাজেই—

—আমি বিতাড়িত হয়েছি।

মিলি পাথর হইয়া গেল। এবং মিলি কী বলে তাহাই শুনিবার জন্য মানব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! সে-মুখ দেখিতে-দেখিতে নিবিয়া যাইতেছে।

—বলো কি? মেসোমশায় তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

না, দয়া বা কর্তব্য—যাই হোক, তিনি আমাকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আর আমি ধরা দেব কেন? ছাড়া যদি পেলাম-ই—

—আর মাসিমা?

—তাঁকে আমি দোষ দিতে পারি না, মিলি। তিনি আমাকে রাস্তা দেখতে বললেন। মিথ্যে অভিমান করছি না, কিন্তু এর পর কে কবে মখমলের বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকতে পারতো?

মিলির মুখ এখনো শুকাইয়া আছে। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখন কী হবে?

—কী আবার হবে। মানব দুই হাত বাড়াইয়া মিলিকে গায়ের উপর টানিয়া আনিল: তুমিই তো আমার আছো।

হাওয়ার মুখে শীতের পাতার মতো মিলি নিজেকে ছাড়িয়া দিল। তাহার স্পর্শের অতলস্পর্শে সমুদ্রে মানব স্নান করিতেছে।

তাহার আবার দুঃখ! সে কি না এই দুঃখ ভুলিতে সেইদিন টেবিলের উপর মদের গ্লাশ সাজাইয়া বসিয়াছিল! সেই কথা মনে করিয়া এখন তাহার হাসিতে ইচ্ছা করিতেছে।

মানবের কাঁধের উপর মাথাটা ভালো করিয়া বসাইয়া মিলি কহিল—আমি হলে কিন্তু কিছুতেই চলে আসতাম না। জোর করে ছিনিয়ে নিতাম।

—কী আর পেতাম বলো—কতোটুকু? তার চেয়ে এ কতো বেশি পেয়েছি।

—ছাই পেয়েছ। একহাঁটু ধুলো আর একগাল—দাড়ি। বলিয়া মিলি পরম স্নেহে মানবের গালে একটু হাঁত বুলাইয়া কহিল—দাড়ি কামাবার তোমার পয়সা জোটে না নাকি ? ট্যাক্সিটাও দেখছি তোমারই মতো উড়ে চলেছে। এই, আস্তে চলো।

মিলি আবহাওয়াকে তরল করিতে চায়।

—এই সুর আমার সুত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া, মিলি। মানব মিলির মুখের উপর নুইয়া পড়িয়া কহিল—পৃথিবী আমার করতলে।

মিলির চোখের মণি দুইটি যে কতো কালো মানব আবার—আরেক বার দেখিল। চোখ দুইটি তুলিয়া মিলি কহিল—আমি কি তোমার পৃথিবী নাকি ?

—তুমি তার চেয়েও বড়ো—তুমি আমার উঠোন। মেঘনার পারে সেই যে ঘর দেখেছিলে মনে পড়ে ?

মিলি নিজেকে একটু আলগা করিয়া নিয়া কহিল—সত্যি, তোমার আর ইউরোপ যাওয়া হলো না তা হলে।

—কেন হবে না ? যাবো বৈ কি।

—মনে মনে ?

—না। পয়সা হলে। সে-পয়সা আমি নিজেই রোজগার করবো। চিবুকটা গলার দিকে সামান্য ঝুলাইয়া দিয়া মিলি কহিল—পয়সা। হলে ! কথাটা পাছে তাচ্ছিল্যের মতো শোনায় মিলি আবার মানবের স্পর্শের মাঝে ডুবিয়া গিয়া কহিল—কোথায় এখন থাকবে ?

মানব কহিল—এতোদিন তো এক বন্ধুর মেসএই ছিলাম। আমার অসুখে তার বেশ খরচ হয়ে গেলো। এবার গিয়ে অন্য মেস দেখতে হবে।

—আমারো আর ও-বাড়িতে থাকা চলবে না। শোভাদি-দের হসটেলে একটা সিট রাখতে লিখে দিয়েছি।

মানব তাহাকে আরো কাছে আকর্ষণ করিয়া কহিল—তুমি ও বাড়িতে থাকবে না কেন?

অস্ফুট স্বরে মিলি কহিল—তুমি নেই বলে।

কিন্তু হসটেলেও তো মানব থাকিবে না—তাহা ছাড়া মানবের থাকা-না-থাকার খবর পাইবার আগেই তো সে শোভাদি-দের হসটেলে সিট রাখিতে লিখিয়া দিয়াছে। কিন্তু, এ তর্ক বা জেরা করিবার সময়?

মানব তাহাকে আগের চেয়েও আরো কাছে টানিয়া লইল। আর একটি মাত্র সুতারও ব্যবধান নাই। তবু আরো কাছে। অজস্র বর্ষার মতো মিলি নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে। মিলির সম্পর্কে তাহার অবারিত মুক্তি—আবার ইচ্ছা করিলেই অবারিত বিরহ।

মিলির মুখ সে আস্তে তুলিয়া ধরিল। ওড়া-পাখির বাঁকানো দুই ডানার মতো ভুরুর নিচে কালো দুইটি তারা—ভোর বেলার তারা—কাঁপিতে-কাঁপিতে নিবিয়া গেল। নিমীলিত-চক্ষু মুখখানিতে বিষাদের গোধূলি নামিয়াছে। অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে, কুণ্ঠিত-ওষ্ঠে, মন্দিরের দেবতা ছুঁইবার মতো নিঃশব্দে—মানব মুখ নামাইয়া আনিল। সেই নিমীলিত-চক্ষু মুখে কোথাও এতটুকু প্রশ্ন নাই, বাধা নাই—মমতায় ঠাণ্ডা, মসৃণ মুখ, প্রতীক্ষায় গলিয়া পড়িতেছে।

মুখ আরো নামাইয়া আনিল।

মিলির দুই পাটি দাঁত হঠাৎ ঝিলিক দিয়া উঠিল। কোণের দিকের সেই উদ্ধত দাঁতটি উত্তীর্ণ হইয়া ঠোঁট প্রসারিত হইল। তারপরেই সমর্পণের সেই কোমল ভঙ্গীটি তাহার রহিল না। চিবুকে ছোট একটি টোল ফেলিয়া মিলি কহিল—এমন তোমার কী দৈন্যদশা হয়েছে যে দাড়ি পর্যন্ত কামাতে পারোনি। তারপরে পিঠ টান করিয়া বসিয়া : ও! এই বুঝি রিথিয়ার বাড়ি শুরু হল? বা, বেশ জায়গা তো!

কেহ খানিকক্ষণ আর কোনো কথা কহিল না। ড্রাইভারের কথায় হুঁস হইল। ড্রাইভার কহিল—আর রাস্তা নেই।

—তবে ফেরো। মিলি মানবের বাঁ-মণিবন্ধটা উলটাইয়া ধরিয়া কহিল—তোমার ঘড়ি কোথায়?

—অসুখের সময় ঘড়িটা বেচতে হয়েছে।

চুলটা হাত-প্যাঁচ করিয়া বাঁধিতে-বাঁধিতে মিলি বলিল—কটা এখন হলো? আমাকে চারটের আগে ফিরতেই হবে কিন্তু। বলিয়া সে আবার মানবের বুকের ডান-পাশে হেলান দিয়া বসিল।

গাড়ি এইবার আরো ছুটিল। কাদের আরেকটা ট্যাক্সি ধূলা উড়াইয়া সামনে চলিয়াছে। ধূলায় চোখ-মুখ বন্ধ হইয়া আসে। মিলি মানবের বুকের মধ্যে নিজের শাড়ির আঁচলে মুখ ঢাকিয়া বলিয়া উঠিল: কী ধুলো!

কিন্তু আগের গাড়িটাকে কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না।

নম্বর দেখিয়া এই ড্রাইভার আগের গাড়ির ড্রাইভারকে নিশ্চয় চিনিয়াছে। সে পিছন হইতে বলিযা উঠিল: এই তেওয়ারি, বিকেলে তোর গাড়ির দরকার হবে। পুরান্দা থেকে কিরায়া চেয়েছে তিন গাড়ি। সেই যমুনাঝোর পেরিয়ে—

খবরটা শুনিবার জন্য আগের গাড়ির ড্রাইভার ক্লাচ টিপিল। তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া পাশাপাশি যাইতে-যাইতে এই ড্রাইভার কহিল—সেই যে পুরান্দায় নতুন ডাক্তারবাবু—

তার পরেই: দুত্তোর তোর পুরান্দা! বলিয়া মিলিদের গাড়ি নক্ষত্র-বেগে বাহির হইয়া গেল। তেওয়ারি এখন প্রাণ ভরিয়া ধূলা খাক।

মিলি খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। দুই হাতে তালি দিয়া বলিল—চালাও। এবং পেছনের গাড়ির কী দুর্দশা হইল দেখিবার জন্য—হুডের ও-পাশের ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া আবার তাহার হাসি।

ধুলা যখন আর নাই, তখন বুকে মুখ গুঁজিবার কারণও কিছু থাকিতে পারে না।

পথ-ও ফুরাইয়া আসিতেছে। মানব কহিল—এই, আস্তে।

মিলি কহিল—তুমি না খুব স্পীডের ভক্ত?

—আর না। অন্তত এখন না। পথটুকু ভোগ করতে চাই।

—গতির মাঝেই তো পথকে ভোগ করা। কখন যে তুমি কী বলো তার ঠিক নেই। তোমার মোটর-বাইকটাও রেখে এসেছ?

—সব।

কথাটা মিলির লাগিল। আবার মানবের গা ঘেঁষিয়া আসিল। কহিল—তোমার এখন তবে কী করে চলবে?

মানব দীপ্ত হইয়া উঠিল: খুব চলবে। সে-জন্যে কিচ্ছু ভাবি নে।

—পয়সা পাবে কোথায়?

—মাটি খুঁড়ে পয়সা আনবো।

—কিন্তু তোমার পড়াশুনো এইখেনে খতম?

—না, না, পড়া ছাড়বো কী! যে করে হোক বি.এ-টা পাশ করতেই হবে।

—কিন্তু খরচ চালাবে কোত্থেকে? বাসা-ভাড়া, কলেজের মাইনে—

—তা ঠিক চলে যাবে। কিচ্ছু ভাবনা নেই।

—ঠিক চলে যাবে না। তবু তুমি কী ভাবছ শুনি? আমাকে না বললে আর কে আছে?

—একটা টিউশানি জুটিয়ে নিতে পারবো হয়তো। কিম্বা অন্য কোনো কাজ।

—শেষকালে ছেলে পড়াবে তুমি?

মানব হাসিয়া কহিল—এমন কোনো কথা নেই। মেয়েও পড়াতে পারি।

—বেশ তো, আমাকেই পড়াও না।

মিলিকে দুই হাতে ঘন করিয়া কাছে আনিয়া মানব বলিল—তোমাকে পড়াবো? মাসে কতো করে দেবে?

মিলি আবার মানবের বুকে মুখ উপুড় করিয়া রাখিল।

নিশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে-সঙ্গে পথ ফুরাইয়া আসিতেছে। তাহার চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে মানব কহিল—এখুনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে, মিলি? বাড়ি গিয়ে কী করবে?

মুখ না তুলিয়াই মিলি কহিল—সত্যি বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

ঘনতা কমাইয়া আনিয়া মানব বলিল—এক কাজ করি এসো।

মুখ তুলিয়া মিলি বলিল—কি?

—চলো, এখন হয়তো একটা ট্রেন আছে। আমরা কলকাতায় চলে যাই।

মিলি চোখ বড়ো করিয়া কহিল—ওরে বাবা, ছোট-কাকা তাহলে আর আস্ত রাখবে না।

অবশ্য মিলিকে মানব কলিকাতায় কোথায়ই বা লইয়া যাইত! সেই কথা হইতেছে না। দুইজনে এক সঙ্গে কোথায়ই বা উঠিবে! তবু—

আবার চুপচাপ।

গাড়ি বেলার রাস্তা ধরিয়াছে।

মিলি কহিল—আর দেরি নেই। এসে পড়লাম।

—এখুনি না-ই বা গেলে।

—বিশেষ কাজ ছিলো। আচ্ছা চলো জসিডি। মিলি গম্ভীর হইয়া কহিল—অতি-উৎসাহে পড়াশুনো যেন ছেড়ে দিয়ো না। পরীক্ষাটা দিয়ো—না পড়লেও পাস তুমি করবেই—আমাদের নোয়াখালির বাড়িতে গিয়ে থেকো। যতোদিন না অন্য কিছু সুবিধে হয়।

মানব অন্যমনে কহিল—আমাদেরই বাড়ি বটে।

—নিশ্চয়। ঐ জায়গাটা আমার কিন্তু ভারি ভালো লাগে। অবিশ্যি তুমি যতোদিন ছিলে ততোদিন—টিকাটুলিতেও আমাদের একটা বাড়ি আছে বটে, কিন্তু ওর মতো নয়। থাকতে পারবে তো সেখানে?

মানব হাসিয়া কহিল—অতি-উৎসাহে। ঐখানেই তোমাকে নিয়ে 'সেটল' করে যাবো।

—কিন্তু ও-বাড়িতে তো তুমি ভূত দেখ।

—আর দেখবো না।

—কিন্তু চেহারাটা যদি তুমি না বদলাও, আমিই হয়তো ভূত দেখবো। তোমার কিছুতেই বিশ্বাস নেই, দুদিন থেকেই হয়তো জ্বর-জারি করে পালাবে।

—এবার তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

—বিলেত অবধি?

মানবের মুখে কথা জুয়াইল না।

আবার যে তাহারা সহরে আসিয়া পড়িয়াছে কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, কারণ মিলি বলিল—ছাড়ো। ঐ আমাদের বাড়ির রাস্তা। এবার ডাইনে বেঁকে জসিডি।

কতো দূর যাইতেই মিলি বলিল—ঐ তোমার সাধের দারোয়া নদী। রোদ্দুরে ব্রিজ-এর ওপর খানিকক্ষণ বসলেই হয়েছিল আর-কি।

ক্ষীণ নিশ্বাসের মতো নদীটি বালির উপর দিয়া তির-তির করিয়া বহিতেছে। রোদে জরির সরু পাড়ের মতো ঝিলমিল করিতেছে।

পথ-ঘাট আবার নির্জন।

মানব মিলির হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল—আমার সঙ্গে তুমি গরিব হয়ে যেতে পারবে?

মিলি চক্ষু তুলিয়া কহিল—তোমার সঙ্গে না থাকতে পারলেই তো

গরিব হয়ে যাবো। পরে আবার কাছে সরিয়া আসিয়া : শরীরটাকে নষ্ট কোরো না। কলকাতায় আমার সঙ্গে—রোজ না পারো, হপ্তায় এক দিন অন্তত দেখা কোরো। শোভাদি-দের হসটেলেই খোঁজ কোরো আগে। মানব কহিল—বাড়ি ফিরতে এখনো দেরি আছে—ও-সব জরুরি কথা পরে বললেও চলবে।

মিলি হাসিয়া কহিল—আচ্ছা, বাজে কথাই বলো না হয়।

—এতোক্ষণ ধরে বাজে কথাই বলছিলাম না কি?

মিলি চুপ করিয়া রহিল।

দেখিতে-দেখিতে জসিডি আসিয়া গেল। ট্যাক্সিতেই আবার ফিরিতে হইবে।

মানব কহিল—ট্যাক্সিটা এখানে ছেড়ে দাও। ট্রেন একটা তৈরি দেখা যাচ্ছে। ওটাতেই ফিরি এসো।

মিলি টান হইয়া বসিয়া কহিল—ওরে বাবা। ওটা ছাড়তে ছাড়তে বাড়ি গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিতে পারবো। চারটে বেজে কখন ভূত হয়ে গেছে।

মানব কহিল : তুমি কবে কলকাতা ফিরবে?

—চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই হয়তো। এখনো ঠিক করিনি। জানতে পাবে নিশ্চয়ই। তুমি তো আজই যাচ্ছ।

—হ্যাঁ।

—কোথায় গিয়ে থাকো আমাকে জানিয়ো কিন্তু।

—নিশ্চয়ই।

—গরিব করে রেখো না যেন। বলিয়া তরলকণ্ঠে মিলি হাসিয়া উঠিল।

—কিন্তু সত্যিই বড়লোক হবো কবে?

—উপন্যাসের প্রথম চ্যাপটারটা আরো একটু দীর্ঘ হবে দেখছি।

মানব কহিল—তা হোক।

রোহিণীর রাস্তা আসিয়া গেল। এবারো ডাইনে। না, এখানেই নামিয়া পড়া ভালো। বাকি রাস্তাটুকু পায়ে হাঁটিয়া গেলেই বীণাপাণিদের বাড়ি থেকে ফেরা হইবে।

দুই জনেই নামিল। ব্লাউজের ভেতর থেকে মিলি নরম তুকতুকে শাদা চামড়ার ছোট একটি মনি-ব্যাগ বাহির করিল। হাতের ঘামে সামান্য একটু ময়লা হইয়াছে। ভাড়া চুকাইয়া দিবার আগে মিলি কহিল—তোমাকে ধর্মশালায় পৌছে দেবে নাকি?

—দরকার নেই। আমাকে তুমি কী পেলে!

—তোমার শরীর খারাপ বলে বলছি। তারপর ট্যাক্সিটা উধাও হইলে: আচ্ছা, এইবার যাই। না, না, তোমাকে কষ্ট করে আর আসতে হবে না। একাই যেতে পারবো এটুকু, যেমন একাই এসেছিলাম। আমার ছোট-কাকা বিশেষ ভালো লোক নয়। কাল তো দেখতেই পেলে। আচ্ছা।

২৬

শোভনাদের হসটেলে মানব খোঁজ নিতে গিয়াছিল, কিন্তু মিলি সতীশ-বাবুদের বাড়িতেই উঠিয়াছে। মাসিমার কাছে কথাটা সে পাড়িতেই পারে নাই—য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটির সঙ্গে তার বেশ ভাব। নিতাই তার ডাকে তটস্থ।

পড়িতে-পড়িতে হঠাৎ উঠিয়া দোলনায় খোকাটার সঙ্গে খানিক আলাপ করিয়া আসে।

এই বাড়ি থেকে মানব একেবারে মুছিয়া গেছে, সেই নাম মিলিও মুখে আনিতে ভয় পায়। সেই নাম শুনিলে সমস্ত দেয়ালগুলি পর্যন্ত প্রতিবাদ করিয়া উঠিবে। মোটর সাইকেলটার দামে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটির দু-একটা সস্তা শখ মিটিয়াছে—আজকাল ক্রাইজলারএ করিয়া সেই বেড়ায়, রিপন স্ট্রিটের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে হল্লা করিয়া একটু কিছু খাইয়া আসে—মাঝে মাঝে মিলিকেও সঙ্গে ডাকে—যেদিন তার বন্ধুদের সঙ্গে 'য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট' থাকে না! মিলি বলে: থ্যাঙ্কস।

কিন্তু কোন ঠিকানায় আছে একটু খবর দিতে কি হইয়াছিল!

ওদিকে সুবিনয় সর্দারি করিয়া কৃষ্ণনগর হইতে—ছুটির পর সেখানেই সে বদলি হইয়াছে—চিঠি লিখিয়াছে যে এই উইক-এণ্ড-এ সে কলিকাতা আসিবে। পারিলে প্রত্যহই সে আসুক না; কিন্তু চিঠি লিখিয়া জানাইবার যে কি কারণ মিলির আর অজানা নাই। মিলি সেই দুই দিন কোথায় পলাইয়া বাঁচিবে ভাবিয়া পায় না।

অথচ চিঠি না লিখিয়া অনায়াসে সে চলিয়া আসিতে পারিত। রাস্তা

তো আর সতীশবাবুর সম্পত্তি নয়; আর সিঁড়ি দিয়া সোজা নামিয়া আসিবার স্বাধীনতাও মিলি কাহারো কাছে বন্ধক রাখে নাই।

এই বাজে ছেলেমানুষি করিয়া কি-এমন লাভ হইল! হয়তো সামান্য একটা চাকুরির চেষ্টায় একহাঁটু ধূলা লইয়া রাস্তায়-রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করিতেছে। নিশ্চিন্ত হইয়া আয়নায় সে নিজের মুখ দেখিলে পারে! ডান-পাশের ঐ কোণের ঘরটায় থাকিলে জাত যাইত নাকি? বেশ তো, মিলিই না-হয় তাহার সঙ্গে ঘর বদল করিয়া নিত। তাহাতে কাহার কি রাজ্যপতন হইত! মানুষে রাগিলে মুখে অমন অনেক কথাই আসিয়া পড়ে, তাহার জন্য এতোটুকু ক্ষমা নাই! মালকোঁচা মারিয়া তখুনি বাহির হইয়া পড়িতে হইবে! অথচ টাই বাঁধিয়া সোজা সে বিলেত চলিয়া যাইতে পারিত। সতীশবাবু তাহার জন্য বাক্স খোলা রাখিয়াছিলেন। এখনো, চাবি তাহার হাতেই আছে। অথচ সে এই পাড়া মাড়াইবে না, একগাল দাড়ি নিয়া রাস্তায়-রাস্তায় টো-টো করিবে। একখানা চিঠি লিখিবার পর্যন্ত নাম নাই। চিঠি লিখিল কি না সুবিনয়। না, মানবকে লইয়া মিলি আর পারে না।

যা পাওয়া যায়, তা-ই সই। এতো মুগুর ভাঁজিয়াও এই বুদ্ধিটুকু তার খুলিল না! পরে বুঝিবে। একদিন যদি ফের সতীশবাবুর কাছে আসিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে হাত না পাতে, তো কি বলিয়াছি।

মিলি অগত্যা বই নিয়া পড়িতে বসে।

তারপর একদিন চিঠি আসিল:

থাকে হোগলকুঁড়ের এক মেসএ, বড়বাজারের এক কাটরায় একটি মাড়োয়ারি-ছেলেকে রোজ সকালে দুই ঘণ্টা করিয়া পড়ায়। পায় পনেরো। সন্ধ্যায় আর একটিকে যোগাড় করিতে পারিলেই তাহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে।

আরো লিখিয়াছে: বেশ আছি, মিলি—অপূর্ব সুখে। এবার মনে হচ্ছে

সত্যি আমি মানুষ হতে পারবো। মানুষ হওয়া কাকে যে বলে বোধহয় এতোদিনে বুঝলাম। বাধা কাকে বলে তা-ও বুঝলাম এতোদিনে। তোমার অনিচ্ছা বা অনাদরের বাধা নয়, উত্তাল জীবন-সমুদ্রের বাধা। চোখ দিয়ে কান্না আসছে, তবু যুদ্ধ করতে যে কি সুখ পাচ্ছি কি করে তোমাকে বোঝাব ?

তারপরে কানে-কানে বলার মতোই লিখিয়াছে : কবে তোমাকে দেখব বলো ?

মিলির কলমের মুখটা ভোঁতা—অতো-শত কবিত্ব আসে না। ভালো আছে শুনিয়া সে খুশি হইল। এখন ক্রমে-ক্রমে মানুষ হইতেছে—এটা একটা সুখবর। দেওঘরে যে-অবস্থায় তাহাকে দেখিয়াছিল সেটা মানুষের পূর্বপুরুষের চেহারা।

পরে মুখোমুখি বসিয়া বলার মতোই লিখিয়াছে : যে-কোনোদিন সোজা এ-বাড়ির দোতলায় উঠে এলেই আমার দেখা পাবে। কলেজ থেকে এসে কোথাও আর বেরই না।

মানব আবার চিঠি লিখিল :

বিকালেও টিউশানি একটা যোগাড় করিয়াছে বটে, কিন্তু মাহিনা দিতে চায় নগদ দশটাকা মাত্র। তাহাই সে চোখ বুজিয়া লইয়া ফেলিবে। আরো একটার ফিকিরে সে আছে। পরীক্ষাও আসিয়া পড়িল। মিলি যদি তাহাকে কয়েকখানা রুমাল সেলাই করিয়া দিতে পারে তো ভালো হয়।

তার পরে :

ও-বাড়ির ছায়াও আমি মাড়াতে চাই না। যা ছেড়েছি, তা ছেড়েছি। এমন করে নিজেকে না-ঠকাতেও পারতাম, তা বুঝি, কিন্তু এই ফাল্গুনে আমার মাত্র কুড়ি-বছর পূর্ণ হবে। নিজেকে এখনো আমি দিগ্বিজয়ী ও দুর্ধর্ষ বলে অনুভব করি—আমার হয়ে তুমিও এ-তেজ অনুভব কোরো।

পরের প্যারায় :

একদিন কার্জন-পার্কে বা টালিগঞ্জের পুলের ধারে—যেখানে তোমার খুশি—বেড়াতে-বেড়াতে চলে এসো না। কতোদিন দেখিনি।

দেখে নাই—এখানে আসিলেই তো হয়। এই সব গোঁয়ারতুমির কোনো ভদ্র অর্থ থাকিতে পারে না। ঐ-সব লম্বা-চওড়া কথা শুনিতেই খুব ভালো, দেখিতে অত্যন্ত কদাকার।

রুমাল উপহার দিলে নাকি বন্ধুতার অবসান হয়—এমন একটা কুসংস্কার ছাত্রীমহলে প্রচলিত আছে। থাকুক, মিলি তা বিশ্বাস করে না। রুমাল না-হয় সে ডাকেই পাঠাইয়া দিবে।

তার পরে দূরে সরিয়া বসিয়া :

বলেছি তো কলেজ থেকে এসে কোথাও আর বেরুই না। কার সঙ্গেই বা তোমার সাধের কার্জন-পার্কে যাবো? কে নিয়ে যাবে? সেটা মনে রাখো?

শেষকালে স্বর নামাইয়া :

একজামিন কাছে এসে পড়েছে—ভালো করে পোড়ো। একলাফেই পেরিয়ে যাবে বলে খুব বেশি আলসেমি কোরো না। কলেজ বদলে তো টেস্ট-এর হাত থেকে ছাড়া পেয়েছ—এখন আর একটু চালাকি করে মেসোমশায়ের কাছে থেকে 'ফি'-র টাকাটা আদায় করে নিলেই তো হয়। কুড়ি বছর বলে কুড়ি বছর!

মানব কয়েক দিন আর চিঠি লিখিল না।

মিলিও রাগ করিতে জানে। দুপুর বেলা কলেজ হইতে আসিয়া লংক্লথ-এর রুমালে সুঁচ-সুতা দিয়া সে চিঠি লিখিতে বসে।

পরীক্ষার দিন তিনেক আগে একটা সাবানের বাক্সের মধ্যে প্যাক-করা রুমালগুলি পাইয়া মানব অঙ্কটা আর কিছুতেই মিলাইতে পারিল না!

পরীক্ষা দিয়া ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। আজ শেষ হইল।

রামপদ তাহার একতলা বাড়ির সিমেণ্ট-করা রোয়াকটুকুতে দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল, মানবকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল : কেমন হলো আজ ?

মানব হাসিয়া কহিল—মন্দ নয়।

—পাস তো নিশ্চয়ই করবেন, কি বলুন।

—তার জন্যে ভাবনা নেই। ভাবনা হচ্ছে পরে।

—যা বলেছেন। রামপদ রোয়াক থেকে নামিয়া আসিল : চাকরির যে বাজার। চাকরি করবো না বলে শ্যামপুকুরে এক দোকান খুললাম—কিন্তু যে দিন-কাল, খদ্দেরই জুটলো না। গেলো উঠে। পরে, বাঙালির সেই চাকরি—অভয়পদে দে মা স্থান !

মানব তাহার সঙ্গে দুই পা চলিতে-চলিতে কহিল—তবু ভাগ্যি যে পেয়ে গেছেন।

—বেঁচে গেছি। তা আর বলতে। নইলে সপরিবারে উপোস করে মরতে হতো।

—যদি পারেন, আপনাদের আপিসেই কোথাও আমাকে ঢুকিয়ে দেবেন।

কাঁধে হাত রাখিয়া রামপদ কহিল—আমার সাধ্য কী ভাই! র‍্যাং-ব্যাংই তলিয়ে যান, এতো নেহাত খলসে। আপনার তো একটা মাত্র পেট—কিসের কী! মা-বাপ তো কবেই সাফ হয়েছেন শুনলাম—ভাই-বোনও কাঁধে নেই। বেঁচে গেছেন মশাই। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে থাকুন। আপনার আবার ভাবনা কী।

একটু থামিয়া রামপদ আবার বলিতে লাগিল : খবরদার, বিয়ে করবেন না যেন। ওর মতো ঝঞ্ঝাট আর কিচ্ছু হতে পারে না। পদে-পদে গেরো—মরবার পর্যন্ত স্বাধীনতা নেই। এই দিব্যি আছেন।

—দিব্যি আছি, না ?

—দিব্যি নয় ? আপনিই বলুন না। কার কী তোয়াক্কা রাখেন !

যার কেউ নেই, তার এমন সস্তা সহুরে ভদ্রতারো দরকার হয় না। রামপদ হঠাৎ ফিরিয়া কহিল—চলুন আমার বাড়ি, একজামিন দিয়ে রোজ-রোজ শুকনো মুখে মেসএ ফেরেন এ আর আমি দেখতে পারি না। কী-বা এখন দিতে পারবে জানি না, তবু আসুন আপনি।

মানব আপত্তি করিতে লাগিল: শুকনো মুখ মানে পরীক্ষা ভীষণ খারাপ দিয়েছি।

—এবং পরীক্ষা খারাপ দিলেই তো বেশি করে খিদে পায়। আসুন, আসুন—কথাটা যখন একবার স্ট্রাইক করেছে, আর আমি ছাড়ছিনে।

রোয়াকটুকু পার হইয়া ভিতরে চলিয়া আসিতে হইল। রামপদ কিছুতেই হাত ছাড়িবে না। এইটিই তাহার শুইবার ঘর—পায়ার তলায় ইট দিয়া তক্তপোষটাকে প্রায় খাটে প্রমোশন দিয়াছে—ঘর-ঝাঁট বিছানা-পাতা সব কখন চুকিয়া গিয়াছে—মেঝে দেয়াল নিখুঁত পরিষ্কার। সমস্তটি ঘর জুড়িয়া কাহার দুইটি কুশলী ও কল্যাণময় হাতের স্পর্শ যেন স্পর্শেরই মতো অনুভব করা যায়।

বিছানাটা দেখাইয়া দিয়া রামপদ কহিল—বসুন।

মানব একটু দ্বিধা করিয়া কহিল—বরং বাক্সটা নামিয়ে ঐ টুলটা টেনে নিচ্ছি।

—না, না, আরাম করে বসুন। টায়ার্ড হয়ে এসেছেন।

ভিতরের দিকে জাপানি কাপড়ের পর্দা ঝুলিতেছে; তাহা সরাইয়া রামপদ ভিতরে অদৃশ্য হইল। সে এখুনি হয়তো আর-কাহাকে অযথা বিড়ম্বিত করিয়া তুলিবে।

পর্দাটা সঙ্কুচিত হইতেই মানবের চোখও ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল: কাছেই নিচের উঠোনটুকুর এক কোণে একটি মেয়ে কি একটা শক্ত জিনিসের সাহায্যে বসিয়া-বসিয়া কয়লা ভাঙিতেছে। রামপদ তাহারই কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে মেয়েটি যে কে, বুঝিতে দেরি হইল না। পর্দাটা

তুলিয়া এদিকে সরিয়া না আসিলে মেয়েটির মুখ সে স্পষ্ট দেখিতে পাইত। কিন্তু না দেখিলেও দেখার আর কিছু বাকি নাই।

কুলুঙ্গিতে ছোট একটি সিঁদুরের কৌটা, দু-চারিটি চুলের কাঁটা, একটুখানি কালো তেল-কুচকুচে ফিতা কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে—উমুনে আগুন দিয়া এইবার তাহার চুল বাঁধিবার কথা। দেয়ালে কাঠের একটি ব্র্যাকেট—তাহাতে রামপদরও কি-কি সব টাঙানো আছে, আর আছে তাহার গা ধুইয়া পরিবার শাড়িটি, কুঁচাইয়া, পাকাইয়া অনর্থক তাহাকে একটি অশোভন মর্যাদা দিবার চেষ্টা। পেরেকে বিদ্ধ হইয়া মাটির দুইটি পরী ফুলের মালা হাতে লইয়া দেয়ালে উড়িয়া চলিয়াছে—এবং উহাদের মধ্যস্থানে কালীর একখানি পট ও তাহারই নিচে মাটির একটি চিংড়ি মাছ হাওয়ায় শুঁড় নাড়িতেছে।

রামপদ আরেকটু গল্প করিয়া গেল। বাড়ি-ভাড়া গুনিয়া কিছু আর থাকে না, মাঝে পার্টিশান দিয়া অন্য ভাড়াটে যারা আছে তারা সব সময়েই একট-না-একটা কিছু নিয়া মারামারি হৈ-চৈ করিতেছে—ভালো ও সস্তা বাড়ি পাওয়াই দুষ্কর।

মেয়েটি মৌমাছির মতো ব্যস্ত, হাওয়ার মতো ছুটোছুটি করিয়া রান্নাঘর আর উঠোন, উঠোন আর বারান্দা করিতেছে।

নির্ভুল সঙ্কেত পাইয়া রামপদ উঠিয়া গেল।

পর্দার বাহিরে সামান্য একটু দূরে স্বামী-স্ত্রীতে বচসা হইতেছে। কথাগুলি কানে না গেলেও মানব স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে রামপদর ইচ্ছা তাহার স্ত্রী-ই খাবারের থালা নিয়া অতিথির সম্মুখে উপস্থিত হয়—রামপদ ও-বাড়ি হইতে টুল একটা আনিয়া দিতেছে—ঘরের ওটা বড়ো নিচু। মেয়েটি কিছুতেই রাজী হয় না, সে যতো আপত্তি করে, তার চেয়ে বেশি হাসে, এবং অলক্ষিতেই আবার কখন বড়ো করিয়া ঘোমটা টানিয়া দেয়।

রামপদ আগেই টুল পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

ভিতরে গিয়া দেখিল খাবারের থালাটা মাটিতে রাখিয়া তিনি দস্তুরমতো একটি বোঁচকা হইতেছেন।

গরিব কেরানির এতোখানি বদান্যতা দেখিয়া মানব অবাক হইয়া গেল। বাঁ-হাতে জলের গ্লাশ ও ডান-হাতে খাবারের থালা—নজরে পড়িবার আর কিছুই ছিল না। সেই দুই হাত টুলের সমীপবর্ত্তী হইতেই চোখে পড়িল একগাছি করিয়া শাঁখার চুড়ি, আর দুইগাছি করিয়া সোনার। কানে লাল পাথরের দুইটি দুল—বেশি দূর ঝুলিয়া পড়ে নাই—চুলের আড়াল থেকে টিক-টিক করিতেছে।

থালা-গ্লাশ রাখিয়াই পলাইয়া যাইতেছিল, মানবের মুখ থেকে খসিয়া পড়িল : তুমি আশা, না ?

দেখিতে-দেখিতে ভোজবাজি। বোঁচকা থেকে বাহির হইল পদ্ম। কোথায় বা ঘোমটা, কোথায় বা কী ! আশা হাসিয়া ফেলিল। ঘর-দোর দেয়াল-মেঝে নূতন তাসের মতো ঝকঝক করিতেছে !

—ও ! আপনি নাকি ? আশা নুইয়া পড়িয়া মানবকে প্রণাম করিয়া ফেলিল।

তক্তপোষের তলায় পা দুইটা চালান করিয়া দিয়াও মানবের পরিত্রাণ নাই।

বেচারা রামপদ তো প্রায় পথে বসিয়াছে। আহত হরিণের দৃষ্টির মতো অসহায় চোখে সে তাকাইয়া রহিল।

আশা কহিতেছে : এতো সামনে থাকেন, অথচ একটিবার এসে খোঁজ নেন না।

মানব বলিল : কী করে জানবো তুমি এতো কাছে আছো। অদৃষ্ট নিতান্ত ভালো বলে তোমার দেখা পেলাম।

আরো তাহারা কতো-কি বলিয়া যাইত নিশ্চয়। রামপদ মাঝে পড়িয়া

প্রশ্ন করিল—আপনারা দুজনে দুজনকে অনেক আগে থেকেই চিনতেন বুঝি?
—ও হ্যাঁ। অনেক আগে থেকে। সেই ছেলেবেলায়। মানব চাহিয়া দেখিল রামপদর মুখ ক্রমশ শুকাইয়া আসিতেছে: আপনি জানতেন না বুঝি? ও সুধীরের বোন—আমারো ছোট বোন সেই সুবাদে। অনেক-দিন থেকে জানি! ওর মা তো আমারো মা। মা ভালো আছেন?
আশা কহিল—আছেন এক-রকম। সেই ভিটেটুকু না বেচলে এমন সোনার চাঁদ ভগ্নীপতি কি করে পেতেন বলুন। বলিয়া আশা স্বামীর দিকে চাহিয়া চোখে এক ঝিলিক মারিল।
রামপদর মন দিনের আলোর মতো হাল্কা হইয়া উঠিল যা-হোক। হাসিয়া কহিল—নূতন অতিথিকে শালা বলে পরিচিত করে কি খুব বেশি সম্মান দেখালে?
মানব জিজ্ঞাসা করিল: সুধীর? সুধীর এখন কোথায়?
—চাটগাঁয় পটিয়া বলে এক গ্রাম আছে, সেই গ্রামে মাস্টারি করছেন। মা-ও সেইখানে। আপনার জানাশুনো ভালো মেয়ে আছে তো বলুন, মা দাদার বিয়ে দেবেন।
রামপদ কহিল—ওঁর ভাবনা কে ভাবে তার ঠিক নেই, তোমার দাদার জন্যে ওঁর ঘুম হচ্ছে না।
—ওঁর আবার ভাবনা কি। ভাত না ছড়াতেই কাকের ভিড়।
মানব কহিল—পৃথিবীতে একটিমাত্র ভালো মেয়ের খোঁজ জানতাম।
—কি হলো?
—তাকে রামপদবাবুই নিয়ে নিলেন। কিন্তু এতো সব আমি খেতে পারবো না, আশা।
—খেতে পারবেন না মানে? এ তো খেতে হবেই, রাত্রেও এখানে খাবেন। উনুন ধরাতে হবে। তুমি আলোগুলো জ্বালাও না।

খানিকক্ষণের জন্য মানব অন্ধকারে একা বসিয়া রহিল। এবং অন্ধকারে মিলি ছাড়া আর কোনো কিছুই তাহার মনে আসিল না। মিলির আঁচল ধরিয়া আসিল সবুজ মেঘনা নদী, আর নদী যেখানে আসিয়া শেষ হইল সেখানে ছিটে-বেড়া দিয়ে ঘেরা খড়ের একটি ছোট ঘর—স্নিগ্ধ করতলের মতো ছোট উঠোন ; বেশ তো, হইলই বা না-হয় এমনি পার্টিশান-দেওয়া ভাড়াটে বাড়ি। কালীর পট না টাঙাইয়া মিলি না-হয় বিলিতি মেমসাহেবের চেহারা-ওলা ক্যালেণ্ডার ঝুলাইবে।

আশার মতো সে কি একটি দুঃখের সঙ্গিনী পায় না ?

তবু কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল মিলিকে হয়তো এইখানে মানাইবে না।

আচ্ছা, তাহাকেও কি এইখানে মানায় ?

না, খুন্তি-বেলুন ছাড়িয়া স্টিয়ারিঙ-হুইল ধরিলেই কি আশার পক্ষে নিতান্ত বেমানান হইত ?

মিলির চোখেও দুঃখ-দহনের স্ফুলিঙ্গ সে দেখিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে দুঃখটাই কি বড়ো ? সেই কি জীবনের শেষ আশ্রয় ? সে এমন-কি অসীম বিস্তীর্ণ জলধি যাহাকে অতিক্রম করা যাইবে না ?

লণ্ঠন লইয়া আসিয়া রামপদ সমস্ত স্বপ্ন নষ্ট করিয়া দিল। কহিল—চলুন, দেশবন্ধু-পার্কে একটু ঘুরে আসি। আর কিসের তোয়াক্কা ?

শশব্যস্তে আশার প্রবেশ : হ্যাঁ, ওঁকে আবার টানা হচ্ছে কেন ? তুমি বাজারটা একবার ঘুরে এসো। অতিথির কাছে শুধু-থালাটা ধরে দি আর-কি। কিছু মাংস, ডিম, বিস্কুট—আপনার কল্যাণে কিছু চপ আজ রেঁধে ফেলি। দেখি পারি কি না।

মানব কহিল—আমিও যাই ওঁর সঙ্গে।

রামপদ আশাকে যে কতো ভালোবাসে মানবের বুঝিতে আর বাকি রহিল না। আপত্তি করিল রামপদই : না, না, আপনি বসুন।

বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে খানিক রেস্ট নিন। আশা, এঁর সঙ্গে খানিক গল্প করো। ঘোমটা টেনে দাদার সামনে কনে বউটি হয়ে ঘুপটি মেরে বসে থেকো না!

মাংসের জায়গা লইয়া রামপদ বিড়ি ফুঁকিতে-ফুঁকিতে বাহির হইয়া গেল।

আশা বলিল—ভালো হয়ে উঠে বসুন। তার চেয়ে আসুন আমার সঙ্গে কলতলায়—হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন। পরে জলখাবারটা খেয়ে নেবেন। কিম্বা, জল এখেনেই এনে দেব?

—আমি অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে আছি। আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। কিন্তু এতো-সব খেয়ে রাত্রে যে আর কিছুই খেতে পারবো না।

আশা মানবের সমস্ত কথা-ই জানে—জানিতে কাহারই বা এখনো বাকি আছে? তবু সে তার কাছ দিয়াও ঘেঁষে না। খুঁটিনাটি এটা-ওটা কথা পাড়ে। অথচ মানবকে কতো সহজে তাহার অপমান করা উচিত ছিলো।

রামপদকে সে এতো ভালোবাসে যে সে-কথা সে একদম ভুলিয়া গিয়াছে। স্বামীকে যে পাইয়াছে তাহাতেই সে পরিপূর্ণ। আর কিছুই সে চাহিতে জানে না, জানিতে চাহে না।

তাই তাহার যতো কথা:

এই এখানে দুটো পুঁইর চারা লাগিয়েছি। আপিস থেকে এসে যে একটু মাটি কুপিয়ে দুটো ফুল-গাছ লাগাবে তার নাম নেই। কুড়েমিতে লাটসাহেব। বিড়ির পেছনে মাসে দু-ডজন দেশলাই লাগাবে। ভালো-ভালো জামা-কাপড় সব বিড়ির আগুনে ছ্যাঁদা হয়ে গেলো। না না, ঝি রাখবার কী হয়েছে? দুটি মাত্র তো থালা-বাটি—আমি ও-পাতেই বসে পড়ি। কোনো কোনো দিন সাহেবিয়ানা করে বসি—একটেবিলে নয়, একপাতে। আমার মাছ-টাছ সব কেড়ে-কুড়ে খেয়ে ফেলে। আসুন না

আমার সঙ্গে রান্নাঘরে। ভাত এতোক্ষণে টগবগ করছে। বেজায় ধোঁয়া কিন্তু। দেখবেন। পিঁড়েটা টেনে দিচ্ছি। জামাটা—যাক, পারি না আপনাদের নিয়ে।

২৭

মিলির সঙ্গে তারপর আরো দুই দিন না তিন দিন দেখা হইয়াছিল। মেসএর বিছানায় শুইয়া-শুইয়া ঘুমাইবার আগে মানব তাহাই ভাবিতে বসে।

একদিন দুই-নম্বর বাসএ : মিলি বলিল, ধরিত্রীর জন্মদিনে সে হরীতকী-বাগানে হসটেলে চলিয়াছে। মেঝেতে সে আলপনা দিবে। পরীক্ষা মানব ভালোই দিয়াছে নিশ্চয়, শরীরও বেশ ভালোই মনে হইতেছে। সতীশ-বাবু—তাহার মেসোমশায়ের ব্লাড-প্রেসার বাড়িয়াছে। মাসখানেক হইল নিতাই নাই—বাড়ি যাইবার নাম করিয়া উধাও।

—আচ্ছা। এইখেনে নামবো। তুমি বুঝি আরো দূরে। বাঁধকে।

আরেক দিন মার্কেটের পথে :

ফুলের দোকানের কাছে দোকানদার-বন্ধুর সঙ্গে মানব দাঁড়াইয়া কী গল্প করিতেছিল। এখন আর সে ঝুড়ি ভরিয়া দূরে থাক, বাটন-হোলএর জন্য পর্যন্ত একটা ফুল কিনে না কেন, দোকানদারের এই ছিল অভিযোগ। ফুলের চেয়ে অন্য-কিছুর প্রয়োজন যে কতো প্রত্যক্ষ ও পরিচিত তাহা কথায় বুঝাইয়া দিবার আগে চোখের সামনে মিলির আবির্ভাব। থামিতে-না-থামিতেই এক ঝাপটা জলো হাওয়ার মতো সে উড়িয়া গেলো।

মানব ডাকিল : মিলি।

মিলি দাঁড়াইবে কি দাঁড়াইবে না ভাবিবার আগেই মানব পাশে আসিয়া পড়িয়াছে। দোকানদার কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া রহিল। এই ফুলে তাহাকে কেমন দেখাইবে?

মিলি এখন ভারি ব্যস্ত। হসটেলের মেয়েরা মিলিয়া 'রক্তকরবী' করিতেছে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে প্লে হইবে। দস্তুরমতো টিকিট করিয়া। পুরুষদের দেখানো হইবে—দস্তুরমতো দেখানো হইবে। মিলিরা তেমন ছিচকাঁদুনে নয়, পুতু-পুতু করিয়া তাহারা অভিনয় করে না। যার খুশি সে আসিয়া দেখিয়া যাক, পয়সা খরচ করিয়া। মনে যা আসে তাই লিখিয়া সাপ্তাহিকে মাসিকে সমালোচনা করুক। একটাকা লোয়েস্ট। মানব সেই আগের ঠিকানায়ই আছে তো? খামে পুরিয়া মিলি তাহাকে না-হয় ড্রেস্-সার্কলের একখানা পাশ পাঠাইয়া দিবে। সে যেন আসে।

—নাকে-মুখে পথ পাচ্ছি না। রিহার্সেলই দেব, না, মেলা-ই জিনিস-পত্তর কিনবো—তা কে দেখে? আর এ সব মেয়ে—যতো সব ইলশে গুঁড়ি, ছুঁতে না ছুঁতে মিলিয়ে যায়। তুমি আমার সঙ্গে কোথায় আসছ? পেছনে আমার এক দঙ্গল সেনানী, না ফেউ। এই উষা, এই মাসি, হাঁটতে পারিস না?

পিছনে বাহিনী আসিতেছে। তাহারা এতো পিছে পড়িয়া আছে কেন? অর্থাৎ মিলি তাহাদের ফেলিয়া বোঁ করিয়া এতোটা আগাইয়া আসিল কেন? ফুলের দোকানের কাছে তবে কি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল? তাহাকে এড়াইয়া যাইতে, না, আগাইয়া আসিয়া তাহার সঙ্গে নিভৃতে একটু কথা কহিতে?

—কাজ সব ভাগ করে দিলাম, তবু কারুর গা দেখি না। কাজেও ওদের নবাবি। আমি শুধু খেটে মরি। তুমি চাকরি-বাকরি কিছু পেলে? এই বুলা, হসটেলে তোরা দু'বেলা সাবু খাস নাকি? না, এখনো টিউশানিই করছ? রট্। তুমি যেয়ো কিন্তু—তারিখ পরে কাগজে দেওয়া হবে। আচ্ছা। চিয়্যারিয়ো!

এই দুই দিন হইল। আরেক দিন গেলো কোথায়? মানব চোখ বুজিয়া

স্মৃতির গহন অন্ধকারের সমুদ্রে তলাইয়া-তলাইয়া তাহা তুলিতে পারে না।

বা রে, সেই দিন—এতোক্ষণে তাহার মনে পড়িয়াছে—সেই দিন তাহার কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া সে ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছিল। সেই স্পর্শের গন্ধ তাহার সারা গায়ে এখনো লাগিয়া আছে। সে না-জানি তখন কি করিতেছিল, কি ভাবিতেছিল, কি-কথা বলিতে গিয়াও বলিতে পারিতেছিল না।

যাঃ, সে তো দেওঘরে—রিখিয়া যাইবার পথে। এখানে কোথায় ?

না, তিন দিন নয়।

আজ মনে পড়ে রিখিয়া যাইবার পথে স্পর্শের সেই উদ্দাম ঝড়ে দৃষ্টি ছিল কুণ্ঠিত, ব্যবহার কৃত্রিম। মিলির সেই অজস্র সমর্পণের অন্তরালে প্রকাশের কি দীনতা ! তাহার চেয়ে মেঘনার উপরে চাঁদপুরের স্টিমারে মানব যখন তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল মিলির তখনকার মৃদু-মৃদু বাধার মধ্যে গাঢ় একটি আন্তরিকতা ছিল। সেই কৃপণতার মধ্যে কতো বড়ো ঐশ্বর্য !

দলছাড়া একাকী একটা গাঙশালিকের মতো মানব মেঘনার উপরে সেই স্টিমারটা খুঁজিয়া বেড়ায়।

না, মাত্র একটি দিন।

তারপর আসিল সময়ের স্রোত।

সূঁচের মতো তীক্ষ্ণ ও সোজা, রাত্রির মতো ক্লান্ত ও কঠিন।

ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু যে-ঘোড়া তুমি ধরিয়াছ সে আর আসিয়া পৌঁছায় না।

মেঘনা কবে শুকাইয়া গেল, স্টিমার উঠিয়া গিয়াছে, নোয়াখালির সেই বাড়িটা নদীর তলায় ভাঙিয়া-চুরিয়া ছত্রখান।

খালি মাটি আর মাটি।

মাটি খুঁড়িয়া সে পয়সা আনিবে বলিয়াছিল। বলিতে ভালো লাগিয়াছিল বলিয়াই বলিয়াছিল। তেমনি কতো কথা মিলিয়ো বলিতে ভালো লাগিয়াছে।

সময়-সমুদ্রে কোটি-কোটি তরণী। পাশাপাশি আসিতে-আসিতে কোথায় কে পিছাইয়া পড়িল। কে কাহার জন্য দাঁড়ায়—সময়ের সমুদ্রে সময় কোথায়?

মার্চেণ্ট আফিসে সামান্য এক কেরানিগিরি পাইয়া মানব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল। কাল তাহাকে গিয়া জয়েন করিতে হইবে।

এই উপলক্ষে বেনেপুকুরের মেসএর বাসিন্দারা আজ বিকেলে একটা বায়স্কোপ দেখিয়া হৈ-চৈ করিবার জন্য মাতামাতি করিতেছে। মানবের গলা সবাইর উপরে। গিরিজা টাকা লইয়া কখন টিকিট কিনিতে চলিয়া গিয়াছে, সে আসিলেই সকলে মিলিয়া বাস ধরিবে। ফিস্টেরও একটা ছোটো-খাটো ফিরিস্তি তৈরি হইয়াছে—বৈদ্যনাথবাবুর উপরেই সব যোগাড় করিবার ভার।

মাথা ধুইয়া বাঁ-হাতে প্রজাপতি-তোলা ছোট আয়না লইয়া মানব চুল আঁচড়াইতেছিল।

লোক্যাল ডাক এমন সময়েই আসে। নিচে হইতে বিকাশ একটা খাম হাতে করিয়া হাজির।

বিক্ষুব্ধ জনতাকে সম্বোধন করিয়া বিকাশ বলিল—কারো সর্বনাশ, কারো বা পৌষ মাস। কেউ খায় পিঠে, কেউ খায় পি-ঠে! আমাদের ভাগ্যে জুতোর একটা সুখতলাও জোটে না, আর (মানবের দিকে খাম-শুদ্ধ হাত বাড়াইয়া) ওর ভাগ্যে কি না দিস্তেখানেক লুচি। মানুষের

ভাগ্য যখন আসে, কপাল ফুঁড়ে আসে। চাকরি পেতে-না-পেতেই বিয়ের নেমন্তন্ন।

খবরটা বিশদ করিয়া জানিবার জন্য সবাই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল।

মানব সমানে চুল আঁচড়াইয়া চলিয়াছে।

চিঠিটা আসিয়াছে বুক-পোস্টে—মোড়কটা খোলা। বিকাশ চিঠিটা খুলিয়া বলিল—নেমন্তন্ন কন্যাপক্ষের। অতএব সুবিধের নয়। বরপক্ষ থেকে হলে বরং দু-দুবার মারতে পারতিস।

—তাই সই। বলিয়া সত্যেন চিঠিটা বিকাশের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া নিয়া পড়িতে লাগিল :

—আগামী ২৭শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার আমার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মঞ্জরী দেবীর সহিত—

মানব এতোক্ষণ এই খবরটারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাঙ্ঘাতিক তাহার উইল-ফোর্স। সে দস্তুরমতো থট-রিডিং করিয়া পয়সা রোজকার করিতে পারে।

—শ্রীমান ব্রজবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবাজীবনের সহিত...

—বাবাজীবন! প্রমথ একেবারে হাসিয়া খুন।

বিকাশ বলিল—যাই বলো, চমৎকার ইনিশিয়াল নামটার। বি. বি. বি।

আয়নায় মুখ দেখিয়া মানব দিব্যি টেরি বাগাইতেছে! মুখে তাহার কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই তো? হাতটা কাঁপিতেছে নাকি? পাগল! নিজের মনে নিজেই সে একটু হাসিল। 'যাই বলো' কথাটা মিলি প্রায়ই বলিত বোধহয়।

কিছুই হয় নাই এমনি পরিষ্কার নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে মানব বলিল—তারিখটা কবে বললে?

—এই তো সামনের বেস্পতিবার।

মানব মনে-মনে হিসাব করিয়া বলিল—তাহলে মোটে চারদিন

আছে। এখন থেকেই জোলাপ নিতে শুরু করি কি বলিস বিকাশ?

বিকাশ হাসিয়া বলিল—এখন থেকেই নয় বাপু। কাল তোমার নতুন আপিস।

ভালো কথা মনে করাইয়া দিয়াছে। তবু মানব আমতা-আমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—নিচে কার নাম? হীরালাল মুখুজ্জের?

চিঠিতে চোখ বুলাইয়া সত্যেন কহিল—হ্যাঁ, শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়। বাড়ির ঠিকানা রসা রোড সাউথ। দেখিস ঠিকানাটা হারিয়ে যায় না যেন। বলিয়া চিঠিটা খামে মুড়িয়া তাকের উপর রাখিয়া সে একটা বই চাপা দিল।

সন্দেহের আর কিছু বাকি ছিলো নাকি? কাঁটায়-কাঁটায় ঘড়ি মিলিয়াছে। দেওঘর থেকে আসিয়া মিলির ভালো নাম কবে সে মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

মানবের চুল আঁচড়ানো শেষ হয় না।

কতোগুলি কথা তাহার চট করিয়া মনে পড়িয়া গেলো—হীরালালবাবু আসিয়াছেন, পিসিমা আসিয়াছেন, এয়ার-গানটা সঙ্গে লইয়া গোরাও নিশ্চয় আসিয়াছে। তাহার কাঠের বাক্সের তাহার সেই মিউজিয়মটা পিসিমা কিছুতেই আনিতে দেন নাই। আর কে-কে আসিয়াছে মানব তাহাদের কাহাকেও চিনে না। খুব ভিড়—দারুণ গোলমাল। হরিহর ফুড়ুক-ফুড়ুক করিয়া তামাক টানিতেছে। সেই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটি এখন আর নাই, কবে চলিয়া গিয়াছে না-জানি। সতীশবাবু তেতলা হইতে নিশ্চয় এতো দিনে নিচে নামিয়াছেন। তাঁহার ব্লাড-প্রেসার এখন অনেকটা ভালো। কিন্তু সুবিনয় কি আসে নাই? কি জানি তাহার নাম? ব্রজবল্লভ! ব্রজবল্লভ দীর্ঘজীবী হোন।

হুড়মুড় করিয়া গিরিজা আসিয়া হাজির।

তাহাকে দেখিয়া বিকাশ জোর-গলায় সম্বর্ধনা করিল: এই যে গিরিজাগোবিন্দ গুহ। জি. জি. জি। শিবাস্তে আসন্ পন্থানঃ?

গিরিজা ব্যস্ত হইয়া বলিল—চলো, চলো, সাড়ে-পাঁচটা বেজে গেছে। প্রথম ব্র্যাকেট হইতে সার্টটা কাঁধে ফেলিয়া বলিল—আমরা তো কখন থেকে রেডি হয়ে আছি। মানববাবুরই হয়নি।

বিকাশ বলিল—ওরে, আজকেই নেমন্তন্ন নয়। চারদিন বাদে। এখন থেকেই চুলের কসরৎ করতে হবে না।

তাকের উপর আয়না-চিরুনি রাখিয়া মানব কহিল—বা, আমারো তো কখন হয়ে গেছে, চলো।

দল বাঁধিয়া সবাই একটা চলন্ত বাস আক্রমণ করিল।

দুইধারে বাড়ি আর দোকান—কেনা, বেচা, দরদস্তুর, কোলাহল।

তবু কোন নদীর জলে এখন সূর্যাস্ত হইতেছে। কোথায় কোন কুটিরে মাটির একটি বাতি জ্বলিল।

বাড়ি-ঘর-দোর লোকে গিসগিস করিতেছে। ব্যাপারীরা নানারকম হিসাবের ফর্দ আনিতেছে—হীরালালবাবুর ঐ সব দিকে পাকা নজর। তারপর সেই গুঁফো কাকাটি আছেন। বিবাহ করিয়া মিলি খারাপ হইয়া যাইবে বলিয়া দুইটা ধমক দিয়া না বসিলেই ভালো। সে যে-ঘরে শুইত সেইখানে খোকা দোলনায় দুলিতেছে—তাহাকে ঘিরিয়া মাতৃত্ব-লোভিনীদের ভিড় লাগিয়াছে। পাছে কেহ আদর করিয়া গাল টিপিয়া দেয়—সেই ভয়ে মিসেস অনুপমা চাটুজ্জে সতর্ক চোখে কাছে-কাছে ফিরিতেছেন। মিলি যে-ঘরে শুইত সেইখানে পাটি বিছাইয়া ফরাশ পড়িবে—সেই ঘরেই হয়তো—ইস্, লোকটা আরেকটু হইলে চাপা পড়িয়াছিল! ড্রাইভারটা ওস্তাদ।

বায়স্কোপের প্রথম ঘণ্টা দিয়াছে। মানব হঠাৎ উঠিয়া পড়িল। বলিল—বাইরে থেকে আসি একটু।

—কিছু পান নিয়ে আসিস অমনি।

মানবের আর দেখা নাই। ছবি শুরু হইয়া গেল।

ফাঁকায় অসিয়া সে বাঁচিয়াছে। আর তার ভয় করিতেছে না।

কি করিবে—এমন দিনে মানুষে কী করে—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সে গাড়ি-মোটর বাঁচাইয়া আস্তে-আস্তে ইম্পিরিয়াল্ রেস্টোর‍্যাণ্টে আসিয়া ঢুকিল।

খালি একটা টেবিলের কাছে চেয়ার আগাইয়া বসিয়া সে অর্ডার দিল: এক পেগ হুইস্কি অউর এক প্লেট ফাউল-কাটলেট।

আরো অনেকে মদ খাইতেছে। অকারণে। অভ্যাসে পরিশ্রান্ত হইয়া। হয়তো আর কোনো কাজ নাই বলিয়া।

মদ খাইবে মনে করিয়া হঠাৎ সে গম্ভীর হইয়া পড়িল। ভাবিল: এই দুঃখ মিলি ভাগ্যিস পায় নাই। সে কখনই ইহার মর্যাদা রাখিতে পারিত না। সে যে নারী। নারী বলিয়াই বিধাতা তাহাকে মায়া করিয়া এই দুঃখ দেন নাই। এই দুঃখকে প্রসন্নচিত্তে জীবনে স্বীকার করিয়া লইবার মতো চরিত্রের উদারতা ও বলিষ্ঠতা তাহার ছিল না।

আচার্যের ঢঙে এই কথা কয়টি মনে-মনে আওড়াইয়া সে হাসিল।

এবং বয় যখন মদ আনিয়া রাখিল তখন আরেকটু হইলে জোরেই সে হাসিয়া উঠিয়াছিল!

মিলির ভালোবাসার মতোই সোডার চঞ্চলতা ধীরে-ধীরে মিলাইয়া গেলে মানব গ্লাশটা দূরে সরাইয়া রাখিল। তাহার এমন-কী দুঃখ যাহা ভুলিতে সে এতো কষ্টের পয়সা দিয়া মদ কিনিয়া বসিয়াছে। সে মদ খাইয়া তাহার এই চমৎকার অস্তিত্ববোধকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিবে নাকি?

ফাউল কাটলেটটা চিবাইতে-চিবাইতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেলো—কাল তাহার নতুন চাকরিতে জয়েন করিতে হইবে।

অমনি তড়াক করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া সে লাফাইয়া উঠিল। পকেটে

পয়সা এখনো কিছু আছে বটে—কিটুন একটা অনায়াসেই নেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু চৌরঙ্গিতে কিছুক্ষণ না বেড়াইলে—অনেকটা না হাঁটিলে সে স্পষ্ট বুঝিবে না জীবনে সে আজ কতো বড়ো মুক্তি লাভ করিয়াছে।

মুক্তি—পঙ্গপালবিধ্বস্ত মাঠের নিঃশব্দতা নয়।

মুক্তি—তাহার জীবনের শেষ অভিজাত্যটুকুও মিলাইয়া গেল।

যাক, আজ রাত্রে তাহার গভীর ঘুম হইবে। পরীক্ষা দিবার পর এতো শান্তিতে কোনোদিন সে আর ঘুমায় নাই।

মানবকে আমরা এইখানে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

তবে এইটুকু মাত্র খবর রাখি যে সে এখনো বেনেপুকুরের মেস হইতে ডবলিউ. ডবলিউ. রিচার্ডসের অফিসে নিয়মিত দশটা-পাঁচটা করে। গত সনে তার তিন টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে।

আর এইটুকু জানি যে সময়-সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ—ফেনিল লেলিহান তার ক্ষুধা।

আরো এইটুকু জানি—কানে-কানে বলিয়া রাখি—হিসাবের খসড়া করিতে-করিতে রাজ্যের-চিঠি-পত্র লিখিতে-লিখিতে আঙুলগুলি যখন বাঁকিয়া-চুরিয়া ভাঙিয়া আসে, তখন মাঝে-মাঝে তাহার মনে হয় হাত পাতিলেই তো সে অনায়াসে সতীশবাবুর কাছ থেকে কিছু পাইতে পারিত!

আর রাত্রে কখনো-কখনো যখন তার সহজে ঘুম আসে না, তখন আরেকটা—রিখিয়া যাইবার পথে, ট্যাক্সিতে—এমন নিরালায়—এতো কাছে

শেষ